1880

প্রকাশকের নিবেদন—

"রামায়ণের সমাজ" প্রকাশিত হইল। "রামায়ণের স মাজ"-মুদ্রণ কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় অকালে বিগত ১৩৩৩ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর নানা বাধাবিঘ্নসত্বেও গ্রন্থকারের কঠোর সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল "রামায়ণের সমাজ" সুধী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়া, আমি হৃদয়ে অসীম আনন্দ অনুভব করিতেছি। যে গ্রন্থকার মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও ব্যাধির নিদারুণ যন্ত্রণা ও স্ত্রীপুত্রাদির বিষাদ ক্লিষ্ট বদনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কেবল মাত্র রামায়ণের সমাজের কথাই বলিয়া গিয়াছেন; আজ সাহিত্যের সেই একনিষ্ঠ সাধক অগ্রজ মহাশয়ের "রামায়ণের সমাজ" প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহার পরলোকগত আত্মা তৃপ্তিলাভ করিবে, ইহাও আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অসীম সান্ত্বনা আনয়ন করিতেছে।

অগ্রজ মহাশয় ১৩১০ বঙ্গাব্দে "রামায়ণের সমাজ" লিখিতে আরম্ভ করেন। কোন ভাবী আশায় নিরাশ হইয়া মনে সান্ত্বনা প্রদান জন্য এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমে বিষয়টী যত সান্ত্বনাপ্রদ হইবে মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা তেমন সহজ ও সান্ত্বনাপ্রদ বোধ করেন নাই; তথাপি অদম্য উৎসাহে ধৈর্য্য ধরিয়া দুইখানা রামায়ণের বঙ্গানুবাদ (দুই সমাজের) ছয় মাসের মধ্যে শেষ করিয়াছিলেন এবং দুই বৎসরে আলোচনার ধারা ও বিষয় সূচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই বিষয়

সূচী প্রস্তুত করিতে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" হইতে প্রকাশিত "রামায়ণ-তত্ত্ব" দুইখণ্ড তাঁহার শ্রম যথেষ্ট লাঘব করিয়াছিল। তিনি রোজনামচায় লিখিয়াছেন "পরিষদের ঐ রামায়ণের সূচীর সাহায্য না পাইলে এত সহজে রামায়ণের বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত হইত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।"

১৩১৪ বঙ্গাব্দে "রামায়ণের" সমাজ কতকাংশ লিখিত হয় এবং স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার "সাহিত্য"পত্রে উহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৩১৭ বঙ্গাব্দে রামায়ণের সভ্যতা সম্বন্ধেও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হয় এবং তাহা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদিত "আর্য্যাবর্ত্তে" প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করিয়া উক্ত পত্রিকা-সম্পাদকদ্বয় যেমন গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সপক্ষে ও প্রতিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া এবং সমালোচনা করিয়া সেইরূপ অনেক ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকা তাঁহাকে প্রচুর উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধের প্রশংসায় যে লেখকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় তাহা স্বীকার্য্য হইলেও ত্রুটী দর্শাইয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে যে লেখকের উপকার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে সকল পত্রিকায় ঐরূপ আলোচনা বাহির হইয়াছিল তিনি যত্নের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকালে তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারও করিয়াছেন।

রামায়ণের সমাজশীর্ষক যে সকল প্রবন্ধ "সাহিত্য" ও "আর্য্যাবর্ত্তে" প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা লইয়াই রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন ইচ্ছা করিয়া ১৩২১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা গিয়াছিলেন। সেখানে একদিন তাঁহার পূজনীয় শিক্ষাগুরু স্বর্গীয় উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে তাঁহার সেই মুদ্রিত পাণ্ডুলিপিখানা দেখাইলেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের মতের সহিত কোন দিন কাহারও মতের মিল হইত না, তাহা হইলেও তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি অগ্রজ মহাশয়ের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার বিরুদ্ধ মতেরও যে প্রচুর মূল্য আছে, তাহা অগ্রজ মহাশয় স্বীকার করিতেন এবং অনেকেই করিয়া থাকেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া প্রমাণসহ মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার সিমলা ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতিদিন যাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। নিজের লেখাপড়ার চর্চ্চা ফেলিয়া পরের লেখা দেখিবার সময় যথার্থই তাঁহার কম ছিল। তথাপি তিনি স্নেহ পরবশ হইয়া কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার স্বাধীন মত প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়ের বিরুদ্ধ মতগুলিরও প্রমাণ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন আমিও উপস্থিতছিলাম দেখিলাম কি আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি সে বৃদ্ধের, বেদ, মহাভারত, পাণিনি, ব্রাহ্মণসূত্র—এ গুলির পৃষ্ঠাগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতির আয়ত্ত।

এই সময় অগ্রজ মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি সমস্তই একবার পড়িয়া লইয়া, আবার গ্রন্থখানাকে শোধিত করিবার ইচ্ছা করেন; এবং সেই গৃহেই সে ইচ্ছা কার্য্যতঃ আরম্ভ করেন।

এই সময় একদিন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন "বাবা, বেদ যে পৃথিবীতে কোন পণ্ডিত বুঝিয়াছে তাহাই আমার মনে হয় না"।

পণ্ডিত মহাশয়ের এইরূপ জ্ঞান তাঁহাকে অনেকেরই নিকট অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। এই সম্বন্ধে অগ্রজ মহাশয় স্মৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন "বিভিন্ন বেদ সংহিতার ৫।৬খানা ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়া এবং সেই সেই সংহিতার ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থগুলি দেখিয়া আজ প্রকৃতই পণ্ডিত মহাশয়ের কথার সার্থকতা অনুভব করিতেছি।" "রামায়ণের সমাজ" গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহা প্রদর্শন করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলোচনার পর হইতে গ্রন্থখানাকে তুলনামুলক (পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমাজের আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা) করিয়া লিখিবার ইচ্ছা হয় এবং উপস্থিত পাণ্ডুলিপি প্রেসে না দিয়া তাহা লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

এইরূপে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের এক যুগ অতিক্রম করিল। পণ্ডিত মহাশয়ের বিরাট পুস্তকাগারে শাস্ত্র গ্রন্থরাশির সান্নিধ্যে বসিয়া যাহা সহজ মনে করিয়াছেন, গ্রন্থাগার শূন্য ময়মনসিংহে আসিয়া তাহা মোটেই সম্ভবপর হইয়া উঠিল না।

এই সময় কতিপয় পারিবারিক দুর্ঘটনায় শান্তি লাভ প্রত্যাশায় মনকে বিষয়ান্তরে লইয়া গিয়া "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" লিখিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সাময়িক সাহিত্যের প্রসঙ্গ এই স্থানে আলোচনার বিষয় না হইলেও উহার নিরাশব্যঞ্জক ফল যে উপস্থিত গ্রন্থ সঙ্কলনে বাধা প্রদান করিতেছিল ইহা উল্লেখ করিতেই হইবে, কেননা উহাই এই গ্রন্থ প্রচারের দীর্ঘ সূত্রিতার অন্যতম কৈফিয়ৎ।

"বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের" পাণ্ডুলিপি ১ম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, প্রথম খণ্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থে দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইবে আশা ছিল। নিরপেক্ষ সমালোচনায় গ্রন্থখানা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু অদৃষ্ট দোষে তাহা সুফললাভ করিতে পারে নাই। এই সময় অগ্রজ মহাশয় মাতৃদেবীর নামে এই সহরে "জয়দুর্গা ইনিষ্টিটিউসন" নামে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই শুভানুষ্ঠানের জন্য বহু সহস্র টাকা তিনি অকাতরে ব্যয় করেন। সাময়িক অর্থকৃচ্ছ্রতায় পড়িয়া ১ম সংস্করণের পুস্তকগুলি সামান্য মূল্যে এক পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। পুস্তক ক্রয় করিবার অল্পদিন পরে ঐ পুস্তক ব্যবসায়ীর ব্যবসা ঋণের দায়ে বিপন্ন হইয়া পড়ে সুতরাং পুস্তকখানা বাজারে বাহির হইবার পূর্ব্বেই

দপ্তরীর গৃহে থাকিয়া নীরবে সমাধি প্রাপ্ত হয়। বঙ্গের সুধী সমাজের চক্ষে এ গ্রন্থ অধিক আলোচিত হইতে পারে নাই, ইহাও গ্রন্থকারের একটা অনুশোচনার বিষয় সন্দেহ নাই।

অগ্রজ মহাশয় "সাময়িক সাহিত্য" সঙ্কলনে বিপুল মানসিক শ্রম ও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ছয় মাসের জন্ম স্থায়ী বাসস্থান স্থির করিয়া প্রায় প্রতিদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে, জোড়াসাকো হইতে চেতলা—কলিকাতায় অলিগলির লাইব্রেরী-গুলি খুজিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যকে অতি মাত্রায় নিপীড়িত করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধক ব্যতীত কেহ এইরূপ স্বাস্থ্য ও অর্থ উপেক্ষা করিয়া সাধনা করিতে পারে না।

তীর্থস্নান করিয়া সুফললাভ না হইলে পুণ্য-লোভাতুর যাত্রীর মনে যে অনুতাপ ও অবসাদের উদয় হয় "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" প্রকাশের পর তাহার পরিণাম ভাবিয়া অগ্রজ মহাশয় সেইরূপ অবসাদে ও অনুতাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন।

যদিও অনুতাপে ও অবসাদের ফলে অর্থ ব্যয়শক্তি সঙ্কোচিত হয় তথাপি অভ্যাস দোষ চাপা থাকে না। লেখনী কণ্ডূয়ন বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম অগ্রজ মহাশয় এই সময় গল্প উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। স্কুল পাঠ্য গ্রন্থগুলি লিখিতেও পুনরায় মনসংযোগ করেন। উপন্যাস ও গল্প লিখিবার এই সময় প্রয়োজনও হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এই দুই বিষয়ে যাঁহার পুঁজি কম তাঁহারপক্ষে পত্রিকা সম্পাদন এক দুর্ঘট ব্যাপার। সুতরাং সম্পাদককে যেমন সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হইতে হইবে, তেমনি গায় না মানে আপনি মোড়লভাবে গ্রাহকের পরিতুষ্টির জন্ম ঔপন্যাসিক এবং গাল্পিকও হইতে হইবে।

ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি লিখিয়া যেমন নিরাশ হইয়াছিলেন উপন্যাস

প্রকাশ করিয়া তেমন নিরাশ হইতে হয় নাই। তিন বৎসরে যে তিনখানা উপন্যাস প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দুইখানাই পুনঃসংস্করণ করিতে হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালী পাঠকের বর্ত্তমান রুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন; ইতিহাস লেখকের নিরাশা ও অবসাদের অন্যতম কারণ।

অগ্রজ মহাশয়ের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি বিপদে কখনও অধীর হইতেন না, এবং পরিশ্রম করিয়া ফললাভ করিতে অসমর্থ হইলেও তিনি দমিয়া যাইতেন না। নৈরাশ্য কখনও তাঁহার মনের বল হ্রাস করিতে পারে নাই।

১৩২৮ সন হইতে বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ ও প্রশংসায় "রামায়ণের সমাজের" দিকে তিনি পুনঃ মনসংযোগ করিলেন, এবং উপনিষৎগুলি ক্রয় করিয়া পড়িতে লাগিলেন। "সৌরভ" পরিচালনের জন্য যেমন উপন্যাস ও গল্প রচনা করিতে হইতেছিল, সেইরূপ রামায়ণ সম্বন্ধেও নূতন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি "সৌরভে" প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহা উদ্ধৃত হইতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ "প্রবাসী" প্রতি সংখ্যায় সৌরভের রামায়ণী সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি তাঁহার "কষ্টি পাথরে" যাচাই করিয়া ভারতীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছিলেন। তাহার ফলে মান্দ্রাজ যুক্তপ্রদেশের কোন কোন ইংরেজী ও হিন্দি পত্রিকায়ও ঐ সকল প্রবন্ধ অনূদিত হইতেছিল—বাস্তবিকপক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে এই সকল উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া "রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতা" গ্রন্থ দুই খণ্ড পৃথক করিয়া প্রচার করিতে ও নূতন করিয়া গড়িয়া লিখিবার জন্য অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল।

"সাহিত্য" ও "আর্য্যাবর্ত্তে" যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ ছিল দুইশত কি আড়াইশত পৃষ্ঠা। এবার ঐ মুদ্রিত বিষয়গুলিকে দুই গ্রন্থের জন্য পৃথক করিয়া লইয়া সম্পূর্ণ নূতনভাবে "রামায়ণের সমাজ" রচনা

করিতে আরম্ভ করিলেন। এবার পূর্ব্ব চিন্তা অনুসরণে রামায়ণের সামাজিক আদর্শগুলিকে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক ও পরবর্ত্তী মহাভারত ও সূত্র-যুগের সমাজের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিতে ব্রতী হইলেন। এইরূপ আদর্শে পাঁচ বৎসরে "রামায়ণের সমাজ" সম্পূর্ণ নূতন আকারে প্রস্তুত হইল।

রামায়ণের সমাজের অর্দ্ধাংশের কিছু বেশী মুদ্রিত হওয়ার পরই অকস্মাৎ গ্রন্থকার পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে অবশিষ্টাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষরের অস্পষ্টতা হেতু স্থানে স্থানে মুদ্রণ কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। এই ত্রুটী বিচ্যুতি অনিবার্য্য। গ্রন্থকার নিবেদনে বলিয়াছেন যে একটী শুদ্ধিপত্র প্রদান করা হইল কিন্তু সেরূপ শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা করা আমার ক্ষমতার অতীত, আর অপরের করা সম্ভবপরও নহে। এই সকল ত্রুটী বিচ্যুতের জন্য আমিও আংশিক দায়ী এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত। আমার অনুপযুক্ততা হেতু যে সমস্ত দোষ ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে আশা করি পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

Research House,
Mymensingh.

বিনীত—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

গ্রন্থকারের নিবেদন। *

প্রায় সিকি শতাব্দীর চেষ্টায় ও শ্রমে "প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সভ্যতার" ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম, এ জন্য শ্রীভগবানের চরণে অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি বাহির হইবে কি না একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন।

রামায়ণ হিন্দুজাতির একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ। এমন গ্রন্থের সমাজ বা প্রকৃতি নির্ণয়ে আমি ইচ্ছা করিয়াই কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের মত গ্রহণ করি নাই। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ তাহা আমি মনে করি না; তাঁহাদের রচিত রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কীয় গ্রন্থগুলির যতটা আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা শ্রদ্ধার সহিতই পড়িয়াছি। বেদ, ব্রাহ্মণ সূত্রগুলিরও বৈদেশিকের অনূদিত ইংরেজ অনুবাদই পাঠ করিয়াছি কিন্তু রামায়ণের সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয় ব্যাপারে তাঁহাদের মত গ্রহণ করি নাই।

রামায়ণের সমাজ আলোচনায় আমি নিজ চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়াছি বলিয়া আমি মনে করিতেছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে বৈদেশিক ভাব বহু পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে খুব কম।

---

* ১৩৩২ সনের ফাল্গুন মাসে লিখিত।

স্বয়ম্বর প্রথাটীকে আমি বৈদেশিক আমদানী প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা আমার অনুমান; অনুমানের কারণগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। লিঙ্গপূজা পদ্ধতিও যে ভারতে বৈদেশিক আমদানী তাহা বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি নাই। ইহা দ্বারা কেহ আমাকে বৈদেশিক রুচির পৃষ্ঠপোষক মনে করিবেন না।

সমাজের প্রত্যেকটী বিষয়ই আমি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক সমাজের সহিত ও পরবর্ত্তী মহাভারত বা সূত্র যুগের সমাজের আদর্শের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিয়াছি। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋক্ বেদের অনুবাদ এবং মেক্সমুলারের প্রচারিত সূত্র গ্রন্থগুলির অনুবাদই আমার আদর্শ। এরূপ স্থলে কেহ যদি তাঁহাদের অনুবাদে সন্দেহ করেন তবে তাঁহার নিকট বেদ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উক্তিই আমার অবলম্বনীয়।

বাস্তবিক পক্ষে বেদের অর্থ যে সকলেই একরূপ বুঝেন নাই সূত্রকার ঋষিগণের মতভেদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একই বেদের সূত্রকারগণের এইরূপ মতভেদের ও ব্যবস্থা ভেদের কারণ চিন্তা করিয়াই বোধ হয় পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন "বেদ যে পৃথিবীতে কোন পণ্ডিত বুঝিয়াছেন তাহাই মনে হয় না।" স্মৃতিকার এবং সূত্রকারগণ একই বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ সকলেই বেদের দোহাই দিয়াছেন। বোধ হয় এই কারণেই অনন্তোপায় হইয়া কোন রসিক পুরুষ শাস্ত্র মীমাংসার সূত্র করিয়াছিলেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না না সৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

রামায়ণের সমাজ ঠিক কোন্ সময়ের সমাজ—বৈদিক সমাজ হইতে কতকাল পরের ও মহাভারতের সমাজ হইতে কতকাল পূর্ব্বের অথবা

পূর্ব্বের কি পরের,—এ সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে চিন্তা করিলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া একবার বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল মহাশয় আমাকে খুব উৎসাহ প্রদান করেন এবং রামায়ণের সময় নিরূপণ না করিয়া সমাজ আলোচনা করিলে যে তাহা অঙ্গহীন হইবে তাহা বুঝাইয়া ঐ কার্য্যটীও করিতে অনুরোধ করেন। ইতঃপূর্ব্বে সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে সেরূপ চেষ্টা ছিল না; রামায়ণ যে সময়ই লিখিত হইয়াছিল—ঠিক তখনকারই সমাজ—এই ভাব লইয়াই তখন প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলাম। এবার অবিনাশবাবুর উপদেশটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু রামায়ণ রচনাকাল ঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই। আমার মনে হয় সেরূপ চেষ্টা সম্ভবপরও নহে।

বেদের সময় নির্ণয় হয় নাই। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত কোন বৈদেশিক পণ্ডিতই বেদকে খৃঃ পূঃ ১৫০০—২০০০ বৎসরের অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীতে তিলক মহোদয়ের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া অধ্যাপক জেকবি, ওলডেনবার্গ প্রভৃতি খৃঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার পর এসিরিয়া বগোচ্কোই ও মোহেঞ্জোদড়ো খনন ব্যাপারের পরে বৈদিক যুগের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় সমাজ পূর্ব্বে বাইবেলের উক্তির প্রতি সম্মান রাখিয়া মানব সভ্যতার কাল নিরূপণ করিতেন, এখন ডাঃ কলভিন প্রভৃতির ভূতত্ত্ব নিরূপণের ধারা হইতে সে সকল উক্তি অবহেলা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বেদের কোন একটী বা দুইটী সূক্তের বা ঋকের ভাব গ্রহণ করিয়া যে সময় নিরূপিত হইবে—যেরূপ তিলক মহোদয় করিয়াছেন—তাহাকে সমগ্র

বেদ রচনার সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সে নির্দ্দেশও অভ্রান্ত হইবে না। কেন না বেদ কোনও এক যুগের রচনা নহে। ইহাতে হাজার হাজার বৎসরের বিরোধী ভাবেরও সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গো-বধ ও গো-রক্ষার কথাই উল্লেখ করা গেল। ঋকবেদের সমাজে দেখা যায় এক স্থানে গো-বধ্য অন্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় গো অঘ্ন্য। সমাজে এরূপ বিরুদ্ধ ভাব কত দিনে স্থাপিত হইতে পারে, প্রাচ্য রক্ষণশীল সমাজের বর্ত্তমান ভাব হইতেও তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। সুতরাং এ অবস্থায় কোন অভ্রান্ত প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন সমাজের সময় নির্ণয় পন্থা যে সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

বেদ সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক শ্রদ্ধাশীল তাঁহারা বেদ রচনার সময় ২০।২৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনে করেন। এরূপ অনুমানেরও বিশেষ কোন মূল্য নাই। তবে বেদ যে কোন এক অতীত যুগ হইতে রচিত হইয়া প্রাক বৌদ্ধ যুগে সংস্কৃত ভাষা প্রচলনের সময়ও লিখিত হইয়াছিল দশম মণ্ডলের বহু ঋকে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমরা রাত্রি পরিশিষ্টের যে ঋকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে প্রাচীন অর্ব্বাচীন রচনার দৃষ্টান্ত খুব স্পষ্ট। কেহ যদি এই রচনা বা ঋকবেদের পুরুষ সূক্তের রচনা (১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্ত) দেখিয়া তাহাকে বৈদিক সংস্কৃত রচনা বলিয়া মহাকাব্য-দ্বয়ের সমসাময়িক সময়ের রচনা বলিয়া অনুমান করেন তবে তাহার অনুমান যে খুব ভিত্তি শূন্য হইবে, তাহা মনে হয় না।

ব্রাহ্মণ রচনার কাল লইয়াও অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। তিলক মহোদয়ের মতে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা কাল খৃঃ পূঃ ২৫০০।

এই সময় আমাদের নিকট অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণের যে শ্রুতিটী হইতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, সেই নির্দ্দিষ্ট শ্রুতিটীর সময় সম্পর্কে আমাদের কোনই মত ভেদ নাই। প্রকৃত সমস্যা সেই শ্রুতিটী

কোন গ্রন্থ হইতে শতপথে গৃহীত হইয়াছে ? শতপথ শুক্ল যজুর মধ্যন্দিন শাখার ব্রাহ্মণ গ্রন্থ। তবে কি যজুর্ব্বেদের শ্রুতিটীই উড়িয়া আসিয়া শতপথে জুড়িয়া বসিল। এগুলি সমস্যা বটে। বেদের সমাজ বিভাগ ও শাখা বিভাগ প্রাচীন হইলেও শতপথ ব্রাহ্মণ এত প্রাচীন নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত সমাজ আলোচনায় বিস্তৃত হইয়াছে।

মহাভারতের সময় নিরূপণেও এইরূপ একটী অভ্রান্ত (?) রীতির আশ্রয় গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা—মঘানক্ষত্র সম্বন্ধীয় উক্তি।

এ উক্তি বৈজ্ঞানিক বটে কিন্তু উক্তির মূল সূত্রকে অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।

আমাদের মত ভারতে লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হইবার পরে, বিভিন্ন বেদগুলি যেমন জনগণের স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদগুলিও সংগৃহীত হইয়া বিভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই লিপি বিজ্ঞান প্রচারের যুগ খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়।*

---

* গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে

রামায়ণ সংগ্রহ কাল ৪র্থ—১ম খৃঃ পূঃ (১৮ পৃঃ)

অধ্যাপক জেকবী প্রভৃতি অনেকে মনে করেন বৌদ্ধ যুগে সংস্কৃত ভাষা একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং রামায়ণের মত কোন সংস্কৃত কাব্য ঐ যুগে লিখিত হইতে পারে না, অধ্যাপক জেকবীর এই মন্তব্য ঠিক নহে। বৌদ্ধ যুগে যে সংস্কৃত ভাষার কোন গ্রন্থ প্রচারিত হয় নাই তাহা নহে। গৃহ্য সূত্রগুলি ও দর্শন এবং উপনিষদ এই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভাস কবির কাব্য নাটকগুলিও খৃঃ পূঃ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ যুগের (খৃঃ পূঃ) ২৩ শত সংস্কৃত পুস্তক চীন ও জাপানে আছে। নেপালে এই সময়ের বহু সংস্কৃত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এবং তিনি নিজে তাহাদের

রামায়ণ লিপিযুগের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সমগ্র রামায়ণের একস্থানেও লিখাপড়া চর্চ্চার কোন আভাস নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে আলোচনার সুযোগ হয় নাই। "রামায়ণের সভ্যতা" গ্রন্থে লিপি বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে।

রামায়ণ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে—ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে রচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি সহজ সংস্কৃত ইহার কারণ ইহা জনসাধারণের বোধ্য গীতরূপে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। গীতে প্রচারিত আখ্যায়িকার ভাষা ব্রাহ্মণ বা উপনিষদের ভাষার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইবে ইহা অবশ্যই আশা করা যায় না ; সুতরাং যে যুগের সংস্কৃত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বা উপনিষদে বিন্যস্ত তাহাই যে সে যুগের সংস্কৃতের নিদর্শন হইবে এবং রামায়ণের সহজ সংস্কৃতকে সেই সময়ের রচনা রীতির নিদর্শন বলিলে তাহা ভুল হইবে—তেমন বলা সঙ্গত নহে।

বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষার উদ্ভব হইয়া তাহাই জনসাধারণের ব্যবহারিক ভাষায় এবং শেষটা অশোকের সময় রাজভাষায় পরিণত হইয়াছিল। এই ভাষার কোন ইঙ্গিত রামায়ণে নাই। পরন্তু এই যুগে ঐতিহাসিক জগতে যে সকল নূতন চিন্তার বিষয় সঞ্চিত হইয়াছিল, যুগ সাহিত্য তাহার প্রভাব হইতে দূরে রক্ষিত হইতে পারে নাই। রামায়ণে এই বৌদ্ধ যুগের প্রভাব অযোধ্যা কাণ্ডের ১৮ ও ১৯ অধ্যায় দুটী ব্যতীত আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। এই দুইটী অধ্যায় যে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আমরাও তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি।

রামায়ণের দেবতা প্রসঙ্গে আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতিকে পৌরাণিক দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই নির্দ্দেশ দ্বারা আমরা এই শ্রেষ্ঠ

পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যাহা হউক ঐ যুগে যে রামায়ণ রচিত হয় নাই তাহা ঠিক। অধ্যাপক জেকবীর এই মতের সহিত আমাদের মতভেদ নাই।

দেবত্রয়কে লঘু করিয়া দিতেছি না। দেবতাকে যদি জন্ম রহিত এবং আদি সৃষ্টিরও অচিন্ত্য শক্তির আধার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে কোন দেবতাই যে নূতন নহেন ইহাও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

"মধ্যাকর্ষণের" শক্তি চিরদিনই আছে, তাহার শক্তি মানুষ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে মাত্র সেদিন, তাই বলিয়াই মধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্ম নিউটনের জন্মের পরে নহে। সেইরূপ ব্রহ্মও চিরদিনই আছেন; বৈদিক সমাজে তিনি জনগণের উপলব্ধির বিষয় হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু উপনিষদের যুগে তিনি জ্ঞানীগণের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছিলেন। ইহার আড়াই হাজার বৎসর পর মহাপুরুষ রামমোহনের চেষ্টায় তাঁহার আলোচনার ও উপাসনার পথ মুক্ত হইলেও ব্রহ্মকে ব্রাহ্ম সমাজের সমসাময়িক দেবতা বলা সঙ্গত হইবে না।

মনুষ্যের চিন্তাই এই সকল স্থলে অর্ব্বাচীন; প্রকৃতির শক্তি বা দেবতা অর্ব্বাচীন নহেন। আমরা ঐ সকল স্থলে কেবল দেখাইয়াছি প্রাকৃতিক শক্তিকে ও দেবতাকে যুগে যুগে মানুষ কিরূপভাবে দেখিয়াছে ও চিন্তা করিয়াছে; এবং সেই চিন্তার স্রোত কিরূপভাবে যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে।

বৌদ্ধযুগে অযোধ্যা সাকেত নামে পরিচিত ছিল; অযোধ্যার নাম বৌদ্ধ সাহিত্যে একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না; এদিকে সাকেতের নামের কোন আভাসই রামায়ণে নাই। পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বারাণসী প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধযুগে উন্নতির উচ্চ চূড়ে আরূঢ় ছিল। রামায়ণে পূর্ব্ব ভারতের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে—রামায়ণ বৌদ্ধ যুগের বা বৌদ্ধযুগের পরের রচনা হইলে আমরা তাহাতে এই সকল স্থানের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাইতাম। উত্তর কাণ্ড বৌদ্ধ যুগের পরবর্ত্তী কালের রচনা। এই রচনায় শ্রাবস্তীর উল্লেখ আছে। লব এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

কাশীর বারাণসী নামটী বৌদ্ধ সাহিত্যেই প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে কাশী রাজ্যের উল্লেখ আছে—বারাণসী নগরের কোন উল্লেখ নাই।

কোন গ্রন্থে কোন স্থানের বা কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেই তাহা হইতে কোন স্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ অবশ্য সমীচীন নহে; কিন্তু এগুলি সেরূপ নহে। রাম মিথিলায় আসিতে সেই পথের ও সেই অঞ্চলের যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে—পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বারাণসী প্রভৃতি স্থান তখন দেশপ্রসিদ্ধ স্থানরূপে বিরাজিত থাকিলে তাহার বর্ণনা রামায়ণের ঐ স্থানে নিশ্চয় থাকিত। তখন রামায়ণে বিশালা নগরের বর্ণনা আছে, তখন তাহা মিথিলার পার্শ্ববর্ত্তী একটী রাজ্য ছিল। বৌদ্ধযুগে মিথিলা ও বিশালা এক হইয়া বৈশালী নামে পরিচিত হইয়াছিল।

এ সকল বর্ণনায় বাল্মীকির বর্ণনার পরবর্ত্তীতার নিদর্শনই বেশী বিরাজমান।

আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপেই রামায়ণের রচনার কাল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের নির্দ্দেশিত বিষয়গুলি যে সময়-নিরূপণ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ, তাহা নহে; তাহা চিন্তনীয় বিষয় মাত্র। সময় নিরূপণ বিষয়ে ৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত "ঋষি যুগের সমর্থনযোগ্য বিষয়গুলির" প্রতি পাঠক একটু বেশী দৃষ্টি রাখিবেন, অবশ্য প্রক্ষিপ্ততার চাপে ঐ গুলির ভাব অনেকটা সন্দেহজনক হইয়াছে। তথাপি এই প্রাচীন স্তরের ভাবগুলি উপেক্ষার বিষয় নহে।

সম্পূর্ণ রামায়ণ গ্রন্থেরই প্রক্ষিপ্ত বিচার করা হইয়াছিল। উহা বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ায় তাহা অধিকাংশ আপাততঃ পরিত্যক্ত হইল। যাহা হউক, আমরা এইরূপ বিষয়গুলির ভাব চিন্তা করিয়াই আপাততঃ একটা সময় নিরূপণ করিলাম। সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমরা যে ধারায় চিন্তা

করিয়াছি এই গ্রন্থের প্রায় প্রতি বিষয় আলোচনায়ই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এবং পাঠকগণের দৃষ্টি তাহাতে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বি, এ বাহাদুর প্রথম হইতেই বিশেষ মনোযোগের সহিত রামায়ণের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতেছিলেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন "আপনার প্রবন্ধগুলি খুব interesting হইতেছে বটে কিন্তু প্রচলিত সমাজ ধর্ম্মের বিরোধী হইতেছে। আপনি হিন্দুশাস্ত্র বিশ্বাসী একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তিদ্বারা গ্রন্থখানা দেখাইয়া দিলে বোধ হয় তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না।"

আমি তেমন লোক খুজিয়াছিলাম—কিন্তু কেহই শ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থখানা দেখিয়া দিতে রাজি হন নাই। মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলনে পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধ দুর্গাদাসবাবু ময়মনসিংহের জেলা স্কুলের ২য় শিক্ষক থাকা কালে আমরা "আরতি" বাহির করিয়াছিলাম তিনি তখন স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে "হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞান প্রদায়িনী" সভার ধর্ম্মোপদেষ্টারও কার্য্য করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার আছে। আরতিতে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বেদ অপৌরুষেয় নহে" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে স্থানীয় হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে এই দুর্গাদাসবাবুকেই প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার অধিকার দেওয়া হয় এবং তিনি তাহা করেন। মেদিনীপুরে দুর্গাদাসবাবু নিজ হইতে আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন ও আমার "রামায়ণের সমাজ ও সভ্যতার" সম্বন্ধে আলাপ করেন ও তাহা তিনি মুদ্রণের পূর্ব্বে দেখিয়া দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে তাঁহার নিকট গ্রন্থের কতক অংশের পাণ্ডুলিপি ও কতক মুদ্রিত ফাইল প্রেরণ করি। বৃদ্ধ দুর্গাদাসবাবু এই বৃদ্ধ বয়সে যে আমার জন্য এরূপ বিপুল শ্রম করিবেন তাহা আমি ভাবি নাই। তাঁহার শ্রম আমাকে যথার্থই উপকৃত করিয়াছে। তিনি পাণ্ডুলিপি

দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। পূজনীয় পণ্ডিত মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনার এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন গ্রন্থ হইয়াছে। কাহাকেও এই গ্রন্থ দেখাইয়া কোন ফল পাইবেন না। কেন না, আপনি যেরূপ একাগ্র সাধনার সহিত রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন ও তাহা হইতে ভাব উদ্ধার করিয়াছেন অন্য কেহ তেমনভাবে তাহা করেন নাই। বিশেষ এত বড় পুস্তক দেখিয়া যিনি পরীক্ষা করিতে বা মত দিতে পারিবেন তিনি এইরূপ একখানা গ্রন্থ লিখিতেই পারিবেন; তেমন কেহ করিতে ইচ্ছা করিবেন না তেমন লোকও বিরল। আপনার সহিত অনেক বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে—উহা এইরূপ গ্রন্থে থাকিবে; তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কমিবে না। আমার নিজ মত স্থানে স্থানে আপনার দৃষ্টার্থে লাল পেন্সিলে সন্নিবেশিত করিলাম। আপনি ঐ গুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। আপনি অপরের মতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যে নিজের স্বাধীনমত প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—আমার মতে তাহা ভালই করিয়াছেন। আপনি এই series শেষ করিয়া যাইতে পারিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃতই Research করিয়া যাইতে পারিলেন। ভগবান আপনার সহায় হইবেন। ... ...

এই মন্তব্য আমাকে যথার্থই উৎসাহিত করিয়াছে। আমি পণ্ডিত মহাশয়ের মতগুলি শ্রদ্ধার সহিত চিন্তা করিয়াছি। এই গ্রন্থে বিন্যস্ত মতের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ স্থানীয় সাহিত্য সভায় পঠিত হইয়াছিল, এবং স্বাধীনভাবে সমালোচিতও হইয়াছিল। এইরূপ সমালোচনার জন্য আমি সমালোচক বন্ধুগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। প্রবন্ধগুলি লিখিয়াও আমি বন্ধুবান্ধবের নিকট পাঠ করিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব স্বাধীন মত গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহা নিজের মতের সহিত বিচার করিয়া

দেখিয়াছি। স্থানে স্থানে এই সকল বিরুদ্ধ মতগুলির উল্লেখও করিয়াছি।

বহু প্রাচীন এবং নবীন মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেও এই গ্রন্থে উপকরণ গৃহীত হইয়াছে। মাসিকপত্রগুলির মধ্যে বঙ্গদর্শন, নবজীবন, প্রচার, সাহিত্য, নব্যভারত, প্রবাসী, মানসী, ভারতী, ব্রাহ্মণ সমাজ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থ সংকলনে যে সকল গ্রন্থের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা প্রায় সকলি আমার নিজ গ্রন্থাগারের পুস্তক। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের, জিলা স্কুলের ও মহারাজা বাহাদুরের লাইব্রেরীরও কোন কোন পুস্তক আমি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

ময়মনসিংহের ন্যায় মফস্বলের সহর, যে স্থানে উপযুক্ত লাইব্রেরী ও পণ্ডিত সমাজ নাই সেরূপ স্থান হইতে এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টা যে কতদূর বিড়ম্বনার বিষয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। শাস্ত্রীয় কত বিষয়ের সমাধান যে গ্রন্থের অভাবে করিতে পারি নাই তাহার ইয়ত্তা নাই।

গ্রন্থ লেখা বরং সোজা কিন্তু তাহার মুদ্রণকার্য্য সমাধা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার তাই নিজেই একটী ক্ষুদ্র প্রেস স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ ভিন্ন স্থান হইতে এইরূপ Foot note বহুল গ্রন্থ ছাপাইয়া আনা অসম্ভব।

ক্ষুদ্র প্রেসের যে সকল ত্রুটী থাকে তাহা ইহাতে সম্যক বর্ত্তিয়াছে। অনেক শব্দ অভাব হেতু ি কার স্থলে ী, ী কার স্থলে ি কার, ন্দ স্থলে ন্ধ, ন স্থলে ণ, ণ স্থলে ন, ইত্যাদি হইয়াছে। এরূপ ত্রুটীকে প্রথমে খুব বেশী ত্রুটী বলিয়া মনে করি নাই; কিন্তু যখন পুস্তকখানা অনেক মনীষী ব্যক্তির দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে ও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়াছে তখন এ গুলির অস্তিত্ব যেন চক্ষুশূল ও লজ্জাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে জন্য অশুদ্ধগুলির যথাসম্ভব একটী শুদ্ধিপত্র প্রদান করা গেল। সাধারণ

মুদ্রাদোষগুলি পাঠকগণ নিজ হইতেই সংশোধন করিয়া লইবেন। এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন অনেক বন্ধুই করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষ ঋণী।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে আমি বঙ্গবাসীর প্রকাশিত রামায়ণই আদর্শ গ্রহণ করা সুবিধাজনক মনে করিয়াছি; মূল পাঠে ও অনুবাদে যে স্থলে সন্দেহ হইয়াছে সে স্থলে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের মূল অনুবাদ দেখিয়াছি। উভয়ের অনুবাদের সহিত অসঙ্গতি স্থলে রামানুজের টীকা দেখিয়াছি এবং পণ্ডিত-গণের সহিত আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ ও সূত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে ভাবগ্রহণ করিয়াছি।

পণ্ডিতপ্রবর পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় রামায়ণের সমাজের মুদ্রিতাংশ পাঠ করিয়া উহার একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার এই সহৃদয়তার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থ মুদ্রণ সম্পর্কে অনেকের নিকটই উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালা সুধীমণ্ডলীর নিকট এই গ্রন্থ সমাদৃত হইলে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব। ইতি—

Research House,
Mymensingh.

বিনীত—
গ্রন্থকার।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে জিলার ইতিহাস লইয়া বই লিখিতে আরম্ভ করেন। এক সময়ে তাঁহার "ময়মনসিংহের ইতিহাস" পড়িয়া খুব খুসি হইয়াছিলাম ও অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম। তিনি এবার রামায়ণের উপর "রামায়ণের সমাজ" নামে একখানি সুন্দর বই লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে শোভা-বাজারের কুমার শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব মহাশয় "রামায়ণ তত্ত্ব" নাম দিয়া দুইখানি পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিবার প্রণালী সর্ণম্পূরূপে ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্মত ভাবেই রচিত হইয়াছিল। তিনি বোম্বাই সংস্করণের রামায়ণ লইয়া তাহাতে যত কিছু ইতিহাস পাওয়া যায় সংকলন করিয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয় সে দুইখানি পুস্তক হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন। তাহার উপর রামায়ণ সম্বন্ধে যিনিই যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংকলন করিয়াছেন। তাহার পরিচ্ছেদ-গুলির শিরোনামা দেখিলেই তিনি রামায়ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা; ২য় কাব্য ও কবির পরিচয়, ৩য় রামায়ণ আদি কাব্য ও বাল্মীকি আদি কবি কি না? ৪র্থ সমাজ ও কবির সমসাময়িকতা; ৫ম রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি, ষষ্ঠ রামায়ণের আর্ষ প্রয়োগ; ৭ম রামায়ণের উপাদান; ৮ম রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল; ৯ম রামায়ণে বাল্মীকির রচনার

পরিমাণ কত ; ১০ম রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত রচনা ; ১১শ প্রক্ষিপ্ততায় ক্ষতি কি ? ১২শ রামায়ণ কথার প্রচার। এই বার অধ্যায়েই তাঁহার প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে। প্রথম খণ্ড পড়িলেই মজুমদার মহাশয়ের পরিশ্রম ও তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মজুমদার মহাশয় অতি সংযত ভাবেই লিখিয়াছেন। তিনি বলেন "ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। এই রামকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য রচিত তাহার নাম রামায়ণ। রামায়ণ গীতের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং কুশীলব (গায়কগণ) কর্ত্তৃক গীতে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা গীতিকাব্য নামে উক্ত হইয়াছে।

এই গীতিকাব্যের "রামায়ণ" নাম কে রাখিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না।

"রামায়ণ গীতকাব্যের রচয়িতা, মহামুনি বাল্মীকি। তিনি পৌলস্ত্য বধ নামে রাম ও সীতার চরিত সম্বলিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা রামায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহা রামায়ণের প্রথম সংগ্রহকারকের লিখিত মুখবন্ধ ভাগ হইতে অবগত হওয়া যায় ; যথা—

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিত ব্রতঃ। ৭।১।৪

"রামায়ণ রচনাকালে তাহাতে কি পরিমাণ গীত সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং তাহার আকার কত বড় ছিল—বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণগুলি দৃষ্টে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই। রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকির পরিচয়ও তাঁহার রচিত এই কাব্যের ভিতর পাওয়া যায় না।"

এইরূপে সব বিষয়ে সন্দেহ করিয়াই মজুমদার মহাশয় তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সংস্কার রামায়ণ যখন রচনা হয় তখন লিপি আরম্ভ হয় নাই। উহা মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। পরে লেখাটা খুব চলিয়া

গেলে কোন এক ব্যক্তি সেই মুখে মুখে বলা জিনিষ সর্গ ও কাণ্ডে সাজান এবং আদিকাণ্ডের প্রথম হইতে চতুর্থ এই চারিটি সর্গে রামায়ণের ভূমিকা লিখেন। এ সকল কথায় আপত্তি করার জিনিষ কিছুই নাই। মজুমদার মহাশয় উত্তরকাণ্ডকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। উহার নাম যখন উত্তর তখন উহা যে রামায়ণের পরে যোগ করিয়া দেওয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে যখন ভূমিকা লেখা হয় তখন উত্তর-কাণ্ড যোগ হইয়াছিল কি না? উত্তরকাণ্ড যখন যোগ হয় তখন লিপি চলিয়াছিল না চলে নাই? মজুমদার মহাশয় কি বলিবেন জানি না। কিন্তু যে চারি সর্গকে মজুমদার মহাশয় মুখবন্ধ বলিতেছেন তাহারই মধ্যে দুরকম কথা পাওয়া যাইতেছে। অনেকে মনে করেন আদি মুখবন্ধ প্রথম অধ্যায়টি মাত্র। উহাও রামায়ণের মুখবন্ধ বলিয়া লিখিত হয় নাই একখানি ক্ষুদ্র কাব্য বলিয়া লিখা হইয়াছিল উহাতে একটী ফলশ্রুতি আছে। পরে রামায়ণে যোগ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় আর একবার সংগ্রহের মুখবন্ধ। দুই মুখবন্ধে বেশ প্রভেদ আছে। একটীতে রামের রাজ্যাভিষেকের পরে রামায়ণের আর কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। কেবল ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি দিয়া অভিষেকের পর রাজ্যের সুখ ও তাহার ব্রহ্মলোকে গমনের কথা আছে। আর একটীতে রাজ্যাভিষেকের পর

সর্ব্বসৈন্যবিসর্জ্জনম্।

স্বরাষ্ট্র রঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জ্জনম্

অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ রামস্য বসুদাতলে

তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥

সুতরাং এই ২য় মুখবন্ধে সর্ব্বসৈন্য বিসর্জ্জন ও বৈদেহীবিসর্জ্জন এই দুইটী ঘটনার উল্লেখ আছে ও উত্তরকাব্যেরও নাম করিয়া দেওয়া আছে। বাল-কাণ্ডের প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় একজন সংগ্রহ কর্ত্তার

লেখা বলিয়া বোধ হয় না। একবার যেন রাম পট্টাভিষেকেই রামায়ণ শেষ হইয়াছিল আর একবার তাহাতে উত্তরকাণ্ড যোগ করা হইয়াছিল। ইহার আর এক প্রমাণ আছে একটী শ্লোক বহুকাল মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে রামায়ণ যে রাম পট্টাভিষেকেই ইহা বিশেষরূপে জানা যায়।

আদৌ রাম-তপোবনাদিগমনং হত্বা মৃগং কাঞ্চনম্।
বৈদেহী-হরণং জটায়ু-মরণং সুগ্রীব-সম্ভাষণম্।
বালি নিগ্রহণং সমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরী দাহনম্
পশ্চাদ্রাবণ-কুম্ভকর্ণ-হননং এতদ্ধি রামায়ণং॥

রাবণ বধেই রামায়ণ শেষ। তাই উহার নামকরণ হইয়াছিল পৌলস্ত্য বধ। বাড়ীতে যখন রামায়ণ পাঠ হয় তখন সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পর রামপট্টাভিষেক করিয়া ব্রতোৎযাপন করিতে হয় তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি পশ্চিম দেশে প্রচলিত আছে। প্রথম হইতেই যদি উত্তরকাণ্ড থাকিত তাহা হইলে রামের বৈকুণ্ঠ গমন দিয়া উদ্যাপন করিতে হইত। আবার একটা দেখুন এই যে পশ্চিমদেশ ব্যাপী রাম লীলার অভিনয় হয় উহার শেষও ত রাবণ বধে, বৈকুণ্ঠ গমনে নয়। সুতরাং এককালে যে রামায়ণ বলিতে রাবণ বধ পর্য্যন্ত বুঝাইত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের বাঙ্গালা দেশে একজাতীয় রামায়ণের পুথি পাওয়া যায় উহার লঙ্কাকাণ্ড রাবণ বধেই শেষ। মন্দোদরী বিলাপ, সীতার অগ্নি পরীক্ষা, বিভীষণের অভিষেক, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন ও রাজ্যাভিষেক সবই উত্তরকাণ্ডে। ইহার ফলও ঐ এক মূল রামায়ণ রাবণ বধে শেষ। তাহার পর এই পুথিতে অভ্যুদয়কাণ্ড নামে একটী উত্তরের অবান্তরকাণ্ড আছে, তাহাতে মন্দোদরী বিলাপ হইতে সর্ব্বসৈন্য বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত।

মজুমদার মহাশয়ের বই পড়িয়া অনেক অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল। মজুমদার মহাশয় আমায় তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য নির্ব্বন্ধ

সহকারে অনুরোধ ও করিলেন। কিন্তু আমার আর সময়ও নাই সামর্থ্যও নাই যে একটী দীর্ঘ ভূমিকা লিখি। তবে মজুমদার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতায় মুগ্ধ হইয়াছি একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। রামায়ণ ঘটিত জটিল প্রশ্নসমূহ মীমাংসা যে একজনের দ্বারা বা এক পুরুষে বা একদেশে হইবে ইহা অসম্ভব। অনেক দেশের অনেক লোকে অনেক শত বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিলে অনেক প্রশ্নের সমাধান হইবে, অনেক-গুলির একেবারে সমাধান হইবে না। যিনি যতটুকু আগাইয়া দিতে পারেন ততটুকুই লাভ। মজুমদার মহাশয় কতকদূর আগাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ করি।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাব্য ও কবির পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়

রামায়ণ আদি কাব্য ও বাল্মিকী আদি কবি কি না?

চতুর্থ অধ্যায়

রামায়ণের সমাজ ও রামায়ণের কবির সমসাময়িকতা

পঞ্চম অধ্যায়

রামায়ণের ছন্দ ও রচনারীতি

ষষ্ঠ অধ্যায়

রামায়ণে আর্ষপ্রয়োগ

সপ্তম অধ্যায়

রামায়ণের উপাদান

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

রামায়ণে বাল্মিকীর রচনার পরিমাণ কত ?

দশম অধ্যায়

রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা

একাদশ অধ্যায়

প্রক্ষিপ্ততায় ক্ষতি কি ?

দ্বাদশ অধ্যায়

রামায়ণ কথার প্রচার

সমাজ আলোচনা

প্রথম অধ্যায়

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজের দেবতা

পঞ্চম অধ্যায়

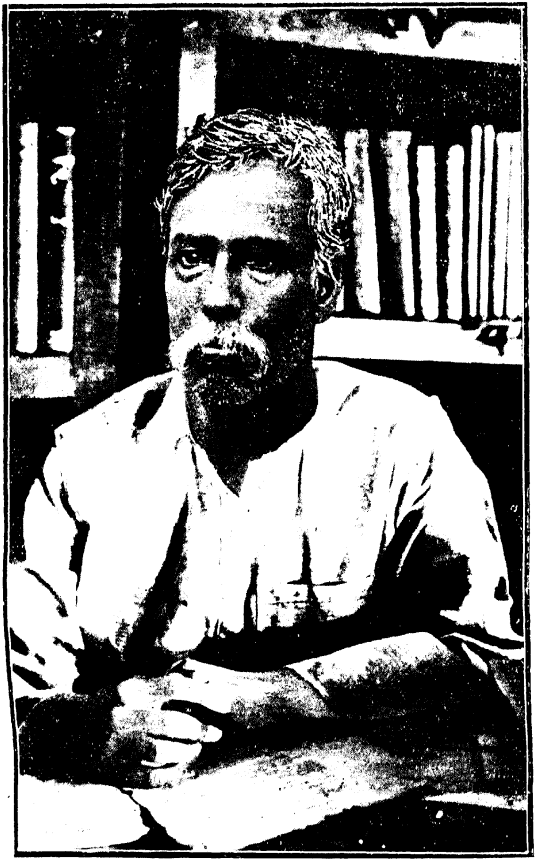
আহার্য্য ও আহার

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ

সপ্তম অধ্যায়

শাস্ত্রানুশাসন



রামায়ণের সমাজ লেখায় নিরত কেদারনাথ।

রামায়ণের সমাজ

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

কত যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে তমসার পুণ্যতটে মহাকবি বাল্মীকি তাঁহার অপূর্ব্ব বীণায় যে তান তুলিয়াছিলেন, আজিও এই অভিশপ্ত ভারতের নরনারীর তাপিত প্রাণে সেই তান-লয়-সমন্বিত অমৃত মধুর গীতি-কথা পরম শান্তি দান করিতেছে।

সে রাম নাই, দশরথের অযোধ্যা কোথায়, কোন কালে রেণুকণায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু কবির অমর নাম, আর তাঁহার নিত্য নূতন, অমৃতস্যন্দিনী রামায়ণ কথা। যতদিন জগতে হিন্দুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন এই রামায়ণ কথাও হিন্দু নরনারীর মনে অসীম বিশ্বাসের সহিত অচল অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

রামায়ণ হিন্দুর প্রাণের জিনিস, পরম আরাধ্য দেবতার স্থানীয়. সুখে দুঃখে হিন্দু নরনারী প্রাণারাম রামায়ণের অমৃত রস পান করিয়া আত্মার তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকেন এবং দৈনন্দিন জীবনের চরমফল লাভ হইল, মনে করিয়া বিমল আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

রামায়ণ হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রন্থ।

রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির লীলাময়ী কল্পনা প্রসূত অপূর্ব্ব রসাত্মক মহাকাব্য—জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বা জগতের আদি সভ্যতার লীলা নিকেতন আর্য্যভূমির আদর্শ সভ্যতার প্রত্যক্ষ ইতিহাস বলিয়া হিন্দু-নরনারী রামায়ণকে এরূপ সম্মানের চক্ষে দর্শন করে না। রামায়ণ আপনার বিপুল গর্ভে হিন্দুজাতির আদর্শকে মহান হইতে মহানে, উচ্চ হইতে উচ্চে প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুকে সেই পরম ও চরম আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছে, ইঙ্গিত করিতেছে, উপদেশ প্রদান করিতেছে।

"রঘুকুল রীতি চলি আ-ই।
প্রাণ যা-ই বরু বচন না যা-ই॥" (তুলসীদাস)

ধর্ম্মভীরু নীতিপরায়ণ হিন্দু এই ইঙ্গিত, এই আহ্বান বা উপদেশকে ধর্ম্মের ইঙ্গিত, ধর্ম্মের আহ্বান ও ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। ধর্ম্ম হিন্দুর প্রাণ, ধর্ম্ম হিন্দুর ধ্যান; তাই রামায়ণ হিন্দুর প্রাণের জিনিস এবং ধ্যানের দেবতা। তাই হিন্দু নরনারী রামায়ণের পূজা ও রামায়ণ চর্চ্চাকে স্বীয় স্বীয় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

কিন্তু রামায়ণ কি শুধু হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত? তাহা নহে। ইহা শুধু হিন্দুজাতির মহৎ চরিতাবলী ও উচ্চ নীতি-উপদেশ

সম্বলিত ধর্ম্ম গ্রন্থ নহে। ইহা এক দিকে যেমন সুবিশাল হিন্দুজাতির ধর্ম্ম ও নীতির গভীরতা প্রদর্শন করিতেছে, অপর দিকে সেইরূপ হিন্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন ও তাহার বিমল যশঃ-সৌরভ বিকীরণ করিতেছে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিভা ও গৌরবের আলোকে আলোকিত হইয়া ইহা বিশ্বসাহিত্যের অপরাপর শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য রত্নরাজির সহিত তুলনায় একখানা বিশিষ্ট মহাকাব্য বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা গ্রহণ করিতেছে।

রামায়ণ মহাকাব্য।

রামায়ণ শুধু ভারতের নহে, জগতের একখানা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। কাব্য হইলেও ইহা কোন এক যুগের ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির প্রত্যক্ষ ইতিহাস; ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার বিরাট মানদণ্ড।

রামায়ণ ইতিহাস।

কাব্য কল্পনার সৃষ্টি হইলেও কল্পনা যে প্রকৃত সৃষ্টিকে বা দেশ-কাল-পাত্রকে অতিক্রম করে না, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বপ্ন যেমন দ্রষ্টার চিন্তার বাহিরের কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব অপ্রত্যক্ষ পদার্থের কল্পনা করিতে অসমর্থ, কবিও সেইরূপ তাঁহার কল্পনাকে অবাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না।

‘আকাশ-কুসুম’ কল্পনায় উপনীত হইতে হইলেও আকাশের সহিত এবং কুসুমের সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ইহার পর এই কল্পনা এই দুই পদার্থের সামঞ্জস্যে অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে—ইহা অসম্ভব নহে। সুতরাং রামায়ণ কাব্য হইলেও তাহা ইতিহাস; বিরাট হিন্দুজাতির সমাজ, ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাচীনতম ইতিকথা।

রামায়ণ ধর্ম্ম-গ্রন্থ, রামায়ণ মহাকাব্য, রামায়ণ ইতিহাস; রামায়ণ হিন্দুর চক্ষে কল্পতরুসদৃশ। ধর্ম্মপিপাসু হিন্দু নরনারী তাহাতে যাহা চায়, পিপাসার তৃপ্তি বিধান করিয়া তাহা পায়। এই গ্রন্থ হইতে আমরাও তাহা দেখাইব; আমরা দেখাইব, রামায়ণ প্রকৃতই কল্পতরু সদৃশ। আমরা এই কল্পতরু সদৃশ রামায়ণের নিবিড় শাখা পল্লবাভ্যন্তর হইতে অমৃত ফল চয়ন করিতে চেষ্টা করিব। সহৃদয় পাঠক, সেই অমৃত ফলের রসাস্বাদনে আপনাদের অতীত-জাতীয় জীবনের প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুরেণুও কিছু পাইয়াছেন মনে করিলে—পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

রামায়ণ কল্পতরু সদৃশ।

——(*)——

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাব্য ও কবির পরিচয়।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। এই রামকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম রামায়ণ।

রামায়ণ।

রামায়ণ গীতের জন্য রচিত হইয়াছিল এবং কুশীলবগণ (গাথকগণ) কর্ত্তৃক গীতে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা গীতিকাব্য নামে উক্ত হইয়াছে।

এই গীতি-কাব্যের "রামায়ণ" নাম কে রাখিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না।

বাল্মীকির পৌলস্ত্য বধ।

রামায়ণ গীত কাব্যের রচয়িতা, মহামুনি বাল্মীকি। তিনি পৌলস্ত্যবধ নামে রাম ও সীতা চরিত সম্বলিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহা রামায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহা রামায়ণের প্রথম সংগ্রহ কারকের লিখিত মুখবন্ধ-ভাগ হইতে অবগত হওয়া যায়। যথা—

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিত ব্রতঃ॥" ৭।১।৪

রামায়ণ রচনা কালে তাহাতে কি পরিমাণ গীত সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং তাহার আকার কত বড় ছিল,—বর্ত্তমান প্রচলিত রামায়ণগুলি দৃষ্টে তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

রচনার পরিমাণ অজ্ঞাত।

রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকির পরিচয়ও তাঁহার রচিত এই কাব্যের ভিতর হইতে অবগত হওয়া যায় না।

বর্ত্তমান সময় ভারতের নানাস্থানে বাল্মীকি-রামায়ণ বলিয়া যে সকল রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাহার সম্পূর্ণ অংশই বাল্মীকির রচনা নহে। বোধ হয় যাহা আদি রচনা বলিয়া দাবীর যোগ্য, তাহাও সন্দেহের বহির্ভূত নহে।

এই সন্দেহজনক রচনার ভিতরও রামায়ণের কবি বাল্মীকির বিশেষ পরিচয় কিছু নাই।

রামায়ণ লিপিযুগে কাণ্ড ও সর্গে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল। আদিকাণ্ডের প্রথম হইতে চতুর্থ—এই চারিটী সর্গে রামায়ণের ভূমিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বাল্মীকির আশ্রম স্থান।

এই ভূমিকাভাগ হইতে অবগত হওয়া যায় যে মহাকবি বাল্মীকির আশ্রম ছিল, তমসা নদীর তীরে এবং সেই তমসাতীর ছিল জাহ্নবীর অদূরে অবস্থিত। বাল্মীকি স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তথায় গিয়াছিলেন।

"জগাম তমসা তীরং জাহ্নব্যাস্ত্ব বিদূরিতঃ।" ৩।১।২

রামায়ণের আর এক স্থলে বাল্মীকির আশ্রমের উল্লেখ আছে; তাহা অযোধ্যাকাণ্ডের ৫৬ সর্গে। রাম বনে গমন করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হন।

ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া।
রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্॥ ১২

*   *   *

ইতি সীতাচ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্ব্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্॥ ১৬।২।৫৬

রাম চিত্রকূটে যাইয়া এই বাল্মীকির আশ্রমের নিকটেই কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভরত আসিয়া রামকে অযোধ্যায়

ফিরাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই স্থানে আসিতেও রামকে তমসা নদী অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং এই চিত্রকূট প্রদেশেরই এক অংশে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

এইরূপ সামান্য পরিচয়-আভাস ব্যতীত রামায়ণের আর কোন স্থলে বাল্মীকির অন্য কোন পরিচয় নাই। আধুনিক রামায়ণগুলির পরিশিষ্ট ভাগে 'উত্তরকাণ্ড' নামে যে কাণ্ডটী যুক্ত আছে, তাহা একেবারেই বাল্মীকির রচিত নহে। ঐ কাণ্ডে বাল্মীকি এবং তাঁহার আশ্রমের বর্ণনা আছে। তাহা নিঃসন্দেহ পরবর্ত্তী কল্পনা বলিয়া, তাহার আলোচনা এখানে পরিত্যক্ত হইল।

——(*)——

তৃতীয় অধ্যায়।

রামায়ণ আদিকাব্য ও বাল্মীকি আদি কবি কিনা?

রামায়ন আদি কাব্য এবং তাহার রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি আদি কবি—এই দুইটী কথাই দুইটী সত্যসিদ্ধান্তের ন্যায় স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের মনে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এইরূপ বিশ্বাস আমাদের মনে এবং সমাজের মনে জাগ্রত থাকিবার যে কোন কারণ নাই, তাহা নহে; প্রচলিত রামায়ণগুলিতেই এই দুইটী কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের সর্ব্বশেষ সর্গে (১৩০ সর্গে) এই দুইটী কথা, এইরূপ ভাবে আছে—

"ধর্ম্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদি কাব্য মিদং চার্য্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম॥" ১০৫

এই শ্লোকটী দ্বারা স্পষ্টই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রাচীন (কবি) বাল্মীকির রচিত এই যে কাব্য (রামায়ণ), তাহা আদি কাব্য।

এই শ্লোকটীর বিষয় নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে ইহা কবি বাল্মীকির বহু পরবর্ত্তী কালের কোন লেখকের লেখনী প্রসূত।

বিচার।

কোন পদার্থকে "আদি" বলিয়া অভিহিত করিবার ভিতরই বহুর অস্তিত্বের ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে, কেননা একাধিক পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলে আদি, অর্থাৎ প্রথম বা দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি স্থান নির্দ্দেশ হইতে পারে না।

উপর্যুক্ত উক্তি, 'পুরা বাল্মীকি' বা 'আদি কবি বাল্মীকি' নির্দ্দেশের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইতে পারে। জগতে একজন মাত্র কবি যতদিন থাকেন, ততদিন কেহ তাঁহাকে 'আদি কবি' বা 'প্রথম কবি' বলিয়া নির্দ্দেশ করে না; করিবার প্রয়োজনও হয় না। কোন কবিকে তাঁহার সমসাময়িক কবি বা লেখকগণও "পুরাকবি" বা 'প্রাচীন কবি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বহু পরবর্ত্তী লেখকগণ বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিকে বা কবিদিগকেই 'প্রাচীন' বা 'পুরা' বিশেষণে বিশেষিত করিতে পারেন। সুতরাং রামায়ণকে আদি কাব্য বলিয়া এবং বাল্মীকিকে "পুরাকবি" বা "আদিকবি" বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তাহা যে বাল্মীকির নিজ উক্তি নহে বা সমসাময়িক কোন লেখকেরও উক্তি নহে—ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে।

এই নির্দ্দেশ পরবর্ত্তী কোন কবির নির্দ্দেশ হইলেই যে রামায়ণ আদি কাব্য ও তাহার রচয়িতা বাল্মীকি আদি কবি হইতে পারেন না, এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যাইতে পারে না। ইহার বিচার প্রয়োজন।

বাল্মীকি আদি কবি নহেন।

বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, 'ভাগবত' কার বাল্মীকিকে আদি কবি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ব্রহ্মাকে আদি কবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

"তেনে ব্রহ্মহৃদায় আদি কবয়ে।"

ভাগবতকার সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে কি অর্থে আদি কবি কল্পনা করিয়াছেন, আমরা তাহার ঐতিহাসিক বিচার এখানে করিব না; এস্থলে কেবল এই বলিয়াই এই উক্তি গ্রহণ করিব যে—ভাগবতকার যখন এই শ্লোকটী প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও বাল্মীকি যে আদি কবি, এই বিশ্বাস জনসমাজে

প্রচলিত ছিল না; অথবা থাকিলেও তাহা তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। *

রামায়ণের রচনা আদি রচনা নহে।

আদি কবি ব্রহ্মা কোন পৃথক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার উল্লেখ আমরা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। রামায়ণের রচনার পূর্ব্বের কোন কাব্য গ্রন্থও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই যে 'রামায়ণ' আদি কাব্য হইবে, এ নির্দ্দেশও অনেকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। বহু মনীষী ব্যক্তিই রামায়ণের সরল সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিয়া ইহাকে কাব্য সাহিত্যের আদি রচনার নিদর্শন বলিতে কুণ্ঠিত। এরূপস্থলে ইহাই মনে হয় যে, রামায়ণ রচনার সমকালে ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও কাব্য রচিত হওয়া সম্ভব। তাহা কাল-বিপ্লবে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই সকলের বহু উপকরণই রামায়ণ ও মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, মহাকবি বাল্মীকি যে খুব প্রাচীন কবি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবিষ্কৃত সংস্কৃত কাব্যসমূহের মধ্যেও যে রামায়ণ আদি কাব্য—প্রচুর মত ভেদ থাকিলেও আমরা এ কথা স্বীকার করিতেছি।

---

* সৃষ্টির উৎস যাহার নিকট অবস্থিত তিনি কবি, সৃষ্টির উপকরণ যিনি যোগাইয়া থাকেন তিনিও কবি, সৃষ্টি কর্ত্তাও কবিই; এই হিসাবে ব্রহ্মাকে কবি বলা হয় নাই তো? বাল্মীকির নামে যে অদ্ভুত রামায়ণ প্রচারিত আছে, তাহাতে কিন্তু এই ভাবের আভাস আছে। যথা, বাল্মীকি বলিয়াছেন—

"রামায়ণং মহারত্নং ব্রহ্মহৃৎক্ষীরধাবভূৎ॥
নারদান্তঃ সমাসাদ্য ক্রমান্মম হৃদিস্থিতম্।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণো লোকে নিঃশেষমবতিষ্ঠতে॥" ২২। ২৭ সর্গ।

অর্থ—এই রামায়ণরূপ মহারত্ন ব্রহ্মার হৃদয়রূপ ক্ষীরসাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, পরে নারদের অন্তরে থাকিয়া ক্রমে আমার (বাল্মীকির) হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়াছে।

নিম্নের উদ্ভট শ্লোকটির কোন ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও ইহা বাল্মীকিকে প্রাচীনতম কবি বা আদি কবি বলিয়া এক বচনে কবি শব্দের প্রয়োগে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছে, ব্যাসের উদ্ভবে কবি শব্দ দ্বিবচনান্ত হইয়াছিল, অতঃপর দণ্ডির আবির্ভাবে কবি শব্দের বহুবচন সৃষ্ট হইয়াছিল।

জাতে জাগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাঽভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥"

এই সকল উক্তিও যে বহু পরবর্ত্তী কল্পনার ফল, তাহা বলাই বাহুল্য।

——(*)——

চতুর্থ অধ্যায়।

রামায়ণের সমাজ ও রামায়ণের কবির সমসাময়িকতা।

মহর্ষি বাল্মীকি রাম জন্মিবার ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন—এই আর একটী মিথ্যা সংস্কার বহু বঙ্গদেশীয় হিন্দুর মনে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। অশিক্ষিত সমাজ এই অলীক কথাকে অলৌকিক মনে করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; প্রাচীন সংস্কারাবদ্ধ শিক্ষিত সমাজ অলীকতা বা অনৈতিহাসিকতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভক্তিভাবে এ বাণীর প্রতি নীরবে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নব্য-রুচির শিক্ষিতগণ কিন্তু এই উক্তিকে অলীক, অসম্ভব এবং অনৈতিহাসিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

কবি তাঁহার চিত্রিত সমাজের সমসাময়িক।

বাস্তবিক পক্ষে এই সংস্কারের কোন মূল নাই। বাল্মীকি রচিত রামায়ণের ১ম সর্গটী পাঠ করিলেই অতি স্পষ্টভাবে অবগত হওয়া যাইবে যে, বাল্মীকি যে সমাজের যে যে আদর্শ নরনারীর চরিত্র সমষ্টি লইয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বাল্মীকির সমকালে জীবিত ছিলেন এবং ইহাও অবগত হওয়া যাইবে যে পিতৃসত্য পালনান্তে রাম যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য পরিচালন করিতেছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি সেই সময়, এই রামচরিত বা রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে দুইটী মিথ্যা সংস্কারের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি, সেই সংস্কারগুলির বীজ রামায়ণের ভিতরই কোন প্রকারে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনে অলীক ভাব জাগাইয়া রাখিবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিল। এ স্থলে কিন্তু সেরূপ অবস্থা নহে। রাম অপেক্ষা রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তিতার—এই যে অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক উক্তি—এই উক্তির উৎপত্তি স্থান মহর্ষিকৃত রামায়ণ নহে; আর্ষ রামায়ণের কোন স্থলেই এরূপ অসম্ভব উক্তি বা উক্তির আভাস নাই।

এই অলীক উক্তির প্রচারক, বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস ওঝা। বাঙ্গালী পাঠক কৃত্তিবাস ওঝার পদ্য রামায়ণ হইতে এই অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক সংস্কার লাভ করিয়াছেন যে, রাম জন্মিবার যাইট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রত্নাকর নামক দস্যু * বাল্মীকি নাম গ্রহণ করিয়া রামলীলা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের কল্পনা।

অলৌকিকতা ধর্ম্মপ্রাণ জাতির নিকট কোনকালেই অশ্রদ্ধার বিষয় হয় নাই; আজও তাহা হইতেছে না। তাই ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির এই কল্পনাকে প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।

কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিতে যাইয়া মহাকবি বাল্মীকির দোহাই দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি অনেক স্থলেই মূল কাব্যকে দূরে রাখিয়া চলিয়াছেন। কেবল যে কৃত্তিবাসই মূল কাব্যকে অবহেলা করিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তাহা

রামায়ণের প্রতি শিক্ষিত সমাজের অশ্রদ্ধার কারণ।

* রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যানটী কৃত্তিবাস পারস্য ভাষায় লিখিত নিজাম ডাকাইতের গল্প হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিজাম ডাকাত সাধু উপদেশে নিজামদ্দীন আউলিয়া নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি দিল্লীর নিজামদ্দীন আউলিয়া নহেন।

নহে; কৃত্তিবাসের ন্যায় যিনি যখন রামায়ণ লিখিতে বসিয়াছেন, তিনিই তখন চিন্তার অবসর পাইলেই—বাল্মীকিকে উপেক্ষা করিয়াছেন; পরন্তু বহু অলীক অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক কথা স্ব স্ব গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ কারণেই বঙ্গীয় পাঠকগণও বাল্মীকির রামায়ণের প্রকৃত বিষয় হইতে ক্রমে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। এবং মূল বাল্মীকির রামায়ণের ঐতিহাসিক সত্যকে এখন সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালার গৌরব কবি কৃত্তিবাসের উপর এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করিয়াও আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—কবি কৃত্তিবাস বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গে যে কমনীয় ভূষণ সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। কৃত্তিবাসের রামায়ণোক্ত

বাঙ্গালার হিন্দুসমাজে কৃত্তিবাসের প্রভাব অধিক কেন?

চিত্রগুলি বাঙ্গালীর রক্ত মাংসের প্রভাবে গঠিত। কৃত্তিবাসের নীতিকথা, কৃত্তিবাসের উপদেশ, বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, বাঙ্গালীর মর্ম্মকথা; কৃত্তিবাসের ধর্ম্মকথা, বাঙ্গালীর গৃহধর্ম্মের সারকথা। কৃত্তিবাস দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় বাল্মীকির কল্পিত মূল ভারতীয় মূর্ত্তিগুলিকে আপন হস্তে লইয়া স্বাধীনভাবে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আপনার জাতীয় ছাঁচে ফেলিয়া বাঙ্গালীর প্রাণের মূর্ত্তি—ঘরের জিনিস—নিত্যকার গৃহধর্ম্মের বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন; তাই বাঙ্গালী সে চিত্রগুলিকে যথার্থতঃ আপনার হৃদয়ের ধন, গার্হস্থ্য জীবনের সহচর ও ধর্ম্মজীবনের পথ প্রদর্শক বলিয়া মনে করেন। কৃত্তিবাসের রাম সীতা, বাল্মীকির রাম সীতার সহিত তুলনীয় না হইলেও বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেই রাম-সীতা লক্ষ্মীনারায়ণরূপে বিরাজমান। এইজন্যই—বাঙ্গালীর নিকট জগতের বরেণ্য

কবি বাল্মীকি অপেক্ষা কৃত্তিবাসের গৌরব অধিক, বাঙ্গালার সমাজে কৃত্তিবাসের প্রভাব অসামান্য।

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের তুলনায় বাঙ্গালীর নিকট কৃত্তিবাসের আদর আর একটী কারণে অধিক। বাঙ্গালী কবি কৃত্তিবাস সাধারণের অতি সহজ-বোধ্য সরল বাঙ্গালায় তাঁহার "অমৃতকথা" প্রচার করিয়াছিলেন। এই হিসাবে ভারতের কবি বাল্মীকির ভাষা স্বল্প শিক্ষিতের নিকট দুষ্প্রবেশ্য। ইহা অশ্রদ্ধার কারণ না হইলেও অনাদরের একটী প্রধান কারণ।

এইরূপ কারণেই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাল্মীকি রামায়ণ অপেক্ষা তুলসী দাসের হিন্দি রামায়ণ, তামিল ভাষীদিগের নিকট কবি কুম্বনের তামিল রামায়ণ, জৈনদিগের নিকট জৈনস্থরী হেমচন্দ্রের জৈন-রামায়ণ অধিক আদরণীয়।

এইবার প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক। রাম জন্মিবার ষষ্ঠি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল—এ কথা বাল্মীকির রামায়ণে নাই। বাল্মীকির দস্যুত্বের অলৌকিক কাহিনীও বাল্মীকি-রামায়ণে নাই। কবির পরিচয় মূল রামায়ণে অতি সামান্য যাহা আছে, তাহা আমরা "কাব্য ও কবির পরিচয়" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এইক্ষণে কোন্ সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছিল তাহারই আলোচনা করিব।

কবির সমসাময়িক সমাজ।

রামায়ণের প্রথম সর্গে আছে, একদা তপ ও স্বাধ্যায় নিরত মুণিপুঙ্গব নারদকে সম্ভাষণ করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন:—

কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥ ২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্ব্বভূতেষু কো হিতঃ।
বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈক প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩
আত্মবান কো জিত ক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ।
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযোগে॥ ৪। ১। ১

অর্থ—সম্প্রতি এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান্, সর্ব্বভূত হিতকামী বিদ্বান্, সমর্থ, প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান্ এবং সমরে দেবতারও ভয়জনক?

মহর্ষি বাল্মীকি নারদের নিকট এইরূপ একটী আদর্শ চরিত্র লোকের বিষয় জানিতে চাহিলে দেবর্ষি নারদ অযোধ্যার তৎকালীন নরপতি মহাবাহু রামকেই সেই সমস্ত গুণের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করেন এবং সংক্ষেপে তাঁহার কার্য্যকলাপ—রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাবনা হইতে আরম্ভ করিয়া বনে গমন, সীতা হরণ, রাবণ বধ, রামের পুনরায় অযোধ্যায় আগমন ও রাজ্য গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনা—বর্ণন করিয়া শেষ বলিলেন—

পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥ ৯০। ১। ১

অর্থ—দশরথাত্মজ অযোধ্যাপতি শ্রীমান রাম এইরূপে রাজ্য লাভ করিয়া সম্প্রতি পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন। *

* "পালয়ামাস" অতীত কালবাচক ক্রিয়াপদ হইলেও রামায়ণের টিকাকারগণ বর্ত্তমান কালের অর্থ করিয়াছেন। 'পালয়ামাস' শব্দটীকে তাঁহারা আর্ষ প্রয়োগ বলিয়া মনে করেন। ফলতঃ এই ১ম সর্গে রাম সম্বন্ধে বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত—এই তিন

এই নারদ-বাল্মীকি সংবাদের আলোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, নারদ যখন বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া বাল্মীকির নিকট রামচরিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তখন রাম চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ক্লেশ অতিক্রম করিয়া আসিয়া অযোধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছিলেন।

নারদের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়াই বাল্মীকি রামচরিত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের এই পাঠ দ্বারা রাম ও রামচরিতকার বাল্মীকি যে একই সময়ের লোক এবং তিনি যে তাঁহার সমসাময়িক সমাজেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকৃত হইতেছে।

কিন্তু আদিকাণ্ডের এই বিবরণ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে—বিচারসহ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইবার মত উপাদান ইহাতে পাওয়া যাইবে না। তাহার প্রধান কারণ, এই রচনা মহাকবি বাল্মীকির নিজস্ব নহে। রামায়ণের শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া লিপিযুগে যিনি রামায়ণকে কাণ্ডে ও সর্গে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাবদ্ধ করিয়াছিলেন, এগুলি তাঁহারই স্বকপোলকল্পিত উক্তি।

সংগ্রহকারের কার্য্য।

আমরা রামায়ণে বর্ণিত যুগকে অতি প্রাচীন যুগ বলিয়া মনে করিতেছি; সেই সুপ্রাচীন যুগে লিপি-প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল না; বেদের

কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—১ম সর্গের ২য় শ্লোক ও ১৯ শ্লোকের ক্রিয়াপদ বর্ত্তমান কালের। ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯০ শ্লোকের ক্রিয়াপদ অতীত কালের এবং ৯২, ৯৭, ৯৮ শ্লোকের ক্রিয়াপদগুলি ভবিষ্যতকাল বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপরপক্ষে 'পালয়ামাস' শব্দটীকে ইংরেজী "প্রেজেণ্ট পারফেক্ট" রূপেও ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। একযুগের লেখাকে অন্য যুগের বলিয়া প্রকাশ করিতে গিয়া পুরাণকারেরা অধিকাংশ পুরাণ গ্রন্থেই এইরূপ ক্রিয়াপদের গোল করিয়াছেন।

বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গুলিও তখন রচিত হয় নাই। বেদের মন্ত্রসমূহ তখন শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা করিতে হইত এবং সমাজ শাসন-বিধি জনগণের স্মৃতিতে পোষিত হইত। এই জন্যই ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি এখনও 'শ্রুতি' এবং মনু, পরাশর প্রভৃতি সমাজ-বিধি গুলি 'স্মৃতি' নামে পরিচিত হইয়া থাকে।

শ্রুতি-স্মৃতির ন্যায় রামচরিত বা "পৌলস্ত্যবধ" কাব্যও মুখে মুখেই রচিত হইয়াছিল। তারপর, লিখন বিজ্ঞান প্রচলিত হইলে, তাহা সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। লিখন প্রণালী সমাজে প্রচলিত হইবা মাত্রই যে রামায়ণ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে; লিখন প্রণালী প্রচলিত হইবারও বহু শতাব্দী পরে—সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৪র্থ হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়, কোন অজ্ঞাত নামা, অথচ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি, এই গীত-কাব্যের জন-মুখে রক্ষিত শ্লোকাবলী যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করিয়া এবং স্থানে স্থানের অপূর্ণ অংশ নিজে রচনা করিয়া দিয়া, তাহাকে সর্গে ও কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সংগ্রহ-কর্ত্তা কবি যে একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি যে মুখবন্ধ দ্বারা বাল্মীকি রামায়ণকে জন সমাজে গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই মুখবন্ধই বর্ত্তমান প্রচলিত সংস্করণ গুলির প্রথম ভাগে বিন্যস্ত, দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রতি-সংস্কারক কবি, বাল্মীকির সম্পূর্ণ গীত গুলিই যে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারিতেছি না; তিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, নিজ কল্পনার আশ্রয়ে তাহা তিনি পূরণ করিয়া লইয়াছিলেন। আমাদের অনুমানের প্রমাণ আমরা "প্রক্ষিপ্ত বিচার" শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিলাম।

এই কবিই প্রথম বাল্মীকির রচনাকে সর্গে ও কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি পৌলস্ত্যবধ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া ছয়টী কাণ্ডে

রামায়ণ প্রথম প্রচার করেন। তাঁহার পর, যাঁহার কল্পনা রামায়ণকে আরও অধিকতররূপে গুরুভার গ্রস্ত করিয়াছিল, তিনি তাঁহার স্বপ্রণীত উত্তর-কাণ্ডটীও রামায়ণে যোজনা করিয়া দিয়া এবং তাহাতে তাঁহার নিজ সমসাময়িক বহু ভাব প্রবেশ করাইয়া ইহার প্রাচীন ভাবকে একেবারে হেয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের এই সকল নির্দ্দেশকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে নারদ-বাল্মীকি সংবাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্যই থাকেনা; কেননা, আমরাই

মন্তব্য।

নারদ-বাল্মীকি সংবাদ সম্বলিত সর্গগুলিকে আদি রামায়ণের বহু পরবর্ত্তী যুগের কোন অজ্ঞাত নামা কবির রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি।

আমরা ১ম সর্গের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহাই দেখাইয়াছি যে, প্রচলিত বাল্মীকি রামায়ণে—রামায়ণ যে রামের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, তাহার কোন আভাস নাই; বরং তাহা যে বাল্মীকির সমসাময়িক ঘটনার চিত্র লইয়া রচিত হইয়াছিল, এই সংগ্রাহক কবির সময়ও তাহা স্বীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং রত্নাকর দস্যুর কাহিনীটী যে তখনও কবি বাল্মীকির নামেরসহিত যুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল না, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

বাল্মীকি যে রামের সমসাময়িক ঋষি, তাহা রামায়ণের অন্য এক স্থানে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশও আমরা "কাব্য ও কবির পরিচয়" প্রসঙ্গে করিয়া আসিয়াছি। এইরূপ প্রমাণকে সমসাময়িক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে যাহারা কুণ্ঠিত, তাহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য—আমরা বাল্মীকি বা রামের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই। মহাকবি বাল্মীকির রচনা বলিয়া যে কাব্য বা মহাকাব্য প্রচলিত আছে, সেই মহাকাব্যে বর্ণিত সমাজ ও সভ্যতার চিত্রই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চম অধ্যায়।

রামায়ণের ছন্দ ও রচনা রীতি।

রামায়ণের দ্বিতীয় সর্গে এইরূপ একটী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে যে—এক নিষাদ কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চ-মিথুন মধ্যে ক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে নিহত করিলে সেই মর্ম্মঘাতী ঘটনা দর্শন করিয়া ঋষি বাল্মীকির শোকাভিভূত চিত্ত হইতে সেই সময় অকস্মাৎ যে শোকসূচক চতুষ্পাদবদ্ধ ও সমান অক্ষর সমন্বিত বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শোক-সঞ্জাত বলিয়া—শ্লোক-নামে পরিচিত হইয়াছিল।

বাল্মীকির সেই প্রথম শ্লোকটী এই—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥" ১৫ | ১ | ২

অকস্মাৎ এইরূপ কথা ছন্দোবদ্ধভাবে তাঁহার রসনা হইতে বহির্গত হওয়ায় তিনি তাঁহার শিষ্যকে বলিলেন—"এই চতুষ্পাদ বদ্ধ, প্রতিপাদে সমান অক্ষর ও বীণালয়-সমন্বিত বাক্য শোকসময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে; অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক"।

(বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

এস্থলেও পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এ বৃত্তান্তটীও বাল্মীকির নিজের রচনা নহে; হয় বাল্মীকি তাঁহার সমসাময়িক কোন ব্যক্তি দ্বারা ইহার প্রচার করাইয়াছেন, না হয়, ইহা তাঁহার বহু পরবর্ত্তী কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচনা। আমরা দ্বিতীয় উক্তিকেই সমীচীন বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে গ্রহণ

করিয়াছি। এই রচনা বাল্মীকির কোন সমসাময়িক লেখকের হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় পরবর্ত্তীযুগের বিশ্বসিত বিষয়ের কল্পনা থাকিতে পারিত না।

এই প্রসঙ্গে আরও তুইটী অলীক সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল আছে। (১) "মা নিষাদ…" এই শ্লোকের যে ছন্দ, সেই অনুষ্টুপ নামক প্রাচীন ছন্দটী বাল্মীকির প্রথম রচিত ছন্দ; (২) শ্লোক—শোক হইতে উদ্ভূত এবং বাল্মীকি তাহার আবিষ্কারক।

এই তুইটী কথার আভাস রামায়ণে খুব স্পষ্ট নাই বটে কিন্তু এই বিশ্বাস মানুষের সংস্কারের ভিতর খুব দৃঢ়ভাবে আসন সংস্থাপন করিয়া আছে।

"মা নিষাদ…" শ্লোকটী বাল্মীকির রচিত নহে—একথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। কিন্তু অনুষ্টুপ ছন্দ ও শ্লোক শব্দের প্রথম প্রচারক যে বাল্মীকি নহেন, সুপ্রাচীন বেদত্রয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

"মা নিষাদ…" শ্লোকটী ও রামায়ণের অধিকাংশ শ্লোক অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। অনুষ্টুপ ছন্দের রচনাকে প্রাচীন কালে 'শ্লোক' বলাহইত। রামায়ণেও—

> পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
> শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥ ১৮ | ১ | ২

এই শ্লোকের 'শ্লোক' শব্দ দ্বারা অনুষ্টুপ্‌কেই বুঝাইতেছে।

আধুনিক অনুষ্টুপ ছন্দে ও প্রাচীন অনুষ্টুপ ছন্দে অনেক প্রভেদ। আধুনিক অষ্টাক্ষর অনুষ্টুভের লক্ষণ এই যে—ইহার প্রত্যেক পাদে পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণগুরু হইবে; দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে ৭ম বর্ণ লঘু হইবে; প্রথম ও তৃতীয় পাদে সপ্তম বর্ণ গুরু হইবে; অন্যান্য বর্ণের গুরু-লঘু কোন নিয়ম নাই। যথা——

আধুনিক অনুষ্টুপ।

> শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমম্।
> দ্বিচতুঃ পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥ শ্রুত-বোধ

এস্থলেও 'শ্লোক' শব্দে অনুষ্টুপ ছন্দের রচনাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রাচীন বৈদিক অনুষ্টুভের এইরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিলনা। যাস্কের নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে যে, বেদের প্রচলিত সাতটী ছন্দের অন্যতম (ত্রিপদা)

বৈদিক অনুষ্টুপ— যাস্কের মত।

গায়ত্রীর সহিত অপর একটী অষ্টাক্ষর পাদ সংযুক্ত হইলেই তাহা অনুষ্টুপ হইবে।[১] অক্ষর সম্বন্ধে ঋক্ বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে—'অক্ষর দুই একটীর হ্রাস বৃদ্ধির জন্য ছন্দ বিগত হয়না'। এই হেতুতে ত্রয়স্ত্রিংশদক্ষরা বিরাট ছন্দকেও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অনুষ্টুপ বলা হইয়াছে।[২]

ঋক বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রভাগে অনুষ্টুপ ছন্দের অভাব নাই। এমন কি, প্রায় দশ হাজার ঋক মন্ত্রের মধ্যে ৮৫৫টী মন্ত্রই অনুষ্টুপ ছন্দে

ঋক বেদে অনুষ্টুপ ছন্দ।

রচিত। সুতরাং অনুষ্টুপ রচনা যে বাল্মীকির রসনা হইতে প্রথম নির্গত হইয়াছিল—এই সংস্কার যুক্তিসহ নহে।

পুরাতন অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত একটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বা সনো মৃলাতীদৃশে॥ ঋক ৪। ৪৭। ১

ঋক বেদের ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—অনুষ্টুপ ছন্দ কেবল মাত্র দেবতার উদ্দেশে গীত-রচনায় ব্যবহৃত হয়।

এই উক্তির ভিতরও মিথ্যা সংস্কারের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে।[৩]

---

১ নিরুক্ত ৭। ১২। ৯ ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১। ১। ৬ খণ্ড।

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—গায়ত্রী ত্রিষ্টুপ, জগতী ও অনুষ্টুপ ইহারাই সকল ছন্দের স্বরূপ। অন্য ছন্দগুলি ইহাদেরই অনুবর্ত্তী; কেননা যজ্ঞে ইহাদের প্রচুর প্রয়োগ হয়। বঃ সাঃ পঃ গ্রন্থ ৩। ১৫। ৪ এখানে ব্রাহ্মণের "প্রচুর" কথা, ভাষ্যকারের "কেবল মাত্র" কথার বিরোধী।

অনুষ্টুপের ইতিহাস বিষ্ণুপুরাণেও একটু ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—অনুষ্টুপ নামক ছন্দ ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম নির্গত হইয়াছিল।

বোধ হয় এইরূপ উক্তিসমর্থন জন্যই ভাগবতকার ব্রহ্মাকেই আদি কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইতিহাসের বিচারে বিষ্ণুপুরাণ পরবর্ত্তী গ্রন্থ হইলেও বাল্মীকির আবিস্কার যে বিষ্ণুপুরাণকার স্বীকার করিতেছেন না, বিষ্ণুপুরাণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

ঋক্ বেদে অনুষ্টুপ শব্দ।

এস্থলে আর একটী কথা এই যে, রামায়ণের যে ছন্দের উল্লেখ হইতে আমরা অনুষ্টুপ শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছি, রামায়ণের কোন স্থানেই এই অনুষ্টুপ নামের ব্যবহার নাই! এই ছন্দটী প্রাচীন বটে, কিন্তু অনুষ্টুপ নামটী কি তত প্রাচীন? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণে ছন্দের যে বর্ণনাটী দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনুষ্টুভেরই বর্ণনা এবং অনুষ্টুপ নামটীও ঋক বেদে আছে।[১] সুতরাং এই ছন্দ অতি প্রাচীন।

দ্বিতীয় কথা—শ্লোক শব্দের উৎপত্তি শোক হইতে কিনা?

শ্লোক শব্দের উৎপত্তি।

শোক হইতে শ্লোক শব্দের উৎপত্তি বিচিত্র নহে। কিন্তু বাল্মীকির উচ্চারিত—"মা নিষাদ…" এই শোক-কথা হইতেই যে শ্লোক শব্দের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, এইবিশ্বাস এবং কিম্বদন্তীর মূলেও যে কোন সত্য আছে, তাহা মনে হয় না। কেন না, বেদের বহু মন্ত্রে শ্লোক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে ঋক্‌বেদের একটী মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইল।

"মিমীহি শ্লোক মাস্যে পর্জ্জন্য ইবততনঃ।"

বেদের নিরুক্তকার যাস্কও শোক হইতে শ্লোকের উদ্ভব নির্দ্দেশ করেন

১ ঋকবেদ ১০।১৩০।৪

নাই। নিরুক্তকার বলেন— "শ্রুধাতু হইতে উৎপন্ন হেতু শ্রবণ-যোগ্য যাহা—তাহা শ্লোক"।

আদিম ভাষার অভিব্যক্তি পরবর্ত্তী ব্যাকরণের অনুশাসনের অধীন নহে, মনে করিয়া যাস্কের নির্দ্দেশকে প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ থাকিলেও বেদের দৃষ্টান্ত উল্লেখের পর এ সম্বন্ধে আর তর্কের অবকাশ নাই।

রামায়ণে অনুষ্টুপ ছন্দের রচনা ব্যতীত আরো অনেক গুলি পুরাতন ও নূতন ছন্দের রচনা আছে। পুরাতন ছন্দ গুলি বৈদিক; নূতন ছন্দ গুলি

ছন্দ

অধিকাংশই আধুনিক অর্থাৎ খৃষ্টোত্তর যুগের। রামায়ণের তিন চতুর্থাংশেরও অধিকভাগ অনুষ্টুপ ছন্দের রচনায় অধিকৃত, অবশিষ্ট অংশ উপেন্দ্রবজ্রা, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, বংশস্থবিল, মৃগেন্দ্রমুখ, অপরবক্ত্র, পুষ্পিতাগ্রা, আখ্যানকী, রুচিরা, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অসম্বাধা, বৈশ্বদেবী, প্রহর্ষিণী, বসন্ততিলকা, মালিনী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে রচিত। অনুষ্টুপ ব্যতীত অন্যান্য ছন্দের শ্লোক—কোনটীর একটী, কোনটীর দুইটী, কোন ছন্দের বা চারি-ছয়টী আছে। বংশস্থবিল ছন্দের রচনা কিছু বেশী আছে।

অনুষ্টুপ ব্যতীত এই অতিরিক্ত ছন্দের রচনা প্রায় প্রতি সর্গের শেষে এবং কোন কোন সর্গের মাঝেও আছে।

এই ছন্দ গুলির মধ্যে অনুষ্টুপ খুব প্রাচীন; উপেন্দ্রবজ্রা ও ইন্দ্রবজ্রা প্রাচীন, অবশিষ্ট গুলি অর্ব্বাচীন।

ছন্দ প্রাচীন হইলেই যে রচনাও প্রাচীন হইবে, এ যুক্তি বিচার সহ নহে।

খুব প্রাচীন অনুষ্টুপ রামায়ণে অতি সামান্য আছে। এমন কি, যে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ"—শ্লোকটী মহাকবির মুখ নিঃসৃত আদি কবিতা (বা শ্লোক) বলিয়া জগতে পরিচিত, সেই জগৎ প্রসিদ্ধ শ্লোকটীও আধুনিক অনুষ্টুভের নিয়মে রচিত; প্রাচীন নিয়মের অনুষ্টুপ নহে।

ইহাতেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, যে কতিপয় সংখ্যক প্রাচীন নিয়মে রচিত প্রাচীন ছন্দের শ্লোক আছে, তাহা ব্যতীত রামায়ণের অবশিষ্ট রচনা সকলই পরবর্ত্তী কালে রচিত।

রচনা ও ছন্দ বিচার।

ইহা অবিশ্বাস করিলে চলিবে না যে, আধুনিক কবিও প্রাচীন ছন্দে কবিতা রচনা করিতে পারেন; এবং প্রাচীন কবির রচনাও নবীন কবির কবিত্ব প্রভাবে স্বীয় প্রাচীনতার গৌরব হারাইয়া সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আমরা এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বৈদিক রচনার পরিবর্ত্তন রীতি।

প্রথমতঃ কিপ্রকারে প্রাচীন রীতির অনুষ্টুপ শ্লোক সমূহ নবীন রীতিতে পরবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা দেখাইব; তারপর বেদসংহিতা-গুলিতেও যে আধুনিক নিয়মের অনুষ্টুপ আছে, তাহা দেখাইব; অতঃপর বাঙ্গালী পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে বাঙ্গালী কবির বাঙ্গালা কবিতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান বাল্মীকির রামায়ণে কি প্রকারে ছন্দ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ও হইয়াছে তাহা দেখাইব।

প্রাচীন অনুষ্টুপ্ রীতিতে রচিত ঋক্ সংহিতার যে ঋক্‌টী ২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আধুনিক অনুষ্টুপে পরিবর্ত্তিত করিলে এই রূপ হইতে পরে—

ক্ষেত্রস্য পতিনা সর্ব্বে হিতনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বাহি সনো মৃলাতি চেদৃশে॥

ছন্দের মিলের জন্য এস্থলে ২। ১টী অক্ষরের ও শব্দের পরিবর্ত্তন হইল মাত্র। ঋক্ বেদের আর একটী অনুষ্টুপ এইরূপ—

সোমেনাদিত্যা বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথোনক্ষত্রাণামেষা মুপস্থে সোম আহিতঃ॥ ১০। ৮৫।২

ইহাকে আধুনিক নিয়মে পরিবর্ত্তন করিলে এইরূপ হইতে পারে—

সোমেন বলিনো দেবা সোমেন পৃথিবী মহী।
নক্ষত্রাণা ময়ং সোম উপস্থে সোম আহিতঃ॥

সাম বেদের একটী অনুষ্টুপ সঙ্গীত এইরূপ—

মৎস্যপায়ি তে মহঃ পাত্রস্যেব হরিবো মৎসরো মদঃ।
বৃষাতে বৃষ্ণ ইন্দু র্বাজী সহস্র সাতমঃ। উঃ ১২ | ৬ | শেষমন্ত্র।

বর্ত্তমান অনুষ্টুপের নিয়মানুসারে এই মন্ত্রের তিন চরণেই অক্ষরের সামঞ্জস্য নাই। কেবল চতুর্থ চরণে আট অক্ষর আছে ও তাহা বর্ত্তমান নিয়মেই নিয়মিত আছে। ইহাতে আরো একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহার দ্বিতীয় পাদে বার অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাকে বর্ত্তমান অনুষ্টুভের নিয়মে পরিবর্ত্তন করিলে এইরূপ হইতে পারে—

মৎস্যপায়ি মহস্তেতৎ হরিবো মৎসরোমদঃ
বৃষ্ণো বৃষাহিতে ইন্দুর্বাজী সহস্র সাতমঃ॥

শ্রুতিতে বিরাজিত থাকিবার সময় মন্ত্র সমূহের যেরূপ উচ্চারণ ছিল, সংহিতায় নিবদ্ধ হওয়ায় তাহাদিগের সেই উচ্চারণ অনেক স্থলেই রক্ষিত হয় নাই। শ্রুতিতে যাহা 'ইন্দর' বা 'ইন্দর' উচ্চারিত হইত, সংহিতায় তাহা 'ইন্দ্র' শব্দে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বহু মন্ত্র লিখিবার সুবিধার জন্য ও বুঝিবার সুবিধার জন্য, কায়া পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার ফলেই আমরা বেদ সংহিতাতেও আধুনিক নিয়মে গ্রথিত অনুষ্টুপ দেখিতে পাই। আধুনিক নিয়মের অনুষ্টুপ ছন্দে বেদমন্ত্র গ্রথিত আছে দেখিলেই যে তাহা আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহা নহে।

যে দেবাস ইহস্থন বিশ্বে বৈশ্বানরা উত।
অস্মভং শর্ম্ম সপ্রথো গবেহশ্বায় যচ্ছত॥ ঋক ৮ | ৩০ | ৪

এই ঋকের প্রথম চরণটী আধুনিক ছন্দে গ্রথিত; দ্বিতীয় চরণেও "গবেহশ্বায়" শব্দটী ব্যতীত অপর অংশ আধুনিক নিয়মে আছে; এ স্থলে সন্ধি না করিলেই অথবা একটী অক্ষর অধিক বসাইয়া 'গবেত্বশ্বায়' করিলেই আর কোন গোল থাকে না।

অন্যত্র— "যমায় ঘৃতবদ্ধবি র্জ্জহোত প্র চ তিষ্ঠত।

সনো দৈবেষ্বাযম দ্দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে॥" ঋক্ ১০ | ১৪ | ১৪

এই ঋকের "দৈবষ্বাযনদ্দীর্ঘ" শব্দটী সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া দিলে সমস্ত ঋকটীই আধুনিক রীতি-সঙ্গত অনুষ্টুপ হইবে। যথা—

যমায় ঘৃতবদ্ধবি র্জ্জহোত প্র চ তিষ্ঠত।

সনো দেবেষু অযমদ্ দীর্ঘমায়ুঃ প্রজীবসে॥

সামবেদের নিম্ন লিখিত সঙ্গীতটীকে বর্ত্তমান অনুষ্টুপ রীতির আদর্শ স্বরূপ বলিলে, খুব বেশী ক্রটী হইবে না।

জাতঃ পরেণ ধর্ম্মণা যৎ সবৃদ্ধিঃ মহাভুবঃ।

পিতা যৎ কশ্যপস্যাগ্নিঃ শ্রদ্ধা মাতামনুঃ কবিঃ॥ (আগ্নেয় ১। ৯। ১০)

ইহার প্রথম পাদের 'ধর্ম্মণা' শব্দকে "ধর্ম্মেণ" করিলে, ইহা ভাষায় ও ছন্দে—উভয় প্রকারেই বর্ত্তমান সংস্কৃত রচনার অনুরূপ হয়।

রামায়ণের যে স্থলেই ব্যতিক্রম পাঠ দৃষ্ট হইবে, সেই স্থলেই লক্ষ্য করিলে এইরূপ পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যাইবে। এই প্রয়োজনে ব্যতিক্রম পাঠগুলিও গ্রন্থের স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে।

বৈদিক মন্ত্র সমূহে এইরূপ ছন্দের গোল থাকিলেও মন্ত্র উচ্চারণ কালে বা সামগান কালে, বৈদিক ঋষিগণ যে ছন্দ মিলাইয়া তাহা পাঠ করিতেন বা গান করিতেন, তাহার আভাস ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আছে। এস্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বামদেব স্তোত্রের' সাম সঙ্গীতটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। সামটী এইরূপ—

অভীষু ণঃ সখীনামবিতা জবিতৃণাং। শতং ভবাস্যূতিভিঃ॥

এই সামটীর প্রত্যেক চরণে আটটী অক্ষর স্থলে সাতটী করিয়া অক্ষর আছে; সুতরাং মোটের উপর তিনটী অক্ষরই কম। এই তিন অক্ষর পূরণের জন্য ঋক বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ব্যবস্থা করিয়াছেন, "পু-রু-ষ" এই তিন অক্ষর তিন চরণে যথাক্রমে প্রক্ষেপ করিয়া সামটী গাইতে হইবে। এইরূপ করিলে, সামটী হইবে এইরূপ—

অভিষু ণঃ সখীনাং পু, অবিতা জরিতৃণাং রু, শতং ভবাস্যূতিভিঃ ষঃ।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—বঃ সাহিত্য পঃ সংস্করণ ৩১৮ পৃঃ)

এই শ্রুতি মন্ত্র ও সঙ্গীত সমূহের আলোচনায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন কবিদিগের হস্তলিখিত গ্রন্থাবলীর আলোচনায় আমাদের মনে এই স্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, শ্রুতি মন্ত্রসমূহকে সংহিতাবদ্ধ করিবার সময়ই—আধুনিক ছন্দ ও রীতি রক্ষার জন্য—বহু শব্দের কায়া পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

অনেকে ব্যাকরণের অনুশাসনের প্রতি নির্ভর রাখিয়া রচনার সময় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; উহা রচনা বিচারের উপায় হইলেও নিরঙ্কুশ উপায় নহে। বৈদিক রচনার সঙ্গতি নির্দ্দেশ জন্য বৈদিক ব্যাকরণ সৃষ্ট হইয়াছিল; বৈদিক ভাষার অপ্রচলনের পর পাণিনির প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইলে, তখন আর কেহ বৈদিক ব্যাকরণের অনুসরণ করিতেন না। ইহা একটী সঙ্গত এবং সুযুক্তি পূর্ণ মত হইলেও লৌকিক যুগের সমস্ত লেখকই যে পাণিনির নিয়ম মান্য করিয়া চলিতেন, তেমন কিন্তু দেখাযায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে পাণিনির পরবর্ত্তী যুগের রচিত ধর্ম্ম-সূত্র গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

চলিত ব্যাকরণের অনুশাসন লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের আলোচনায় ডাঃ জর্জ্জবুলার এইরূপ নিয়ম অমান্যের দৃষ্টান্ত বিশেষ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বুলার দেখাইয়াছেন—আপস্তম্ব পরবর্ত্তী যুগের সূত্রকার হইয়াও সূত্র রচনায় অনেক স্থলে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি অনেক স্থলে বৈদিক রীতি উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন, কোন স্থলে পাণিনিকে উপেক্ষা করিয়া বৈদিক রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন; কোন কোন স্থলে আবার বৈদিক রীতি অনুসরণ না করিয়া পাণিনির রীতিই গ্রহণ করিয়াছেন।[৫]

এইরূপ স্থলে, রচনা রীতি ও ব্যাকরণের অনুশাসন নীতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলেই যে নিরাপদে রচনার প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা নিরাকরণ করা যাইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না।

বাল্মীকির রামায়ণের সকল রচনাই যে আধুনিক রীতিতে রচিত, তাহা নহে; না হইলেও রচনায় সন্দেহ করিবার অনেক কারণ রামায়ণের ভাষায় ও ছন্দে বর্ত্তমান আছে। বাল্মীকির ভাষাই কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাল্মীকির নামেই পরিচিত থাকিতে পারে, বাঙ্গালী পাঠককে তাহা প্রদর্শন জন্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই খানা কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা ও ছন্দ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বাল্মীকির রচনার পরিবর্ত্তনের অনুরূপ ইতিহাস ইহাতে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে।

বাঙ্গালা রচনায় পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অপর "তিনখানি পুথি অবলম্বন করিয়া" প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিশেষ যত্নে প্রকাশিত পুঁথির "মুনিগণের শ্রীরাম সম্ভাষণ" নামক প্রথম অংশ এইরূপ—

৫ Georg Bhuler's Introduction to Apastamba. P. P. xlm--xlv.

ত্রৈলোক্য বিজয়ী রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর। ১
দুর্জ্জয় রাক্ষসে মারি খণ্ডাইল ডর॥ ২
মুনিগণে মেলিঞা বলেন হইল পরিত্রাণ।৩
অযোধ্যাকে জাই সভে শ্রীরামের করিতে কল্যাণ॥ ৪
ত্রিভুবনের মুনি আইলা রামের দুয়ারে। ৫
দ্বারী ভিতর যাঞা শ্রীরামে গোচরে॥ ৬
মাধব নামে দ্বারী শ্রীরামে নোয়ায় মাথা। ৭
চতুর্দ্দিগের মুনির শ্রীরামে কহে কথা॥ ৮
দ্বারীর কথা শুনিঞা শ্রীরামের হাস্যবদন। ৯
কোন্ কোন্ মুনির হৈল আগমন॥ ১০
শ্রীরামের কথা শুনিয়া দ্বারিগণ কহে। ১১
সমুদ্র মথনে যেন অমৃত মহে॥ ১২

(এইস্থলে দ্বারী ৩২টী পংক্তিতে মুনিগণের নাম কীর্ত্তন করিল।)

দ্বারীর বচন শুনিঞা হাসেন গদাধর। ১৩
সকল মুনি লইঞা কৈল রামের গোচর॥ ১৪
চতুর্ব্বেদ পড়ে মুনি কেহো সাম গান। ১৫
বেদ পড়িঞা রামের মুণ্ডে দেন দুর্ব্বাধান॥ ১৬
একে একে বন্দিল মুনি সভার চরণ। ১৭
আশীর্ব্বাদ দিলমুনি হরষিত মন॥ ১৮

এইস্থলে মুনিগণ রামের বীরত্বের ব্যাখ্যান করিতে করিতে লঙ্কার বীরগণের নাম লইতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রজিতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসংশা করিয়া ফেলিলেন, শুনিয়া রাম বলিলেন—

দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবনে জানি। ১৯
আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি॥ ২০

ইন্দ্রজিতের তরে কেহ নহে স্থির। ২১
ত্রিভুবন জিনিঞা কুম্ভকর্ণের শরীর ॥ ২২
মাথা কাটিলে না মরে বৈরী না ধরে টান। ২৩
হেনবীর থাকিতে করিলে ইন্দ্রজিতের বাখান॥ ২৪
কোন তপ করিলেক কাহার পাইলেক বর। ২৫
সভা থাকিতে বাখান কেনে রাবণ কোঙর॥ ২৬
ইন্দ্রজিৎ সনে আমার নাহি দরশন। ২৭
ইন্দ্রজিৎ মারিলেন বীর লক্ষ্মণ ॥ ২৮
মুনিবলে রাম তুমি সংসারের অধিকারী। ২৯
তোমাকে অধিক লক্ষ্মণের সংগ্রাম পুরস্করী॥ ৩০

* * *

বার বৎসর যে ফল মূল নাহি ভক্ষে। ৩১
বার বৎসর যে স্ত্রীরমুখ নাহি দেখে ॥ ৩২
জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ করয়ে অনাহার। ৩৩
হেন জনার হাথে দুহাঁর সংহার ॥ ৩৪
তাহার যজ্ঞ ভঙ্গ করে যেই জন। ৩৫
সেই জনা মরে দুই রাবণ নন্দন ॥ ৩৬
মুনির কথা শুনিয়া শ্রীরামের তরাস। ৩৭
ডাক দিঞা অনিল লক্ষ্মণ আপনার পাশ ॥ ৩৮
রাম বলেন্ত আশ্চর্য্য কথা কহিলেন মুনি। ৩৯
তুমি কথা কহ ভাই তোমার মুখে শুনি ॥ ৪০
জত দুঃখ পাইল আমি দণ্ডকারণ্যে। ৪১
তত দুঃখ পাইল আমি তোমার কথনে ॥ ৪২
রামের বচনে লক্ষ্মণ জোড় কৈল হাথ। ৪৩

মুনির কথা মিথ্যা নহে শুন রঘুনাথ ॥ ৪৪
সীতার মুখ দেখিতে আমার কোন্ অধিকার। ৪৫
নিত্য চরণ নেহালিঞা হই নমস্কার ॥ ৪৬
হার কেয়ূর সীতার কিছুনাহি চিহ্নি। ৪৭
দুই গাছ নূপুরের শব্দ মাত্র শুনি ॥ ৪৮
ফলমূল আনিয়া দিএ তোমার আগে। ৪৯
ধর বলিঞা ফল মূল দেহ মোর আগে। ৫০
ধর বলিঞা ডাক দেহ ধরিএ ততক্ষণ। ৫১
খাইবারে না বল কেমতে করিব ভক্ষণ। ৫২
লক্ষ্মণের বোল শুনিঞা শ্রীরাম বাথে। ৫৩
লক্ষ্মণকে কোলদিল প্রভু পসারিঞা দুই হাথে ॥ ৫৪
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন অগস্ত্য মহামুনি। ৫৫
মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সাবধানি ॥ ৫৬
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী। ৫৭
উত্তরাকাণ্ডে গাইঞা দিল প্রথম শিকলি ॥ ৫৮

এই রচনাকে প্রকৃত কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১০০৯ বঙ্গাব্দার ও ১৫০২ শকাব্দার হস্ত লিখিত দুইখানা পুঁথি দৃষ্টে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ভাষা ও ছন্দের বিষয় পরে আলোচনা করিব। পংক্তি সংখ্যাগুলি আমাদের নিজের, তাহা আলোচনার সুবিধার জন্য প্রদত্ত হইল।

পরিষদের প্রচারিত গ্রন্থের আদর্শ পশ্চিম বঙ্গের। আমাদের নিজ গ্রন্থাকারে যে হস্ত লিখিত ৩ খানা উত্তরকাণ্ড আছে, তাহার একখানা হইতে ঠিক ঐ অংশই—কোনরূপ সংশোধন না করিয়া —নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

রাম সম ক্ষেত্রি নাহি ভুবন ভিতর। ১
দুর্জ্জর রাক্ষস মারি খণ্ডাইল ডর॥ ২
মুনিগণে বোলে রামে কৈল পরিত্রাণ। ৩
আমা সভাইর বরে রাম হওক কল্যান॥ ৪
অগস্ত আদি প্রধান যথেক মুনিগণ। ৫
নানাবেশ গলাএ রুদ্রাক্ষ অভরণ॥ ৬
চতুর্দ্দিগের মনি আইল রামচন্দ্রের দ্বারে। ৭
দ্বারি গিয়া জানাইল রামের গোচরে॥ ৮
অবধান কর গুসাই শুন নিবেদন। ৯
নানা বেশ ধরি মুনি নানা অভরণ॥ ১০
নানা দেশের মুনি আইল গুণের সাগর। ১১
কুন আজ্ঞাকর প্রভু দেওত উত্তর॥ ১২
অঙ্গিরস অত্রিক বাল্মীকি মহারিসি। ১৩
দেখিতে আসিছে পূর্ব্ব দিগের তপস্বি॥ ১৪
রুদ্রমুখ নাম ধরে মধুরস রিসি। ১৫
দেখিতে আসিছে কত পশ্চিমের তপস্বি॥ ১৬
বিশ্বামিত্র জামদগ্নী কাস্যপ গৌতম। ১৭
উত্তর হইতে আইল মুনি করি পরিশ্রম॥ ১৮
মুনির নাম শুনি রাম হৈলা হরষিত। ১৯
চল চল দুত গিয়া আনহ ত্বরিত॥ ২০
রামের বচনে দ্বারি চলিল সত্ত্বর। ২১
যুড় হাতে দাঁড়াইল মুনির গোচর॥ ২২
শুন গুসাই সব বচন আমার। ২৩
আনন্দ হিদয় প্রভু তুমা দেখিবার॥ ২৪

সকল মুনিগণ গেল রামের গোচর ।
আনন্দে উঠিল দেখি রাম রঘুবর ॥
বেদ বাণি করি মুনি করএ মঙ্গল ।
আসির্ব্বাদ কৈলা সবে হস্ত যুগল ॥
একে একে দিলা রামে সমাকে আসন ।
বিষ্ণু অবতার রাম কমল লোচন ॥
নমস্কার করি দিলা পাদ্য অর্ঘ জল ।
যুড় করে মুনি সবেক পুছন্তি কুশল ॥
মুনিসবে বলে রাম তুমার কল্যাণ ।
রাক্ষসের হাতে তুমি পাইলা পরিত্রাণ ॥
তুমি আর লক্ষ্মণবর সিতান সুন্দরী ।
তরিলা রাক্ষস হাতে বড় ভাগ্য করি ॥
বিষম বল ধরে রাক্ষস ব্রহ্মার বরে ।
হেন রাক্ষসের সনে কোন বীরে পারে ॥
দুর্জ্জয় বীর ইন্দ্রজিৎ ত্রিভুবন জিনি ।
হেন বীর মারে লক্ষ্মণ অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
রামে বলেন রাক্ষস দুর্জ্জয় প্রতাপ ।
ত্রিভুবন জিনিতে পারে যার বীর দাপ ॥
বড় বড় রাক্ষস সব অপার বিক্রম ।
এক এক জনের মুর্ত্তি যেন সাক্ষাতে কাল যম ॥
(অপাঠ্য) ।
ত্রিভুবন জিনি ॥
ভাই সকলের ডরে কেহ নহে স্থির ।
ত্রিভুবন জিনি কুম্ভকর্ণের শরীর ॥

কাটিলে না মরে ত্রিভুবনে না ধরায় টান। ৪৯
হেন বীর থাকিতে ইন্দ্রজিতের বাখান॥ ৫০
কোন তপ কৈল বেটা কার পাইলবর। ৫১
সমা এড়ি বাখান কেন রাবণ কোঙর॥ ৫২
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত গোসাই তোমার গোচর। ৫৩
রাক্ষসের বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর॥ ৫৪
রামের বচনে তবে অগস্ত মহামনি। ৫৫
রাক্ষস বৃত্তান্ত কহে অপূর্ব্ব কাহিনী॥ ৫৬
মুনির কথা শুনি রাম হরষিত মন। ৫৭
নিসন্দ হইয়া শুনে যত পাত্র গণ॥ ৫৮
যাহার কণ্ঠে বাণী করে নানা কেলি। ৫৯
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুরস পাঁচালী॥ ৬০

ইহার পর অগস্ত্য বারটী শ্লোকে বা চব্বিশটী পংক্তিতে—ইন্দ্রজিত কিপ্রকারে ব্রহ্মার বরে অজেয় হইয়াছিল, তাহা বলেন। পরিষদের পুস্তকে কিন্তু তাহা নাই। ইহার পর—ইন্দ্রজিত ব্রহ্মার নিকট বর চাহিতেছে—

বার বৎসর যেবা স্ত্রীমুখ না দেখে। ৬১
দ্বাদশ বৎসর যেবা অনাহারে থাকে॥ ৬২
বার বৎসর নিদ্রা ছাড়ে যেবা জন। ৬৩
সেহি সে আমারে পারে করিতে নিধন। ৬৪
এহিমত বর মকে দেহত অখন। ৬৫
শুনিয়া চিন্তিত হইল যত দেবগণ॥ ৬৬
তপের কারণ ব্রহ্মা যাইতে না পারে। ৬৭
সকল বর দিয়া ব্রহ্মা গেল নিজ ঘরে॥ ৬৮

সাহিত্য পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকে কিন্তু এই ভাবটী নাই। ইহার পর মুনি আরও অনেক কথা বলিলে পর—

মুনির কথা শুনি তবে রাম মহাশয়। ৬৯
মুনির তরে পুছেন রাম বিস্মিত হৃদয়॥ ৭০
কভু মিথ্যা নহে মুনি তোমার বচন। ৭১
কেমতে শক্ত এত করিল লক্ষ্মণ॥ ৭২
ইসকল সন্দে কথা না বাসি প্রত্যয়। ৭৩
ইহেন আশ্চর্য্য কথা কহ মহাশয়॥ ৭৪
একত্রিত বনবাসে থাকি তিনজন। ৭৫
বন হনে ফলমুল আনেন লক্ষ্মণ॥ ৭৬
যত ফল আনেন ভাই আমার গোচর। ৭৭
কত খাই কত দেঞি লক্ষ্মণ বরাবর॥ ৭৮
খাইত নিছেন ফল দেখিছি বিধিত। ৭৯
এই সে কারণে গোসাঞি না জাঞি প্রতিত॥ ৮০
বেলি অবসানে করি একত্রে শয়ন। ৮১
প্রভাত হইলে মাত্র হয় জাগরণ॥ ৮২

এইরূপে রাম পদে পদে সন্দেহ করিলে, লক্ষ্মণকে ডাকা হইল। এই কথাগুলিও পরিষৎ-গ্রন্থে নাই।

অতঃপর লক্ষ্মণ আসিলে রাম বলিলেন—

কহ কহ লক্ষ্মণ ভাই মম বিদ্যমানে। ৮৩
দ্বাদশ বৎসর নিদ্রা ছাড়িলা কেমনে॥ ৮৪
ফলমুল খাইয়া শেষে দিয়াছি তোমারে। ৮৫
তাহা না খাইলা কেনে কহত আমারে॥ ৮৬
কভু নাহি দেখতুমি সীতার বদন। ৮৭

ইসব অদ্ভুত কথা কহত লক্ষ্মণ ॥ ৮৮
কেমতে আছিলা তুমি দ্বাদশ বৎসর। ৮৯
সকল কহিবা ভাই আমার গোচর ॥ ৯০

ইহার পর লক্ষ্মণ যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম পরিষৎ গ্রন্থের অনুরূপ হইলেও বলিবার রীতি এবং ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করিলাম না।

আমাদের আদর্শ খানা ১১৩৭ বঙ্গাব্দের। অর্থাৎ পরিষদ গ্রন্থের আদর্শ হইতে ১২৮ বৎসরের পরের। পরিষদ গ্রন্থ পশ্চিম বঙ্গের, ইহা পূর্ব্ব বঙ্গের। পূর্ব্ব বঙ্গের এই গ্রন্থখানারও সর্ব্বত্র কৃত্তিবাসেরই ভনিতা আছে; সুতরাং ইহা যে কৃত্তিবাস ওঝার রচিত, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আপাততঃ বর্ত্তমান নাই।

কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। পরিষদের আদর্শ গ্রন্থ-দ্বয় এক খানা ষোড়শ ও অপর খানা সপ্তদশ শতাব্দীর, আমাদের আদর্শ অষ্টাদশ শতাব্দীর। অতঃপর কেরি সাহেব শ্রীরামপুর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে (১৮০২ অব্দে) কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রিত করেন। ইহার পর ১৮৫০ অব্দে ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের হস্তে সংশোধিত হইয়া বটতলা হইতে কৃত্তিবাস রামায়ণের সুসংস্কৃত সংস্করণ বাহির হয়। ঐ সুসংস্কৃত সংস্করণই এখন পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাস ওঝার রচিত রামায়ণ বলিয়া আদৃত ও সুপরিচিত।

কৃত্তিবাসের নিজস্ব রচনা যে কিরূপ ছিল, তাহা বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণ গুলি দৃষ্টে বা পাঠে একেবারেই বুঝিবার উপায় নাই। ইহার কারণ, যুগ প্রভাব। প্রতি শতাব্দীতে ছন্দ, ভাষা ও ভাব কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া

চলিয়াছে, আলোচ্য আদর্শ দ্বয়ের উদ্ধৃত অংশের পরস্পর—তুলনায় তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হইবে।

এস্থলে প্রধান লক্ষ্যের বিষয় গুলি এই— পরিষদ গ্রন্থের ৭ম পংক্তিতে মাধব নামে এক দ্বারীর নাম আছে, আমাদের গ্রন্থে তাহা নাই। পরিষদের গ্রন্থে ১৩শ ছত্রের পরে ৩২টী ছত্রে মুনিগনের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমাদের আদর্শের ১৩ হইতে ১৮—এই ৬ ছত্রে অতি সংক্ষেপে তাহা আছে। তারপর হইতে—উভয় গ্রন্থে বর্ণনার উলট পালট হেতু—বিষম বৈষম্য দৃষ্ট হয়। ভাব এক, কিন্তু ভাষা পৃথক। কোন কোন স্থলে আমাদের আদর্শে বাহুল্য উক্তি (৬১—৬৮ পংক্তি) আছে। পরিষদ গ্রন্থে যেরূপ ছন্দ পতন আছে, আমাদের গ্রন্থে তাহা নাই। আমাদের গ্রন্থের ছন্দ আপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। এইরূপ আমাদের পুঁথি হইতেও জয়গোপাল সংস্করণ আরো বিশুদ্ধ। জয়গোপাল সংস্করণ হইতেও আধুনিক বিংশ শতাব্দীর সংস্করণ গুলি অধিকতর উন্নত।

পরিবর্ত্তনে লক্ষ্যের বিষয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে জয়গোপাল সংস্করণে যে কৃত্তিবাসের গল্পভাগ ব্যতীত কৃত্তিবাসের ভাষার কোনও চিহ্ন আছে, তাহাই আমাদের এখন মনে হয় না। কৃত্তিবাসের গ্রাম্য সরস ভাবের উপর জয়গোপাল কিরূপ কবিত্বের গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছেন, নিম্ন লিখিত রাম-বিলাপটী তাহার একটী সামান্য মাত্র দৃষ্টান্ত; আমাদের হস্ত লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডে তাহা নাই।

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমল মুখি করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।

রাখিলেন বুঝি পদ্মাননে লুকাইয়া ॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥”

ঊনবিংশ শতাব্দীর জয়গোপাল ১ম পংক্তিতে “গোদাবরী নীরে” করিয়াছিলেন; বিংশ শতাব্দীর জয়গোপালগণ “নীরে” শব্দকে “তীরে” করিয়াছেন।

আমরা আর অধিক কথা বলিয়া পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না। কৃত্তিবাসের পঞ্চদশ শতাব্দীর অস্পষ্ট ভাব, বিশৃঙ্খল ছন্দ ও অতি গ্রাম্য ভাষা, যেরূপে কালের প্রভাবে, দেশের প্রভাবে, ব্যক্তির প্রভাবে, চারিপাঁচশত বৎসরের মধ্যেই একেবারে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছে, বাল্মীকির আদিম রচনার পরিবর্ত্তনও ঠিক সেইরূপ ভাবেই সাধিত হইয়াছে—এই কথাই আমাদের এস্থলে বক্তব্য; এবং এই জন্যই আমরা এই প্রসঙ্গে বেদ-মন্ত্র গুলিরও অতি শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিয়াছি।

পরিবর্ত্তনের ফল।

বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসের মহাভারত মাত্র পাঁচশত বৎসরের পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হয় নাই; সহস্র সহস্র বৎসরের যুগ-বিপ্লব ও যুগ-প্রভাব ইহাদের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; সহস্র সহস্র কবির কল্পনা ও কৌশল ইহার মধ্যে কার্য্য করিয়াছে। যুগ প্রভাব অতিক্রম করিবার শক্তি জাগতিক কোন পদার্থেরই নাই; যুগ-যুগান্তরের রামায়ণ তাহা অব্যাহত ভাবে অতিক্রম করিবেন—সাধ্য কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রামায়ণে আর্ষ প্রয়োগ।

বেদ-ভাষার বন্ধন সম্বন্ধে আধুনিক ব্যাকরণকারগণ বলেন—

"দোষাঃসন্তি নসন্তীতি পৌরুষেষু প্রযুজ্যতে।
বেদে কর্ত্তুরভাবাচ্চ দোষাশঙ্কৈব নাস্তিনঃ"॥ (কলাপ)

অর্থাৎ দোষ আছে, কি নাই, তাহা পুরুষ রচিত বিষয়েই ধর্ত্তব্য; বেদে কর্ত্তার অভাব হেতু তাহাতে কোন দোষের আশঙ্কাই নাই।

এই অধিকার রামায়ণ-মহাভারতকে দেওয়া হয় নাই। রামায়ণের যুগে ব্যাকরণের অনুশাসন ছিল, তখন সেই অনুশাসন অনুসারেই কাব্য রচনা চলিত। এখনকার ব্যাকরণে ও তখনকার ব্যাকরণে যে প্রভেদ ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এখন যেমন, তখনও তেমনি, ব্যাকরণের বিধিকে প্রয়োজন হইলেই কবিরা উপেক্ষা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠের দোষ, কোন কালেই নাই; বিশেষতঃ কবিদের।

"নিরঙ্কুশাহি কবয়ঃ"।

প্রাচীন কবিরা ব্যাকরণের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিয়া যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, সে সকলকে ভুল বলা হয় না; ঐ সকল ভুল-ব্যবহারের নাম আর্ষ প্রয়োগ। *

কাব্যের ভিতর এইরূপ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ভুল প্রয়োগ কবিরা ইচ্ছা করিয়াও করেন, অনিচ্ছায়ও করেন।

---

*মনুর টীকাকার কল্লুক ভট্ট কিন্তু লিখিয়াছেন— "ঋষির্বেদ স্তত্র ভব আর্ষো ধর্ম্মোপদেশো যো বৈদিকঃ।" ১২।১০৬ অর্থাৎ যাহা বৈদিক, তাহা আর্ষ। কেন না ঋষি অর্থ বেদ, আর বেদে যাহা উৎপন্ন, তাহাই আর্ষ।

আর্ষ প্রয়োগ যে গ্রন্থে অধিক আছে, সেই গ্রন্থই যে প্রাচীনত্বের হিসাবে অধিক সম্মানের, তাহা নহে। কেন না, আর্ষ প্রয়োগ দ্বারা রচনার প্রাচীনত্ব নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায় না। প্রাচীন কবিদিগের এইরূপ ভুল প্রয়োগের অনুকরণে আধুনিক কবিরাও যে অনুরূপ ত্রুটী প্রদর্শন করিতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক সাহিত্যেও বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবি-শ্রেষ্ঠ কালিদাসের রচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আর্ষ প্রয়োগ—রচনার কাল নির্ণয়ের বিশেষ উপায় নহে।

বাল্মীকি স্বীয় রচনায় "ত্রিয়ম্বক" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই শব্দটী প্রাচীন পাণিনি ব্যাকরণ-সিদ্ধ হইলেও আধুনিক ব্যাকরণ-সিদ্ধ নহে। কালিদাস 'কুমার সম্ভবে' এই অপ-প্রয়োগ করিয়াছেন। "ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ।" কালিদাসের এই অপ প্রয়োগে তাঁহার টীকাকার মল্লিনাথ বিপন্ন হইয়া—এই প্রমাদকে "মহাকবি প্রয়োগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কালিদাসে আর্ষপ্রয়োগ।

রামায়ণে ভূরিভূরি আর্ষপ্রয়োগ আছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'বিশ্বকোষ' হইতে আদি ও অযোধ্যা কাণ্ডের আর্ষপ্রয়োগ গুলি উদ্ধৃত করিলাম। অন্যান্য কাণ্ড হইতে সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা পাইলাম, তাহাই প্রদান করিলাম।

রামায়ণে আর্ষপ্রয়োগ।

আর্ষপ্রয়োগ।	স্থান।	শুদ্ধ-প্রয়োগ।
প্রমুমোদ	আদি ১সর্গ ৮৫ শ্লোক	প্রমুমুদে
অনপায়িনম্	„ ২ | ৯ ”	অনপায়ি
করুণ বেদিত্বাৎ	„ ২ | ১৪ ”	করুণা বেদিত্বাৎ

হণ্যাৎ	আদি	২ | ২৯ শ্লোক	হতবান্
সোচ্চতাং	„	৯ | ২১ „	সউচ্চতাং
আশ্রমপদঃ	„	১০ | ১৫ „	আশ্রমপদং
পুত্রিয়াং	„	১৬ | ৯ „	পুত্রীয়াং
অর্দ্দয়ন	„	১৭ | ৩৪ „	আর্দ্দয়ন
ততোত্থায়	„	১৯ | ২২ „	ততউত্থায়
ব্যষীদত	„		ব্যষিদৎ
করিষ্যেতি	„	২১ | ৮ „	করিষ্যইতি
প্রশাদতি	„	২১ | ১৩ „	প্রেশাস্তি
দুরাক্রামান্	„	২১ | ৯৮ „	দুরাক্রমান্
তপ্যতাং	„	২৩ | ৬ „	তপতাং
বসতে	„	২৩ | ৮ „	বসতি
অভিরঞ্জয়ন্	„	২৩ | ২০	অভ্যরঞ্জয়ন্
অভিজায়ত	„	৩৮ | ২৩ „	অমভ্যজায়ত
অনুগচ্ছত্ম	„	৩৯ | ১৪ „	অনুগচ্ছত
করিষ্যাম	„	৪০ | ৯ „	করিষ্যামঃ
নিবর্ত্তত	„	৪০ | ১১ „	নিবর্ত্তধ্বং
সমুপাসত	„	৪৩ | ১ „	সমুপাস্তে
অনুব্রজৎ	„	৪৩ | ১৫ „	অনুব্রজেৎ
উষ্য	„	৪৮ | ৯ „	উষিত্বা
দৃশ্য	„	৪৮ | ১১ „	দৃষ্ট্বা
স্মরতাং	অযোধ্যা	১ | ৩ „	অস্মরতাং
সপত্নি	„	৮ | ২৬ „	সপত্নী
অভিদধ্যুষী	„	১৬ | ২১ „	অভিধ্যায়ন্তী

গচ্ছতি	অযোধ্যা ৩২।	৮ শ্লোক	গচ্ছন্তী
মেখলীনাং	" ৩২	২১ "	মেখলিনাং
জিজ্ঞাসিতুং	" ৩২	৪২ "	জ্ঞাতুং
নপায়য়ন	" ৪১	৯ "	নাপায়য়ন
ততোবাছ	" ৫১	৮ "	ততউবাচ
বৎস্যামহেতি	" ৫২	২৮ "	বৎস্যামহইতি
প্রণমৎ	" ৫২	৭৯ "	প্রাণমৎ
আনয়ামাস	" ৫৫	৩৯ "	আনিন্যে
অভিবাদয়ন	" ৫৬	১৬ "	অভ্যবাদয়ন
উদ্ধরং	" ৫৩	৫২ "	উদধরং
সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে	" ৬৭	২৬	সংবদন্ত উপতিষ্ঠন্তে

আদিকাণ্ডের অধিকাংশ সর্গকেই আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করি; অথচ দেখা যাইতেছে, ঐ কাণ্ডে আর্ষ প্রয়োগের অবধিই নাই; অন্যান্য কাণ্ডে যে কম, তাহা নহে; অন্যান্য কাণ্ডগুলিতেও আর্ষ প্রয়োগ প্রচুর আছে। আমরা সংক্ষেপে তাহাও প্রদান করিলাম।

প্রদর্শয়িত্বা	আরণ্য ৩২	২৫ শ্লোক	প্রদর্শ্য
সমাশ্বস	" ৪৭	২২ "	সমাশ্বসিহি
বনবাসস্য স্পৃহইষ্যসি	" ৪৭	৩০ "	বনবাসায় পৃহইষ্যসি
গৃহ্য	" ৫১	২১ "	গৃহিত্বা
জটায়ুং	" ৫১	৩৭ "	জটায়ুসং
বর্ত্তসি	কিষ্কিন্ধ্যা ১৮	১৮ "	বর্ত্তসে
নিপীড়ইত্বা	" ৩১	৩৭ "	নিপীড্য
রুন্ধ	সুন্দর ৩৯	৫২ "	রুন্ধিহি
প্রীতাস্মিতব	" ৫৮	৩৩	প্রীতাস্মিত্বয়ি

" সংসিদ্ধার্থাঃ সর্ব্ব এবোগ্রবীর্যা লঙ্কা ১১ | ৩০ শ্লোক।

এখানে ছন্দটী উপযাতি—খুব অধুনিক ছন্দ। সংসিদ্ধার্থাঃ শব্দকে সংশোধন করি. ছন্দ এবং অর্থ দুই ই ব্যর্থ হইবে।

আশ্বস	লঙ্কা	১২ | ২৮	,, আশ্বসিহি
রাবণস্ত দুরাত্মনঃ	,,	১০২ | ২	,, রাবণায় দুরাত্মনে
প্রাণৈঃ	,,	১০২ | ৪	,, প্রাণেভ্যঃ
লজ্জতি	,,	১০২ | ৬	,, লজ্জতে

পাঠান্তরে 'মজ্জতি' শব্দ আছে; তাহা শুদ্ধ ও সঙ্গত।

বিষ্টনস্তং	,,	১০২ | ৮	,, বিস্তনস্তং
সঙ্ক্রোদবিত্বা	,,	১০২ | ৪৩	,, সঙ্ক্রোদা
যাস্যতে	"	১০২ | ৫০	,, যাস্যতি

সম্মানার্থে যাহাকে " আর্ষ প্রয়োগ " বা " মহাকবি প্রয়োগ " বলা হইয়াছে, আধুনিক যুগে তাহাকে 'যথেচ্ছাচার' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা রচনার সময় নির্ণয়ের চেষ্টা যে নিষ্ফল, আপস্তম্ব সূত্রের শব্দ প্রয়োগের উল্লেখ দ্বারা আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আর্ষপ্রয়োগ দ্বারা রচনার বিচার।

এইরূপ আর্ষ প্রয়োগ-বহুল রচনার আলোচনায় যে দুটী সাধারণ সিদ্ধান্তে পণ্ডিতেরা সহজে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা এই—(১) যে রচনায় এইরূপ আর্ষ প্রয়োগ আছে, তাহা ব্যাকরণের রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা; (২) পরবর্ত্তী হইলে, কোন ব্যাকরণ রীতিই তখন সম্যক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

রামায়ণের রচনা বিচার সম্বন্ধে এসিদ্ধান্ত যে মূল্য হীন, তাহা রামের উক্তিতে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৩য় সর্গেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইতে পারে। ঐ স্থলে রাম

হনুমানের মুখে অতি বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার শুনিয়া লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—লক্ষ্মণ, ইনি অনেক গুলি কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং বোধ হইতেছে, ইনি ব্যাকরণ ইত্যাদি বহুবার শ্রবণ করিয়াছেন। ইত্যাদি

যে ঋষির উক্তিতে এইরূপ ভাবে ব্যাকরণের প্রভাব স্বীকৃত, তাঁহারই রচনায় ব্যাকরণ এত অবহেলিত কেন?

আমাদের মনে হয়, কবিদের স্বেচ্ছাচারিতাই সেজন্য দায়ী। সেকালের কবিরা ঋষিদিগের ন্যায় সমাজ পরিচালক বলিয়া গণ্য ছিলেন; সেই জন্যই ঋষি ও কবিদিগের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন গুলিকে "কবি প্রয়োগ" "আর্ষ-প্রয়োগ" ইত্যাদি উচ্চ নামে সম্মানিত করা হইত।

ভাষা ও ব্যাকরণের বিচার দ্বারা এইজন্যই আমরা সময় নিরূপণের পক্ষপাতী নহি। অবশ্য সেরূপ আলোচনা অবহেলার জিনিসও নহে।

সপ্তম অধ্যায়।

রামায়ণের উপাদান।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের মূল আখ্যায়িকার জন্য দেবর্ষি নারদের নিকট ঋণী। দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকির নিকট রাবণ বধ পর্য্যন্ত, রামের কার্য্যাবলী বর্ণন করিয়া—রাম যে অযোধ্যায় আসিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন—তাহা জ্ঞাপন করিলে, বাল্মীকি নারদ কথিত সেই উপাদান অবলম্বন করিয়াই "পৌলস্ত্যবধ" নামক গীতি-কাব্য রচনা করেন।

নারদ বাল্মীকিকে যে আখ্যায়িকা শুনাইয়া রামচরিত রচনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই রামায়ণের মূল উপাদান। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে রামায়ণ-কাব্যের সেই কঙ্কাল ভাগ প্রদর্শন করিলাম।

ঋষি-প্রবর বাল্মীকির প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি নারদ বলিলেন—এইরূপ গুণযুক্ত মানব ভূমণ্ডলে সুলভ নহে। সৌভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এক মহাপুরুষ ভূমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, আমি তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর—

নারদ কথিত রামায়ণের উপাদান।

রাম নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় সুবিখ্যাত এক নরপতি আছেন, তিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা দশরথ এই সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আত্মজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা কৈকেয়ী দশরথের কোন এক পূর্ব্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া তাঁহার

নিকট রামের বনবাস ও (স্বীয় পুত্র) ভরতের রাজ্যাভিষেক—এই দুই বর প্রার্থনা করেন। দশরথ অত্যন্ত সত্য প্রতিজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার আদেশ অনুসারে রাম বনে গমন করিলেন। সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ রামের অতিশয় আজ্ঞাবহ ছিলেন, তিনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। পতিকে গমনোদ্যত দেখিয়া পতিব্রতা জনক নন্দিনী সীতাও ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিলেন।

রাম ক্রমে শৃঙ্গবেরপুরের নিষাদ অধিপতি গুহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলেন। অতঃপর ভরদ্বাজের উপদেশে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় বাসকরিতে লাগিলেন।

এ দিকে, পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে সকলে ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন; ভরত কিছুতেই রাজ্য গ্রহণ করিলেন না। পরন্তু তিনি বহু লোকজন সমভিব্যাহারে চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া রামকে অযোধ্যায় আনিবার জন্য যত্ন করিলেন। সত্য-পরায়ণ রাম কিছুতেই ভরতের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। রাম রাজ্যপালনার্থ ন্যাস স্বরূপ নিজ পাদুকাযুগল ভরতকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। অতঃপর রাম পুরবাসীগণের পুনরাগমন আশঙ্কায় চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাম দণ্ডকারণ্যে বিরাধ রাক্ষসকে বধ করিয়া শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ইন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ করেন, এই সময় বনবাসী ঋষিগণ তাঁহার নিকট অরণ্যচর রাক্ষস ও অত্যাচারী অসুরদিগের বিনাশ-সাধন জন্য উপস্থিত হইলে, রাম তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন।

এইস্থানে একদা রাম জনস্থান নিবাসিনী শূর্পণখার নাসা ও কর্ণ ছেদন করায় * রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। রাম এই যুদ্ধে খর, দূষণ, ত্রিশিরা প্রভৃতি জনস্থানের চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত করেন।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ জ্ঞাতিবংশ ধ্বংসের বিবরণ অবগত হইয়া মায়ারূপী মারিচের সাহায্যে রাম ও লক্ষ্মণকে মায়ামুগ্ধ করিয়া পক্ষিরাজ জটায়ুর বধ সাধন পূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।

রাম সীতাকে অপহৃত ও জটায়ুকে নিহত দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিয়া বনেবনে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাম, সীতা অন্বেষণ কালে কবন্ধকে বিনাশ করেন। কবন্ধ তাঁহাকে তপস্বিনী শবরীর নিকট যাইতে উপদেশ দেয়। রাম শবরীর নিকট গেলে, শবরী তাঁহাদিগকে পম্পাতীরে হনুমানের নিকট যাইতে বলেন।

হনুমান রামকে সুগ্রীবের নিকট লইয়া যায়। সুগ্রীব রামের দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া নিজের দুঃখ-কাহিনীও তাঁহার নিকট বিবৃত করে। অতঃপর উভয়ে অগ্নি সন্নিধানে সখ্য স্থাপন করিয়া উভয়ে উভয়ের সাহায্য করিতে অঙ্গীকৃত হন। এই স্থানে রাম স্বীয় ভুজবলের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সুগ্রীবের মনে বিশ্বাস স্থাপন করেন। অতঃপর রাম বালীকে নিধন করিয়া তাহার রাজ্যে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুগ্রীব রাজা হইয়া চারিদিকে সীতার অন্বেষণার্থে বানরসৈন্য প্রেরণ করিল। মহাবীর হনুমান পক্ষি-রাজ সম্পাতির বাক্যে বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ

* আরণ্য কাণ্ডের অষ্টাদশ সর্গে কিন্তু লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়াছিলেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

করিয়া অশোক বনে সীতার সাক্ষাৎ লাভ করে। সেখানে হনুমান সীতার হস্তে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া অশোকবন বিধ্বস্ত ও লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন করে।

অতঃপর রাম নলের সাহায্যে সমুদ্র বন্ধন করিয়া সসৈন্যে লঙ্কায় উপনীত হন এবং যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করেন।

রাম, রাবণ বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াও লোকাপবাদ ভয়ে তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকেন। সীতা এই কঠোর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন; অগ্নি পরীক্ষায় সীতা উত্তীর্ণা হইলে, রাম সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়া তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন।

রাম রাক্ষসরাজ বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুহৃদ্‌গণ সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইয়া অগ্রে হনুমানকে ভরতের নিকট প্রেরণ করেন, তৎপর পুষ্পকারোহণে সুহৃদগণ সহ নন্দিগ্রামে উপনীত হন। — এইক্ষণে রাম রাজ্যলাভ করিয়া পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন।

এইরূপে রাম-চরিত্র বর্ণন করিয়া দেবর্ষি নারদ বাল্মীকিকে বলিলেন —

পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥

নারদ-কথিত উপর্য্যুক্ত সংক্ষিপ্ত কাহিনীই বাল্মীকি রচিত কাব্যের কঙ্কাল বলিয়া বালকাণ্ডের এই প্রথম সর্গে উক্ত হইয়াছে।

ইহা যে রামায়ণের সংগ্রাহকের রচনা, আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার পর দ্বিতীয় সর্গে একটী উদ্ভট কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

সেটি হইতেছে— নারদের বাল্মীকি আশ্রম ত্যাগের পর তথায় অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা আসিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন—"নারদ যাহা বলিয়াছে, তাহাতো তুমি বর্ণনা করিবেই, এতদ্ব্যতীত আগত অনাগত সব কথাই তুমি বর্ণনা করিতে পারিবে।"

ব্রহ্মার আবির্ভাবের এই কল্পনা পৌরাণিক। সুতরাং এইকথার আলোচনা এখানেই ত্যাগ করিলাম।

মহর্ষি বাল্মীকি ইহার পর কি করিলেন, তৃতীয় সর্গে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ১ম সর্গে উত্তরকাণ্ডের কোন কথাই ছিল না; তৃতীয় সর্গের শেষ দুটী শ্লোকে উত্তরকাণ্ডের তিনটী প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা উত্তরকাণ্ডকে রামায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, রামায়ণের প্রথম সংগ্রাহক—যিনি ১ম সর্গ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারও অনেক পরে—উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাণ্ডটীকে রামায়ণের অংশ বলিয়া যখন রামায়ণের সহিত যুক্ত করেন, তখন—৩য় সর্গটী রচনা করিয়া তাহা দ্বারা উত্তরকাণ্ডের তিনটী প্রসিদ্ধ ঘটনাকে মূল রামায়ণের অংশ বলিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে রামায়ণের মুখবন্ধ ভাগে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই ঘটনা তিনটী এই—

> "রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্ব্বসৈন্য বিসর্জ্জনম্।
> স্বরাষ্ট্ররঞ্জনং চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জ্জনম্॥ ৩৮
> অনাগতং চ যৎ কিঞ্চিদ্রামস্য বসুধাতলে।
> তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ॥ ৩৯।১।৩

এই শ্লোকে বর্ণিত অতিরিক্ত বিষয় তিনটী— রামের সৈন্য

বিসর্জ্জন, রাষ্ট্ররঞ্জন ও সীতা বিসর্জ্জন; এই তিনটী ঘটনার উল্লেখ সংগ্রহকারকের লিখিত ১ম সর্গে নাই; এগুলি পৌলস্ত্যবধ কাব্যেরও অন্তর্গত নহে; পরন্তু উত্তরকাণ্ডেরই বিশেষ তিনটী ঘটনা।

সুতরাং এইরূপ পুনরুক্তি পূর্ণ সর্গটী যে কেবল এই তিনটী ঘটনাকে রামায়ণের অন্তর্গত বিষয় বলিয়া প্রচার করিবার জন্যই রচিত হইয়াছিল, তাহা না বলিয়া, উহার যে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।

২য়, ও ৩য় সর্গ দ্বয়কে আমরা এই কারণে ও অন্যবিধ কারণে সংগ্রহ কারকের রচনা বলিয়া মনে করি না। চতুর্থ সর্গেরও অনেক অংশ সন্দেহ জনক।

চতুর্থ সর্গের কতখানি আদি সংগ্রাহকের রচনা ও কতখানি উত্তরকাণ্ড রচয়িতার রচনা, সংশয়-শূন্য ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু এই সর্গের কোন কোন স্থলে যে উত্তরকাণ্ডকারের জাল রচনা প্রবেশ করাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার আভাস খুব স্পষ্ট বিদ্যমান আছে।

চতুর্থ সর্গের প্রথম পাঁচটী শ্লোক এইরূপ:—

"প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবানৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গ শতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২
কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্
চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ॥ ৩
তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
অগৃহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেশৌ কুশীলবৌ॥ ৪

কুশীলবৌ তু ধর্ম্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ॥ ৫। ১। ৪

উদ্ধৃত শ্লোকাবলীর চতুর্থ পংক্তি দ্বারা মহর্ষি যে ছয় কাণ্ড রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, উহা যেমন স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়, 'ষট্ কাণ্ডানির' পরবর্ত্তী "তথোত্তরম্" শব্দটী দ্বারা উত্তরকাণ্ডটী যে জাল বা রামায়ণের পরে যোজনা, তাহাও তেমনই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পঞ্চম পংক্তির "সভবিষ্যং সহোত্তরম্" শব্দদ্বয়ও তেমনই স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত।

নারদ বাল্মীকিকে সীতার বনবাস সম্বন্ধীয় কোন কথাই বলেন নাই। তিনি —

রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯
পালয়ামাস চৈবেমাঃ পিতৃবন্মুদিতাঃ প্রজাঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দশরথাত্মজঃ॥ ৯০। ১। ১

বলিয়াই রাম-চরিত শেষ করিয়াছেন। সুতরাং কুশীলবকে যে সীতার পুত্রদ্বয় বলিয়া পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে, এবং ৯ম ছত্রে ঐ কুশীলবকে 'রাজপুত্রৌ' ও ১০ম ছত্রে "ভ্রাতরৌ" বলিয়া যে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নারদ কথিত রামচরিত উপাখ্যানের বহির্ভূত।

"মুনিবেশৌ কুশীলবৌ" প্রয়োগে আমাদের মোটেই কোন আপত্তির কারণ নাই। ইহার অর্থ মুনিবেশধারী গায়কদ্বয়। বাল্মীকি রামচরিত গীতের জন্য রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহা কুশীলব (গায়ক) দ্বারাই গান করাইয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা 'কুশীলবৌ' প্রয়োগটীকে সংগ্রাহকের প্রয়োগ বলিয়াই মনে করি; ইহার অর্থ 'গায়ক দ্বয়'। এই "কুশীলবৌ" শব্দটীকে সীতার পুত্রদ্বয় করিবার যে প্রয়াস, ও সেই প্রয়াস প্রসূত ৯ম ও ১০ম পংক্তির "রাজপুত্রৌ," "ভ্রাতরৌ" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগকে

উত্তরকাণ্ড রচয়িতার প্রয়াস বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। উত্তরকাণ্ড রচয়িতা উক্ত কাণ্ডটীকে মূল রামায়ণের অঙ্গরূপে গণ্য করাইবার জন্য, এই সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন পংক্তি ও সর্গ, নূতন করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বাল্মীকি যে উত্তরকাণ্ড রচনা করেন নাই, তাহার আভাস এই চতুর্থ সর্গের ৭ম শ্লোক হইতেও অবগত হওয়া যাইতে পারে। বাল্মীকি নারদ কথিত বিবরণ অবলম্বনে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল "পৌলস্ত্যবধ কাব্য"।

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ।
পৌলস্ত্যবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ॥ ৭ | ১ | ৪

সুতরাং পৌলস্ত্য অর্থাৎ রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যায় আগমনেই যে কাব্যের সমাপ্তি—ইহাই সাহিত্য-শাস্ত্র অনুসারে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক নির্দ্দেশের উপর তর্কের অবকাশ নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবেই লঙ্কাকাণ্ডের ১৩০ সর্গের ৯৬ শ্লোকে রামায়ণ শেষ করা হইয়াছে। এই রচনা, সংগ্রাহকের। ইহার পর ৮টী শ্লোকে রাম-রাজ্যের অশেষবিধ কল্যাণকর কথা ও শেষ ১৮টী শ্লোকে রামায়ণ শ্রবণের ফল বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শ্রুতিফল গ্রন্থ শেষেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। * উত্তরকাণ্ডকে যদি রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করা যায়, তবে শ্রুতিফলের প্রসঙ্গ এখানে অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। লঙ্কাকাণ্ডের

* কোন কোন গ্রন্থে প্রতি অধ্যায় শেষেও গ্রন্থ রক্ষার, গ্রন্থ পাঠের ও গ্রন্থ শ্রুতির ফল প্রদত্ত হইতে দেখা যায়; যে গ্রন্থে এরূপ নাই, সে গ্রন্থের শেষ দিকে—যেখানে এরূপ উক্তি আছে, সেখানেই গ্রন্থ শেষ মনে করা হইয়া থাকে; এবং তাহাই সঙ্গত।

শেষে যে কতিপয় শ্লোকে রামরাজ্যের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী শ্লোক এইরূপ—

আজানুলম্বিবাহুঃ স মহাবক্ষাঃ প্রতাপবান্।
লক্ষ্মণানুচরো রামঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্॥ ৯৬
রাঘবশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
ঈজে বহুবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সসুহৃদ্‌ভ্রাতৃবান্ধবঃ॥ ৯৭
নপর্য্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
নব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৯৮
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্য্যাণি কুর্ব্বতে॥ ৯৯

* * * *

সর্ব্বে লক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ১০৪ | ৬ | ১৩০

এই অংশও বাল্মীকির রচনা নহে। ইহাতেও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীকে অতীত রূপে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রাম যে দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, "রাজ্য মকারয়ৎ" এই অতীত বাচক ক্রিয়া পদ দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইতেছে।

যে প্রতি-সংস্কারক কবি রামায়ণের প্রথম সর্গটী লিখিয়াছিলেন, এবং সেই সর্গের ৯৮ শ্লোকে—

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানিচ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥ ৯৮ | ১ | ১

লিখিয়া ভবিষ্যৎ বাচক ক্রিয়াপদ "ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি"—ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন — বলিয়াছিলেন, তিনিই গ্রন্থশেষ করিয়া অতীত বাচক "রাজ্য মকারয়ৎ" ক্রিয়া পদ প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন —

রাজত্ব করিয়াছিলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষ শ্লোকগুলিতেও কিন্তু সীতা নির্ব্বাসন, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, প্রভৃতি রাম-কলঙ্কের কোন একটী সূত্রেরও আভাস নাই; সীতার পুত্র কুশীলবেরও উল্লেখ নাই।

মহাভারতের বনপর্ব্বে যে রামায়ণের গল্প-ভাগ গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেও সীতার বনবাসের কথা বা সীতার পুত্র কুশীলবের কোন প্রসঙ্গ গৃহীত হয় নাই। কেন না, বাল্মীকির গীতি-কবিতায় যাহা প্রচারিত ছিল, মহাভারতকার তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগে পদ্মপুরাণে সীতার বনবাসের গল্প কল্পিত হইয়া কুশীলবকে সীতা-পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইলে, তাহা হইতেই বোধ হয় উত্তরকাণ্ডকার তাঁহার কল্পনার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই কাল্পনিক চিত্র রামায়ণের পরিশিষ্ট রূপে রামায়ণের সহিত যুক্ত করিয়া দেন।

এতাবতা ইহাই অনুমিত হয় যে, রামায়ণের প্রথম প্রতিসংস্কার-কর্ত্তা যখন বাল্মীকির গীতি-রামায়ণ সংগ্রহ করিয়া তাহার অঙ্গ পূরণার্থ মেদ-মাংস সংযোগ করিয়া তাহাকে সর্গে ও কাণ্ডে বিভক্ত করিয়া জন সমক্ষে গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, তখনও উত্তরকাণ্ড লিখিত হয় নাই। যদি উত্তরকাণ্ড প্রথম প্রতিসংস্কারকের রচনা হইত, তাহা হইলে লঙ্কাকাণ্ডের শেষেই রামায়ণের সুদীর্ঘ শ্রুতিফল থাকিত না; উল্লেখিত অসামঞ্জস্যগুলিও আমাদের নিকট এত পীড়া-দায়ক বোধ হইত না।

অষ্টম অধ্যায়।

রামায়ণোক্ত ঘটনা সমূহের ব্যাপ্তিকাল।

বঙ্গীয় পঞ্জিকা সমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, রাম যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই যুগকে ত্রেতাযুগ কহে, এবং সেই ত্রেতাযুগে "দশ সহস্র বর্ষ পরিমিত মনুষ্য পরমায়ু" ও 'চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত মানব দেহ' ছিল। পঞ্জিকায় প্রদত্ত এই বর্ষ ও হস্ত-পরিমাণ তখন কি অনুপাতে গৃহীত হইত, এখনও সে তত্ত্ব পণ্ডিত সমাজের নিকট দুর্ব্বোধ্যই রহিয়াছে।

রামায়ণেও স্থানে স্থানে এইরূপ অসম্ভব বৃহৎ বৃহৎ মনুষ্য পরমায়ু-সংখ্যার উল্লেখ আছে,। যথা—

'দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানিচ।
রামোরাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥" ৯৮।১।১

এরূপ শ্লোক রামায়ণে বহু আছে, তাহার উল্লেখ পূর্ব্ব প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এইরূপ বৃহৎ সংখ্যা-বাচক নির্দ্দেশ গুলি যে পৌরাণিক যুগের কল্পনা সম্ভূত, তাহা বলাই বাহুল্য।

মানব-পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ—শত বৎসর—রামায়ণের চিকিৎসা বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

রামায়ণের আদিস্তরের রচনায় এইরূপ অস্বাভাবিক বর্ষ সংখ্যার নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার বা বিচার করিবার মত প্রবৃত্তি লইয়া রামায়ণ আলোচনা করেন কয় ব্যক্তি? বোধ হয় সেই জন্যই রামায়ণের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান পণ্ডিত, রামায়ণের অন্যতম অনুবাদক,

অধ্যাপক গ্রিফিতকেও আমরা এই বৃহত্তম সংখ্যা গুলির প্রতি কটাক্ষ করিয়া মন্তব্য-প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই। দশরথের উক্তি—

প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহুন্যায়ুংষি জীবিতঃ।
জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে॥ ৮ | ২ | ২

এর উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাইয়া অধ্যাপক গ্রিফিত লিখিয়াছেন—The Ancient Kings of India enjoyed lives of more than atriarchal length. *

গ্রিফিত সাহেব রামায়ণের রাজনৈতিক উপদেশপূর্ণ অধ্যায় গুলিকে বিনা বিচারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু এই অস্বাভাবিক বয়স নির্দ্দেশগুলি তাঁহার চক্ষে সন্দেহের বিষয় হয় নাই।

বাস্তবিক পক্ষে, রামায়ণের আদিস্তরের সহিত এই সকল দেব-বর্ষ বা ইন্দ্র-বর্ষের কোন সম্বন্ধ নাই। রামায়ণের আদি রচনার প্রকৃতি লক্ষ্য করিলে এবিষয়ে সন্তোষ জনক প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণ—রামের বাল্য, যৌবন, ও বার্দ্ধক্যের—কত বৎসরের ঘটনা লইয়া রচিত হইয়াছে এবং তাহার কোন কাণ্ডে কত বৎসরের—

* Scenes from The Ramayana Page 17.

এই দোষটী খৃষ্টোত্তর যুগের কাব্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাস রঘুবংশেও এইরূপ বৃহৎ সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। রঘু ১০।১ দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের (Old Testament) ৫ম অধ্যায়ে আদম বংশের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ বিবরণে আদম হইতে আরম্ভ করিয়া নোয়া পর্য্যন্ত সকলেরই বয়সের পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকার সকলেই প্রায় সহস্র বৎসর করিয়া পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্যের উপর কটাক্ষ করিবার পুর্ব্বে যে নিজের কথা ভাবিতে যাওয়া উচিত, এই জ্ঞান অনেক প্রবীন সমালোচকেরও নাই, ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে, সমস্তই বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান' করিলে রামায়ণ হইতেই অবগত হওয়া যাইতে পারে। অবশ্য, প্রক্ষিপ্ততার উপদ্রব যে এগুলির ভিতর নাই, তাহা নহে। প্রক্ষিপ্ত রচনা এগুলির ভিতরও আছে, এবং তাহার বিষয় আমরা "রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা" প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি; এস্থলেও প্রক্ষিপ্ত ভাগ অতি সতর্কতার সহিত ত্যাগ করিয়াই আলোচনা করিলাম।

রামায়ণের আদি রচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেই সুপ্রাচীন যুগেও সমাজ-জীবনে আধুনিক লৌকিক বর্ষেরই প্রভাব ছিল। তখন মানুষের দুই শত বৎসর বয়সে যৌবন কাল হইত না, বা এইরূপ বয়সে বিবাহ করিয়া কেহ সন্তান উৎপাদন করিত না। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি কালের বিভাগ প্রায় আজ-কালকার মতই ছিল; বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের কালও প্রায় অনুরূপ ছিল। পরমায়ু তখন সাধারণতঃ শত বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল। সুতরাং পরমায়ু যে কাহারও সহস্র বৎসর হইতনা, ইহা বলাই বাহুল্য।

মহর্ষি বাল্মীকি কত বৎসরের ঘটনাবলী লইয়া এই 'ষট্‌কাণ্ড' পৌলস্ত্যবধ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণের স্থূল স্থূল ঘটনাবলীর আলোচনা হইতেই অবগত হওয়া যাইতে পারে।

বাল্মীকির যুগে কোন কাল নিরূপক অব্দ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের স্থানে স্থানে ঘটনা বিশেষের অনুষ্ঠান-সময় নির্দ্দেশ জন্য নক্ষত্র, তিথি, ঋতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়; কোন কোন স্থলে ঘটনার ব্যাপ্তিকালও প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সময় বা কাল নির্দ্দেশক অন্য বিশেষ কোন অবলম্বনের উল্লেখ নাই।

এস্থলে রামায়ণে উল্লেখিত এই সকল— ঋতু, তিথি, নক্ষত্র

অবলম্বন করিয়াই রামায়ণের স্থূল স্থূল ঘটনাবলীর সময় ও ব্যাপ্তিকাল নিরূপণের চেষ্ট করা গেল।

রামের জন্মই রামায়ণ কাব্যের প্রথম বা আদি ঘটনা। এই ঘটনার একটা সময় অনুমান করিয়া লইতে পারিলে পাঠকগণ খৃষ্টাব্দের মত একটা রামাব্দ—কল্পনা করিয়া লইয়া রামায়ণের যাবতীয় ঘটনার সময় নির্ণয় করিতে পারিবেন।

রামের জন্ম সময় সম্বন্ধে রামায়ণের উক্তি এইরূপ—

তেতোযজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতুনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ।
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ॥ ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ॥ ৯। ১। ১৮

অর্থ—যজ্ঞের পর ছয় ঋতু অতীত হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি-মঙ্গল-শনি-শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার হইলে এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজমহিষী কৌশল্যার গর্ভে রাম জন্ম গ্রহণ করেন।

ইহার পর ক্রমে পুষ্যানক্ষত্রে মীন লগ্নে কৈকেয়ী পুত্র ভরত; ও কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এই যমজ ভ্রাতৃদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন।

এই রচনা নানা কারণে সন্দেহ জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হইলেও ইহাকেই আমরা আশ্রয়সূত্র রূপে গ্রহণ করিলাম। সন্দেহের কারণ গুলি "প্রক্ষিপ্ত রচনা" প্রসঙ্গে আলোচিত হইল।

রামের বিবাহ রামায়ণের দ্বিতীয় ঘটনা। বিবাহ কালে রামের বয়স কত ছিল, তাহার আভাস রামায়ণে আছে, তাহা এইরূপ—

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট স্বীয় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ রক্ষার্থ রামের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, রামের অল্প বয়স হেতু দশরথ তাহাকে বিশ্বামিত্রের সাহায্যে প্রদান করিতে ভীত হন এবং আপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।

ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥ ২।১।২০

অর্থ—আমার রামের বয়স এখন ঊনষোড়শ (ষোল অপেক্ষা কম) এমন অবস্থায় রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্যতা আমি তাহার মধ্যে দেখিতেছি না।

বিশ্বামিত্র রামকেই তাঁহার যজ্ঞ রক্ষার যোগ্য—বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি নিবৃত্ত হইলেন না; দশরথও অবশেষে বিশ্বামিত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; রাম ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

উল্লিখিত দশরথ-বাক্য হইতে, অবগত হওয়া যায় যে রামের-বয়স ষোল বৎসরের ন্যূন থাকিতেই তিনি লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার জন্য অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ৪র্থ রাত্রিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হন। (১।২৯।৩১) পঞ্চম দিবস হইতে বিশ্বামিত্র ব্রত ধারণ করিয়া ক্রমে ছয় দিবস মৌনাবলম্বী থাকেন। (১।৩০।৪—৬) এই দশ দিন অতিক্রান্ত হইলে মহর্ষি রাম লক্ষ্মণকে লইয়া মিথিলাধিপতি জনকের ধর্ম্মযজ্ঞে গমন করেন। মিথিলার পথে তাঁহাদের চারি রাত্রি অতিবাহিত হয়। এইরূপে অযোধ্যা পরিত্যাগের পর—চতুর্দ্দশ দিবসে তাঁহারা মিথিলায় উপস্থিত হন।

মিথিলায় উপস্থিত হইবার পর দিবস রাম জনকের ধনুঃ ভঙ্গ

করেন। ইহার পর মিথিলার দূত জনকের সম্মতি বার্ত্তা লইয়া চতুর্থ দিবসে অযোধ্যায় আগমন করে। দশরথ দূত মুখে সংবাদ পাইয়া বরযাত্র—পাত্র-মিত্র-পুরোহিত—সহ চারি দিবসে মিথিলায় প্রত্যাগমন করেন। এইরূপে রামের অযোধ্যা ত্যাগের পর—এক মাসের ভিতর (দিন গণনায় বাইশ দিনে) এই সকল ঘটনা সম্পাদিত হইয়া যায়, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

রাজা দশরথ মিথিলায় উপনীত হইলে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মিথিলাধিপতি বলেন—

মঘা হ্যস্থ মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো।
ফল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু॥ ২৪। ১। ৭১

অর্থ—রাজন্ অদ্য মঘা নক্ষত্র সুতরাং তৃতীয় দিবসে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন।

এই নির্দ্দিষ্ট দিবসেই রাম-লক্ষ্মণাদির বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে—রাম ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালের পূর্ব্বেই বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গণনার সুবিধার জন্য পাঠক, ইচ্ছা করিলে এই কালকে ১৬শ রাম অব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

ইহার পর রাম-বনবাস রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনা। বিবাহের পর বহু ঋতু গত হইলে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করেন। চৈত্রের পুষ্যা নক্ষত্র সমন্বিত দিবসে অভিষেকের দিন নির্দ্ধারিত হয়। ঐ দিবসই রাম রাজ্য প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে বনবাস বরণ করেন।

বিবাহের পর কত দিন রাম অযোধ্যায় ছিলেন, তাহা

"রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহূনৃতুন॥" ২৫। ১। ৭৭

এই নির্দ্দেশ দ্বারা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না।

এই সময়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ অবগত হওয়া যায় কৌশল্যার উক্তিতে। রাম বনে গমনে প্রস্তুত হইয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন—

"দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্॥" ৪৫।২।২০

কৌশল্যা বলিতেছেন হে পুত্র, তোমার জন্মের পর এই সপ্ত দশ বর্ষ আমি আমার দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি।

কৌশল্যার এই উক্তিতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়, রাম সতর বৎসর বয়সে বনে গমন করিয়াছিলেন।

রাম চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে যাপন করিয়াছিলেন। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কালের বিবরণও রামায়ণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

রাম বনে গমন করিয়া দ্বিতীয় নিশা গুহের আলয়ে যাপন করিয়া চতুর্থ নিশা ভরদ্বাজ আশ্রমে যাপন করেন। পঞ্চম দিবসে চিত্রকূট উপনীত হন। অনন্তর কিছু দিন চিত্রকূটে বাস করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করেন।

রাম দণ্ডকারণ্যের নানা স্থানে—কোথাও দশ মাস, কোথাও সংবৎসর, কোথাও চারি মাস, কোথাও পাঁচ মাস, কোথাও ছয় মাস এবং কোথাও বৎসরাধিক কাল বাস করিয়া—দশ বৎসর এইরূপ পরিভ্রমণের পর পঞ্চবটীতে আসিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। (আরণ্য ১১)

---

* আরণ্য কাণ্ডে এই মতের বিরোধী উক্তি আছে। রামের বিবাহবয়স আলোচনায়—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের প্রথম অধ্যায়ে—ইহা আলোচিত হইল।

এই স্থানে ত্রয়োদশ বর্ষের শেষে হেমন্ত ঋতুতে—পৌষ মাসে * (আঃ ১৬) লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করেন। (আঃ ১৮) ইহার পর মাঘ কি ফাল্গুন মাসে রাবণ সীতা হরণ করে। বসন্ত সমাগমে—চৈত্র বা বৈশাখ মাসে রাম পম্পাতীরে সুগ্রীব সদনে উপস্থিত হন। (কি ৫) অনন্তর আষাঢ় মাসের শেষ দিনে (আষাঢ় পূর্ণমাসীতে) (কি ১৬) রাম বালীকে নিহত করেন।

তখন বর্ষা সমাগত দেখিয়া সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া রাম বলিয়াছিলেন—

পূর্ব্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ।
প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিক সংজ্ঞিতাঃ॥ ১৪। ৪। ২৬

অর্থ—এখন বর্ষাকাল সমাগত। বর্ষার চারি মাস মধ্যে ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম; অতএব এখন আমাদিগের সীতা উদ্ধারের উদ্যোগ কোন মতেই শ্রেয় নহে।

শরৎ কালে (কার্ত্তিক মাসে) বানরগণ সীতা অন্বেষণে বহির্গত হয়। এবং কিছু দিন মধ্যেই —(বোধ হয় অগ্রহায়ণে) হনুমান লঙ্কার অশোকবনে সীতার দর্শন লাভ করে। তখন সীতা হনুমানকে বলিয়াছিলেন—

"বর্ত্ততে দশমো মাসো দ্বৌ তু শেষৌ প্লবঙ্গম।" ৮। ৫। ৩৭

অর্থ—এই দশমাস চলিতেছে, বৎসর শেষ হইবার আর দুই মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

সুতরাং সীতা অপহৃতা হইবার পর দশম মাসের শেষ ভাগে তাঁহাকে অশোক বনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

হনুমান সীতার নিকট হইতে আগমন করিয়া রামকে সীতার

* তখন পৌষ হেমন্ত, মাঘ ফাল্গুন শীত, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন বর্ষা ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ শরৎকাল বলিয়া অভিহিত হইত।

সংবাদ দিলে পর যে দিন হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব দিবস শুভ উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে রাম সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। (ল ৪)

সেতুবন্ধনে কিছু কাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর কিঞ্চিদধিক এক মাস পর রাম সাগর অতিক্রম করিয়া লঙ্কা অবরোধ করেন। তাঁহারা যে সময়ে সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলেন—

ততোঽস্তমগমৎ সূর্য্যঃ সন্ধ্যয়া প্রতিরঞ্জিতঃ।
পূর্ণচন্দ্রপ্রদীপ্তা চ ক্ষপা সমতিবর্ত্তত॥ ১৩। ৬। ৩৮

সে দিন পূর্ণমাসী (মাসের শেষ দিন) ছিল। রাম সেই পূর্ণমাসী তিথিতে সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ করেন এবং প্রায় এক পক্ষের মধ্যেই রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। (ল ১১৪)

রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রায় ১৬। ১৭ দিন হইয়াছিল। যুদ্ধের দৈনিক তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রতিপদে যুদ্ধারম্ভ। ঐ রাত্রে ইন্দ্রজিত কর্ত্তৃক রামলক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হন। (লঙ্কাকাণ্ড ৪৫ সর্গ)

দ্বিতীয়ায়	ধূম্রাক্ষ বধ। (ল ৫২)
তৃতীয়ায়	বজ্রদংষ্ট্রা বধ। (ল ৫৪)
চতুর্থীতে	অকম্পন বধ। (ল ৫৬)
পঞ্চমীতে	প্রহস্ত বধ। (ল ৫৮)
ষষ্ঠীতে	রাবণের যুদ্ধ ও পরাজয়। (ল ৫৯)
সপ্তমীতে	কুম্ভকর্ণ বধ। (ল ৬৭ (
অষ্টমীতে	নরান্তক, অতিকায় প্রভৃতি বধ। (ল ৬৯—৭১)
নবমীতে	ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ। (ল ৭৩)

দশমীতে নিকুম্ভ বধ। রাত্রিতে মকরাক্ষবধ। (ল ৭৭—৭৯)

একাদশীতে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ। (ল ৮৭)

দ্বাদশীতেও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ। (ল ৮৮)

ত্রয়োদশীতে ইন্দ্রজিত বধ। (ল ৯১)

চতুর্দ্দশীতে রাবণের শোক ও যুদ্ধে উদ্যোগ। (ল ৯৩—৯৫)

এই দিন মন্ত্রী সুপার্শ্ব রাবণকে বলিতেছেন—

"অভ্যুত্থানং ত্বমদ্যৈব কৃষ্ণপক্ষচতুর্দ্দশী।

কৃত্বা নির্য্যাহ্যমাবস্যাং বিজয়ায় বলৈর্বৃতঃ॥" ৬২ | ৬ | ৯৩

অর্থ—অদ্য কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। অতএব অদ্য সংগ্রামের আয়োজন করিয়া আগামী কল্য অমাবস্যায় সেনা পরিবৃত্ত হইয়া বিজয়ার্থ যাত্রা করিবেন।

এই অমাবস্যায় রাবণ যুদ্ধারম্ভ করেন এবং অবিরাম তিনদিন যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (ল ১০৯—১১১)

অনন্তর রাম-সীতা সুহৃদগণ সহ পুষ্পক নামক ব্যোম-রথে আকাশ মার্গে অযোধ্যায় যাত্রা করেন। তখনও চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। অতঃপর চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে—শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে—তাঁহারা ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হন।

পরদিন ছিল—পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত শুক্লাষষ্ঠী; এইদিন ভরত আসিয়া রামের সহিত সম্মিলিত হন।

অতঃপর এক শুভদিনে রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

এই সময় রামের বয়স হইয়াছিল—বনবাসের সময় কৌশল্যার উক্তি অনুসারে (৬২ পৃষ্ঠা) সপ্তদশ ও বনবাস কাল চতুর্দ্দশ = মোট একত্রিংশ বা একত্রিশ বৎসর।

আরণ্যকাণ্ডের সীতার উক্তিতে যে বার বৎসরের গোল আছে, * তাহা যোগ করিয়া লইলে ৪২ | ৪৩ বৎসর হয়।

রাজ্যাভিষেকের পরেই—লঙ্কাকাণ্ডের ১২৮ সর্গে রামায়ণের বর্ণনা শেষ হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ই বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন—এই উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহাই রামায়ণের সংগ্রহকারক আদিকাণ্ডের ১ম সর্গের ২য় শ্লোক—" কো ন্বস্মিন সাম্প্রতং লোকে "—দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রদর্শিত ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করিলে দেখাযায়, এই ছয়কাণ্ডে মহাকবি ৩০ | ৩২ বৎসরের অথবা মতান্তরে ৪০ | ৪২ বৎসরের বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা:—

আদিকাণ্ডে রামের জীবনের ১৫ | ১৬ বৎসরের কথা,
অযোধ্যাকাণ্ডে রামের জীবনের অনুমান ১ সপ্তাহের কথা,
আরণ্যকাণ্ডে রামের জীবনের ১৩ বৎসরের কথা,
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অনুমান ১০ মাসের কথা,
সুন্দরকাণ্ডে অনুমান মাসাধিক কালের কথা, এবং
লঙ্কাকাণ্ডে অনুমান মাসাধিক কালের কথা বিবৃত হইয়াছে।

রাম কত বৎসরে দেহত্যাগ করেন,রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। থাকিতেও পারে না; কেন না, রাম সিংহাসনে অবস্থিত থাকা কালেই মহা-

* আরণ্যকাণ্ডে অতিথি বেশধারী রাবণকে সীতা বলিয়াছিলেন—বিবাহেরপর আমি স্বামীসহ বার বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলাম। যথা—

" উষিত্বা দ্বাদশসমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে।"

' সমা ' শব্দের অর্থ—বর্ষ। কিন্তু লিপি প্রমাদে ' নাপঠন ' শব্দ যে প্রকারে—'নাপচন ' হইতে পারে, (৯ম অঃ শেষ পৃঃ দ্রষ্টব্য) সেই প্রকারে, যদি "মাস" শব্দ "সমা" হইয়া থাকে, তবে এই সমস্তার সহজ মীমাংসা হয়, কৌশল্যার উক্তিরও সম্মান রক্ষিত হয়।

কবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

রামায়ণে উল্লেখিত ঘটনাবলীর ভিতর যে কোন অসম্ভব বা অলৌকিক বর্ষ সংখ্যা নাই, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলাম। পাঠক, এইবার মহাকাব্যের ১ম সর্গের এই ভবিষৎদর্শী লেখকের ভবিষ্যৎ-কাল-বাচক উক্তি—

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানিচ।
রামো রাজ্যমোপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥

ও লঙ্কাকাণ্ডের শেষ সর্গের অতীত-কাল-জ্ঞাপক—

দশ বর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥

উক্তির সম্পর্ক ও সমীচীনতা বিচার করুন।

নবম অধ্যায়।

রামায়ণে বাল্মীকির রচনার পরিমাণ কত?

বালকাণ্ডের প্রথম চারি সর্গের রচনা যে বাল্মীকির রচনা নহে, তাহা আমরা অনুমান করিতেছি এবং আমাদের অনুমানের কারণ গুলি পূর্ব্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমাদের মনেহয়, পঞ্চম সর্গের ৫ম শ্লোক হইতে প্রকৃত রামায়ণী কথা আরম্ভ হইয়াছে।

রামায়ণ কথার আরম্ভ।

কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত এই পঞ্চম সর্গের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক আলোচনা দ্বারা রামায়ণ উপাখ্যান যে বাল্মীকির বহু পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, তাহা দেখাইয়া অসামঞ্জস্যের ক্রটী ধরিয়াছেন। শ্লোক দুটী এইরূপ—

বাল্মীকির পূর্ব্বেও রামায়ণ ছিল কি?

ইক্ষ্বাকুণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্॥ ৩ *
তদিদং বর্ত্তয়িষ্যাবঃ সর্ব্বং নিখিলমাদিতঃ।
ধর্ম্মকামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা॥ ৪

অর্থাৎ "সেই ইক্ষ্বাকু বংশীয় মহাত্মা নৃপতিগণের বংশে রামায়ণ নামে বিখ্যাত এই সুমহৎ উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা

---

* এই শ্লোকের পাঠান্তর আছে; যথা—ইক্ষ্বাকুণামিদং তেষাংবংশে কীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।
নিবদ্ধং পুণ্যমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্॥

ধর্ম্মকামার্থ-সাধন এই উপাখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

এই রচনাকে বাল্মীকির রচনা বলিয়া মনে করিলে নিশ্চয়ই দোষ বর্ত্তে। প্রতিসংস্কারকের মুখবন্ধ বলিয়া মনে করিলে, সে দোষ মোটেই বর্ত্তে না। বাস্তবিক ইহা সংগ্রহকারকের মুখবন্ধেরই শেষ কথা। এবং ইহাই বোধ হয় "রাম জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ" এই প্রচলিত-প্রবাদের জন্মদাতা। যাহা হউক, ইহার পর ৫ম শ্লোক হইতে সংগ্রাহক মূল রামায়ণ শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই শ্লোক হইতেই বাল্মীকির রামায়ণ আরম্ভ হইয়াছে।

বাল্মীকির আদি গীতকাব্য "পৌলস্ত্যবধ" যে কত বড় ও কত বিস্তৃত ছিল, তাহা অবগত হইবার কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে অযোধ্যা মাহাত্ম্য বর্ণন অধ্যায়ে রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সে সংখ্যা এককোটি। পদ্মপুরাণের টিকাকার বলিতেছেন, এখন আর এককোটি পাওয়া যায় না; চব্বিশ হাজার মাত্র পাওয়া যাইতেছে। অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতিতেও এই মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণোদ্ধৃত শ্লোক সংখ্যা।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ—জ্ঞান প্রস্থানের টীকা মহাবিভাষায় রামায়ণের শ্লোকের সংখ্যা মাত্র বার-হাজার প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরে প্রদত্ত হইল। মহাবিভাষা ও পুরাণ গ্রন্থগুলি, আর্য্য রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী গ্রন্থ; সুতরাং এই সকলের উক্তি স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। আলোচ্য রামায়ণের সংস্করণগুলিতেও প্রতিসংস্কারক, রামায়ণের শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ডের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই উক্তিরও মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।

মহাবিভাষার মত।

যাহা হউক, আমরা এই স্থলে সংগ্রাহকের উক্তি অবলম্বন করিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইব। সংগ্রাহক তাঁহার মুখবন্ধে (৪র্থ সর্গে) রামায়ণের শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ড সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

রামায়ণোক্ত শ্লোক সংখ্যা।

প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবাননৃষিঃ।
চকার চরিতং কৃতস্নং বিচিত্র পদমর্থবৎ॥ ১
চতুর্ব্বিংশ সহস্রাণি * শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গ শতান্ পঞ্চ ষট্‌কাণ্ডানি তথোত্তরম্॥ ২

অর্থাৎ মহর্ষি বাল্মীকি রাজ্য-প্রাপ্ত রামের চরিত-কথা এইরূপে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে, পঞ্চশত সর্গে ও ছয় কাণ্ডে (এবং শেষ উত্তর কাণ্ডে) বিবৃত করিয়াছেন।

ইহা যে বাল্মীকির নিজের উক্তি নহে, তাহা শ্লোক দুইটাই নিজে নিজে বলিয়া দিতেছে।

বেদের মণ্ডল, সূক্ত প্রভৃতি যেমন বেদকর্ত্তা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করেন নাই, পরবর্ত্তী ব্যাসগণ করিয়াছেন; রামায়ণের এই সর্গ-কাণ্ড নির্দ্দেশও সেইরূপ ঋষি নিজে করেন নাই, শ্লোকাবলীর সংগ্রহ কর্ত্তা করিয়াছেন। এখন, এই যে চব্বিশ হাজার শ্লোকের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সংখ্যা কি সংগ্রাহকের মুখবন্ধ ও পাদপূরণ ইত্যাদি শ্লোকাবলী সহ, না ঐ সকল ব্যতীত, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

সংগ্রাহক যে বাল্মীকির সমগ্র রচনাই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যায় না। মুখে মুখে প্রচলিত সুপ্রাচীন সঙ্গীতাদির

* মহাভারতকার ব্যাসদেবও প্রথম ২৪ সহস্র শ্লোক সমন্বিত মহাভারত রচনা করিয়া স্বীয় পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামায়ণের পরবর্ত্তী সংগ্রহকর্ত্তা এই ২৪ সহস্র কথারই পুনরুক্তি করেন নাই তো?

অবস্থা সাধারণতঃ যেরূপ হয়, এস্থলেও সেইরূপই হইয়াছিল—ইহাই অনুমান করা যায়; অর্থাৎ যাহা সংগ্রহকারক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহা তিনি নিজের রচনা দ্বারা গ্রন্থপূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, এরূপই মনে করা যাইতে পারে এবং আমরা তাহাই মনে করিয়াছি। যে সকল স্থানে সংগ্রাহক বা তাঁহার পরবর্ত্তী কবিগণ নিজ নিজ রচনা প্রবেশ করাইয়াছেন, বাল্মীকির আদি রচনার সহিত অনেক স্থলেই সেগুলির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই; আমরা সেই সকল স্থান বিষয়-আলোচনায় সাধ্যানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রক্ষিপ্ত বিচার।

রামায়ণ হিন্দুজাতির ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া পূজিত। এইরূপ গ্রন্থের উপর প্রক্ষিপ্ততার দোষারূপ করিলে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির মনে আঘাত লাগিবে। এরূপ লাগাই স্বাভাবিক। অথচ প্রক্ষিপ্ত বিচার না করিয়া পুরাণ গ্রন্থাদির উক্তিকে সমসাময়িক লেখকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা মূলক উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে; ইতিহাস আলোচনার রীতি অনুমোদিতও নহে। সে জন্য প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের হেতু গুলি স্বল্প কথায় উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত-বাদ আলোচনায়ও সেই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য; আমরা আমাদিগের নির্দ্দেশ গুলির সহিত সাহিত্য-সম্রাটের নির্দ্দেশগুলি যুক্ত করিয়া উপস্থিত করিলাম।

প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের হেতু।

(১) যদি কোন গ্রন্থে দেখা যায় যে কোন ঘটনা দুই বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ সেই বিবরণ পরস্পর বিরোধী, তাহা হইলে একটী প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ কোন লেখকই অনর্থক

পুনরুক্তি করিয়া আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনাবধানতা বা অক্ষমতা প্রযুক্ত যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। সেরূপ ত্রুটী অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

(২) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনা প্রণালীতে প্রায়ই কতক গুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। যদি ঐ রূপ কোন শ্রেষ্ঠ কবির কোন রচনার অংশে এরূপ দেখাযায় যে সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই; তৎপরিবর্ত্তে এমন সকল লক্ষণ আছে, যে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয় না, তবে সেই অসঙ্গত লক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

(৩) যদি কোন শ্লোকে এমন শব্দ প্রযুক্ত থাকে, যে সেই শব্দের মূলীভূত বস্তুর উল্লেখ ঐ গ্রন্থে বা উহার সমসাময়িক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, তাহা হইলে ঐ শব্দ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হইবে।

(৪) যদি শ্লোকাদিতে গ্রন্থকর্ত্তার সমকালীন পরিজ্ঞাত ও বিশ্বসিত বস্তু অথবা ভাবের অতিরিক্ত কোন বস্তুর বা ভাবের বর্ণনা বা অভিব্যক্তি দেখা যায়। তবে সেই বস্তু ও ভাবকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার বিষয় হইবে।

(৫) শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্র গুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।

(৬) যাহা অপ্রাসঙ্গিক তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না ও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলির মধ্যে কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ হইবে।

(৭) যাহা অনৈতিহাসিক, অথবা অস্বাভাবিক তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা

না হউক, ইতিহাসের আলোচনায় তাহা পরিত্যাগ করা উচিত। তাহা বুঝিবার উপায় সমসাময়িক ইতিহাস, ভাব ও সমাজ।

কেবল যে রামায়ণেই পরবর্ত্তী চিন্তা ও রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে, প্রক্ষিপ্ততার হস্ত হইতে রামায়ণের ন্যায়—বেদ, পুরাণ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, মহাভারত, গীতা, স্মৃতি, উপনিষদ, তন্ত্র, কাব্য, সাহিত্য, নাটক কিছুই অব্যাহত চলিয়া আসিতে পারে নাই।

রামায়ণের আদি রচনার ভিতর যে পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা লইয়া এদেশের লোক বড় বেশী আলোচনা করেন নাই। বৈদেশিকেরা যাহা করিয়াছেন, তাহাও অতি সামান্য এবং মোটামুটি ভাবে করিয়াছেন; প্রতি সর্গের পাঠ বিচার করিয়া করেন নাই। তবু বিদেশীয়দিগের চেষ্টা এস্থলে দেশীয়দিগের অপেক্ষা বেশী।

ইলিয়ড কাব্যে প্রক্ষিপ্ত রচনার পরিমাণ।

এইস্থলে—ইয়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের অনুরূপ জাতীয় গ্রন্থের কিরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইয়ুরোপের পণ্ডিতেরা হোমারের ইলিয়ডের সহিত রামায়ণের তুলনা করিয়া থাকেন। ঐ গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে। তাঁহারা শুধু "প্রক্ষিপ্ত আছে" বলিয়াই আমাদের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা ইলিয়ডের ১৫৬৮১টী পংক্তিই তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন্ পংক্তি হোমারের লিখিত ও কোন্ পংক্তি পরবর্ত্তী লেখকের প্রক্ষিপ্ত রচনায় কলুষিত, পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন্ পৌরাণিক গল্পটী কবি নিজের রচনার সহিত গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন্‌টী বা পরবর্ত্তী ভাবের উপাদানে রচিত ও পরে সংযোজিত, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ আলোচনা পূর্ণ—এক ইলিয়ড সম্বন্ধেই ইয়ুরোপের

সাহিত্যে এত গ্রন্থ আছে যে, তাহাতে একটী ছোট থাট গ্রন্থাগার পূর্ণ হইতে পারে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ কয়খানা আছে? নাই—বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

নবীন ভারতের মুদ্রাযন্ত্রের সুযোগ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুযোগকে ভারতবাসী এইরূপ পণ্ডশ্রমে ব্যয়িত হইতে দেন নাই;

রামায়ণের হস্ত লিখিত টীকার সংখ্যা।

অপর পক্ষে এইরূপ সুযোগ শূন্য প্রাচীন যুগের বহুলোক অনন্যকর্ম্মা হইয়াই বোধ হয় কেবল এই সকল গ্রন্থের নিরর্থক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আজ-কালকার লোক শুনিলে নিশ্চয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, যে রামায়ণের আলোচনার পুস্তক এখন এক রকম নাই বলিয়া প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না, এক সময়ে সেই রামায়ণেরই টীকা গ্রন্থ ছিল—সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত। * অর্থাৎ রামায়ণের কেবল টীকা গ্রন্থ দ্বারাই একটী ছোট-খাট বৃটীশ মিউজিয়ম প্রস্তুত হইতে পারিত; বোধ হয় হইয়াছেও তাহাই।

ভারতের সেই প্রাচীন হস্তলিপির যুগে কেবল বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের টীকা গ্রন্থ ছিল ১৪২৫০০। † আমরা পরের দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া করিয়া নিজের দেশের প্রাচীন গৌরবকে অর্ব্বাচীন মনে করি, আর বৈদেশিকেরা আমাদের সেই সম্পদ পরম

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী (রাজেন্দ্র দত্ত) ৩৬ পৃঃ।

† বেদের ৯০০০০, মহাভারতের ১৫০০০, রামায়ণের ৩৭৫০০। এই বিষয় সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা গ্রীন সাহেব, কাউয়েল সাহেব ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগ্রহাবলী পাঠ করিবেন। ভারতীয় গ্রন্থাবলীতেও এই বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যত্নে গ্রহণ করিয়া তাহাদ্বারা তাহাদের নিজ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লয়; তারপর তাহার সাহায্যেই আমাদিগকে বর্ব্বর ও অর্ব্বাচীন জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে।

এইবার আমরা প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করিব।

প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের যে কারণগুলি আমরা উপরে নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি, ঐ কারণগুলিই কেবল প্রক্ষিপ্ত বিচারের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রচনার দেশ-কাল-পাত্র নির্দ্ধারণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। রচনার সময়, সমাজ ও দেশের আনুসঙ্গিক অবস্থা নির্দ্ধারিত হইলে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ গুলির বিচার দ্বারা সত্যের সন্ধান লওয়ার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

রামায়ণের রচনাকাল নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সাধারণতঃ তুইটী মত প্রচলিত আছে। যাঁহারা প্রাচ্য ভাবাপন্ন অথচ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেও সুপণ্ডিত, তাঁহারা রামায়ণের রচনা কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া উহাকে ঋষি যুগের কাব্য বলিয়া মনে করেন। মোটামুটি তাঁহাদের মত, এই ঋষিযুগ খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়। স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির ন্যায় সুপণ্ডিত প্রাচ্য ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের যেন এই রূপ মত। দ্বিতীয়—যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন অথচ প্রাচ্য শাস্ত্র সংহিতায়ও বিশেষ পারদর্শী তাঁহাদের বিশ্বাস রামায়ণ লৌকিক যুগের কাব্য। এই লৌকিক যুগ—ভারতে গ্রীক সংস্পর্শের পরবর্ত্তী সময়। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তিদের যেন এইরূপ মত।

রামায়ণের কাল বিচারে মত ভেদ।

আমরা এইস্থলে কাহারও কোন স্পষ্ট মত উদ্ধৃত করিলাম না। দৃষ্টান্তের জন্য বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দুইজন প্রধান ব্যক্তির নাম উল্লেখ

করিলাম মাত্র। ঋষি যুগ ও লৌকিক যুগ কথা দুইটীও আমাদের রচিত কথা; আলোচনার সুবিধার জন্য রচিত হইল মাত্র।

নিরক্ষেপ ভাবে কোন কাব্যের সময় নির্দ্দেশ করিতে হইলে কাব্যের দোষ, গুণ ও ক্রটীর উল্লেখ করিয়া যে বিচার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা যে কেহ করেন নাই, তাহা নহে; কিন্তু তথাপি মতভেদই রহিয়াছে; বোধ হয় এইরূপ মতভেদ থাকিবেও নিত্য।

এই মতভেদের প্রধান কারণ রামায়ণে এই উভয় যুগের ভাব এবং দেশকাল পাত্রের প্রভাব প্রায় পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।

মতভেদের কারণ—প্রক্ষিপ্ততা।

রামায়ণের যে সর্গে ঋষি-যুগের ভাব ও প্রভাব আছে, ঠিক সেই সর্গেই লৌকিক যুগের ভাব-প্রভাবও বিদ্যমান; বরং ঋষি যুগের অপেক্ষা লৌকিক যুগের ভাবেই রামায়ণ বেশীর ভাগ ভারাক্রান্ত। এরূপ অবস্থায়, যে যেমন ভাবের প্রভাবে ভাবুক হইয়া রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, রামায়ণের সমাজ বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন, তিনি সেই ভাবের প্রভাবে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্রটী কাহারও নহে, ক্রটী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ততার।

রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত বিচার দুঃসাধ্য ব্যাপার হইলেও আমরা সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমাদের ক্রটী নির্দ্দেশ করিতেও যদি অতঃপর কোন শক্তিশালী লেখক অগ্রসর হন, তবে এই পণ্ডশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আমরা ঋষিযুগের সমর্থন যোগ্য ও লৌকিক যুগের সমর্থন. যোগ্য বিষয়গুলি পৃথক পৃথক কবিয়া এস্থলে প্রদর্শন করিব।

যাঁহারা রামায়ণকে ঋষি যুগের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,

ঋষি-যুগের সমর্থন যোগ্য বিষয়।

তাঁহাদের পক্ষের সংক্ষিপ্ত যুক্তিগুলি সাধারণতঃ এইরূপ—যে কালে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সে কালে ভারতে লিপি বিজ্ঞান প্রচলিত হয় নাই ; বুদ্ধদের বাল্যকালে লিপিশালায় যাইতেন, বাল্মীকির ন্যায় মহাকবি রামের সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। রামায়ণের একটী ছত্রেও লিপি-বিজ্ঞানের পরিচয় নাই। রামায়ণে লৌকিক দেবতাগণের নাম নাই। তাঁহাদের কোন কথাই নাই। বেদের দেবতা সংখ্যার ন্যায় রামায়ণেও ৩৩ দেবতার উল্লেখ দৃষ্টহয়, রামায়ণে বেদত্রয় ব্যতীত বেদের পরবর্ত্তী যুগের আর কোন গ্রন্থের নাম নাই। রামায়ণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শক কোন বাক্য নাই। রামায়ণে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যেরূপ নিদর্শন আছে, চিত্র—বিশেতঃ মনুষ্য চিত্র অঙ্কনের তেমন কোন আভাস নাই। রামায়ণে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশিষ্ট আলোচনার পরিচয় নাই। বার গণনার প্রথা তখন ছিল না। মাস গণনার প্রথাও ছিল কি না সন্দেহ। রামায়ণের কোন স্থানেই লিঙ্গ পূজার বা মূর্ত্তি পূজার কোন আভাস নাই। সে সময় গৃহমেধিন মাত্রেই বেদ পাঠ করিতে পারিত। তখনও ভারতবর্ষে ধাতুর রাসায়ণিক ব্যবহার আরম্ভ বা যৌগিক ধাতুর আবিষ্কার হয় নাই। সিন্দুর প্রস্তুত হয় নাই। কাচ ও পারদ দ্বারা দর্পণ প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। রামায়ণী যুগের ভাষার আলোচনায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যতীত বৌদ্ধযুগের পালি প্রভৃতি ভাষার কোন উল্লেখ নাই। লৌকিক যুগের অঙ্কিত মুদ্রার কোন আভাসও রামায়ণে নাই। সমাজে গোত্র পরিচয় প্রথা তখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। রামায়ণের কথা মহাভারতে আছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইগুলি বিচার করিবার সময় পাঠক মহাকবি বাল্মীকির অশেষ কবিত্ব শক্তির কথা স্মরণ

করিবেন এবং এগুলির প্রত্যেকটী বিষয়েরই যে তাঁহার আলোচনার সুযোগ ছিল এবং সেই সুযোগ তিনি দেশ, কাল, পাত্রভেদে উপেক্ষা করেন নাই, তাহাও চিন্তা করিবেন।

এইবার—যাঁহারা রামায়ণকে লৌকিক যুগের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষের যুক্তিগুলি ঐরূপেই সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি:—রামায়ণের ভাষা মার্জ্জিত, সে ভাষা আধুনিক ভাষা। রামায়ণ যে সকল ছন্দে রচিত সেই সকল ছন্দ আধুনিক; অনুষ্টুপ ছন্দ পুরাতন হইলেও রামায়ণের অনুষ্টুপ আধুনিক ছন্দে বাঁধা। রামায়ণের অবতারবাদ লৌকিক যুগের চিন্তা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের কথা রামায়ণে ভূরি ভূরি আছে। কৌশল্যা ও রাম, বিষ্ণু ও নারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে ব্রাহ্মণ, অথর্ব্বশির, কঠ ও তৈত্তিরীয় শাখা, কল্পসূত্র ও মনু-স্মৃতির কথা আছে। রামায়ণে বুদ্ধের কথা আছে—"তথাগত" নামটী পর্য্যন্ত আছে। রামায়ণে রাশি-চক্রের কথা আছে, মাসের উল্লেখও আছে। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের কথা আছে। রামায়ণে বহু পৌরাণিক গল্প আছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে মহাভারতের কোন কোন নামের উল্লেখ আছে, রামায়ণের কোন নামের উল্লেখ নাই। রামায়ণ প্রাকঐতিহাসিক যুগের হইলে বৌদ্ধ দশরথ জাতকে রাম-চরিত কথার এরূপ অদ্ভুত বর্ণনা বাহির হইত না। রামায়ণে মহাভারতের জন্মেজয়, কৃষ্ণ প্রভৃতির নাম আছে। লঙ্কাকাণ্ডে লক্ষ্মীমূর্ত্তির বর্ণনা আছে। জ্যোতির্ব্বিদের গণনা—এমন কি সামুদ্রিক গণনার কথা পর্য্যন্ত আছে। তান্ত্রিক যুগ-লক্ষণ স্বরূপ রামের মদ ও মাংস আহারের কথা আছে। বৌদ্ধযুগের চৈত্য, ভিক্ষুণী, শ্রমণী প্রভৃতির কথা আছে। ইত্যাদি। ইঁহারা বলেন,

লৌকিক যুগের সমর্থন যোগ্য বিষয়।

রামায়ণের গল্পটী ব্যাসের কল্পনায় মহাভারতে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইলে মহাভারতের ঐ গল্প লইয়া লৌকিক যুগে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। ইঁহারাও রামায়ণে প্রক্ষিপ্ততা স্বীকার করেন। এস্থলেও পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, উপর্য্যুক্ত নির্দ্দেশ গুলিও একেবারে ভিত্তিহীন নহে।

এস্থলেও আমারা কোন ব্যক্তি বিশেষের মত উদ্ধৃত করিলাম না; প্রচলিত বাদ প্রতিবাদ গুলিই সমান সংখ্যায় কয়েকটী মাত্র উপস্থিত করিলাম। এই সকল বিরুদ্ধ ভাবের আলোচনা ও মীমাংসা আমরা এই গ্রন্থের যথাযোগ্য স্থানে করিয়াছি; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা প্রথমোক্ত মত সমর্থন করিয়াছি ও শেষোক্ত মতের নির্দ্দেশ গুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার কতগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এস্থলে এখন প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের মোটামুটি কারণ গুলির আলোচনা করিব।

রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে সাধরণতঃ তিনটি রচনার স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (১) আদি কবির রচিত আদিম স্তর, (২) সংগ্রাহকের রচনা ও (৩) পরবর্ত্তী বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন সময়ের জাল (Forged) রচনা। রামায়ণের আদি রচনার ভিতর কি পরিমাণ প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী জাল রচনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহা আলোচনা করিবার এক সহজ পন্থা আছে।

রামায়ণের রচনা স্তর।

মহর্ষি প্রণীত রামায়ণের শ্লোক সংখ্যা ও সর্গ সংখ্যা আমরা রামায়ণের সংগ্রাহকের উক্তিতে, বালকাণ্ডের ৪র্থ সর্গে দেখিতে পাই। ঐ সংখ্যা ইতিহাসের আলোচনায় প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার উপযুক্ত না হইলেও তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তাহা দ্বারা আপাততঃ ইহা স্বীকার

শ্লোক সংখ্যার বিচার।

করিয়া লইতে পারি যে—রামায়ণের শ্লোক সংগ্রহকারক যখন রামায়ণের শ্লোকাবলী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়, তাঁহার নিজের রচিত রচনা সহ রামায়ণে ২৪ সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ ও ছয়টী কাণ্ড বর্ত্তমান ছিল। এখন প্রচলিত সংস্করণ গুলির শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ডগুলি গণনা করিয়া দেখিলেই মোটামুটী ভাবে রামায়ণের কলেবর সংগ্রাহকের সময় অপেক্ষাও ইদানীং বৃদ্ধি পাইয়াছে, কি হ্রাস পাইয়াছে, পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

এই পরীক্ষারও বড় বেশী মূল্য নাই এবং পরীক্ষাও সহজ সাধ্য নহে। পরীক্ষা সহজ সাধ্য নহে, তাহার কারণ বর্ত্তমানে রামায়ণের যে সকল সংস্করণ প্রচলিত আছে, তাহার কোনটীর সহিতই কোনটীর শ্লোক, সর্গ, এমন কি রচনারও মিল নাই। অথচ সকলগুলিই বাল্মীকির রামায়ণ বলিয়া পরিচিত। যাহা হউক, আপাততঃ যতদূর সম্ভব, এস্থলে তাহার বিচার ও পরীক্ষার চেষ্টা করাগেল।

বর্ত্তমান সময় রামায়ণের তিনটী প্রধান সংস্করণ প্রচলিত আছে। প্রথম—কাশী সংস্করণ বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রামায়ণ; দ্বিতীয়—বোম্বাই সংস্করণ; তৃতীয়—গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় সংস্করণ।

রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ।

এই তিন সংস্করণের পাঠে বিস্তর প্রভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত এই তিন প্রদেশের তিনটী সংস্করণ হইতে যে বহু উপসংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে মূল সংস্করণ গুলির সহিত ইহাদের রচনার দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে। ফল এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কোনটীর সহিতই প্রায় কোনটীর মিল নাই, এবং কোন্‌টী বিশুদ্ধ সংস্করণ, তাহা আর বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই বিষয়টী বুঝাইবার জন্যই আমরা ইতঃপূর্ব্বে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভেদ ও পরিবর্ত্তনের আলোচনা দৃষ্টান্ত দিয়া করিয়াছি। (২৯—৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বঙ্গদেশে বর্ত্তমানে যে সকল সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, পর পৃষ্ঠায় তাহাদিগের সর্গ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

এইরূপ প্রভেদ হইতে প্রকৃত সিদ্ধান্তের নিকটবর্ত্তী হইতে যাওয়ার চেষ্টা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা এস্থলে কেবল বঙ্গবাসী সংস্করণেরই শ্লোক সংখ্যা প্রদান করিলাম। এই (প্রায়) বিশ হাজার শ্লোকেরও বহু সংখ্যক শ্লোক যে পরবর্ত্তী যোজনা, তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। সর্গ সংখ্যা—কৃষ্ণগোপাল ভক্তের সংস্করণ ও নিমাই বিদ্যাবিনোদের হস্ত লিখিত গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন খানাতেই পাঁচ শতের ন্যূন নাই। ভক্তের সংস্করণ ও বিদ্যাবিনোদের পুঁথিকেই অনেকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

বিভিন্ন সংস্করণের সর্গ সংখ্যা।

১২৮৯ সালে বঙ্গদেশীয় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণের গ্রন্থ মিলাইয়া ভক্ত মহাশয় রামায়ণের এই সংস্করণটী বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতেও অনেক অবান্তর কথা রহিয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থের বিশেষত্ব এই—মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায়ের ন্যায় ইহাতেও পর্ব্বাধ্যায় আছে। তাহাতে কাণ্ড-সংগ্রহ এবং প্রতিকাণ্ডের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা আছে। এই বিশেষত্বগুলিও যে অর্ব্বাচীন তাহা বলাই বাহুল্য।

রামায়ণের উৎকৃষ্ট সংস্করণ।

ইটালী দেশস্থিত টিউরিন নগরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সিগনর গেরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণের ইটালীয় ভাষায় অনুবাদ সহ মূল সংস্কৃতের এক সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। (১৮৪০—৬০ খৃঃ অঃ) ঐ সংস্করণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সংস্করণে সংস্করণে এইরূপ প্রভেদ কি প্রকারে হইতে পারে ?

প্রমাণ হীন অতীত ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অনুমান

কাণ্ড	কৃষ্ণগোপাল ভক্তের রামায়ণ	বঙ্গবাসীর রামায়ণ	বঙ্গবাসীর শ্লোক	বোম্বাই সংস্করণ	বোম্বাইসং বিশ্বকোষ উদ্ধৃত
বালকাণ্ড	৮০	৭৭	২২৯৬	৭৭	৭৭
অযোধ্যাকাণ্ড	১২৭	১১৯	৪১১৮	১১৮	১১৩
আরণ্যকাণ্ড	৭৯	৭৫	২৪৭৮	৭৫	৮০
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৬৪	৬৭	২৪৫৭	৬৭	৬৪
সুন্দরকাণ্ড	৪৩	৬৮	২৮৪০	৬৮	৬৮
লঙ্কাকাণ্ড	১০৫	১৩০	৫৭৬৪	১৩০	১৩০
	৪৯৮	৫৩৬	১৯৯৫৩	৫৩৫	৫৩২
উত্তরকাণ্ড	৯০	১২৪	৩৯৯২	১১৫	১১১
	৫৮৮	৬৬০	২৩৯৪৫	৬৫০	৬৪৩

ব্যতীত অন্য আশ্রয় কিছুই নাই। অনুমানের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, এ কথা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। অভিজ্ঞতা মূলক দৃষ্টান্তের সাহায্যে অনুমানকে প্রমাণের স্বরূপ ধরিয়া লইবার চেষ্টা করা যায় মাত্র।

প্রথম সংগ্রহকারকের কার্য্য।

আমাদের মনে হয়, লিপি বিদ্যার প্রচলন হইলে মহাকবির সঙ্গীতে রচিত রামায়ণ কথা—'পৌলস্ত্যবধকাব্য' জন গণের স্মৃতির সাহায্যে যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা যাইতে পারিয়াছিল, রামায়ণের প্রথম সংগ্রহকারক তাহা সংগ্রহ করিয়া অপ্রাপ্তভাগ ও অসম্পূর্ণ ভাগ, নিজে পূরণ করিয়া প্রথম চারি সর্গে বর্ণিত (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সর্গের সকল রচনাও সংগ্রাহকের নহে) মুখবন্ধটী সহ সর্ব্ব প্রথম রামায়ণ প্রচার করেন। এই প্রথম প্রচার কর্ত্তাই রামায়ণ কথাকে—কাণ্ডে ও সর্গে বিভাগ করিয়াছিলেন; প্রতি সর্গের শেষে

বোম্বাই অন্যপ্রকার	প্রতাপরায় সংস্করণ	নিমাই বিদ্যাবিনোদ হস্তলিখিত	সাহিত্যপরিষৎ (রামায়ণ তত্ত্ব) বোম্বাইসং	উত্তরপশ্চিম সংস্করণ বিশ্বকোষোদ্ধৃত	গৌড়ীয় সং বিশ্বকোষ উদ্ধৃত
৭৭	৭৭	৬৪	৭৭	৭৭	৮০
১১৮	১১৯	১১৪	১১৯	১১৯	১২৭
৭৫	৭৫	৮০	৭৫	৭৯	৭৯
৬৭	৬৭	৬৪	৬৮	৬৭	৬৭
৯৫	৬৮	৪৩	৬৮	৬৮	৯৫
১১৩	১১৩	১০৫	১২৯	১৩০	১১৩
৫৪৫	৫৩৬	৪৭০	৫৩৬	৫৪০	৫৬১
১১৫	১২৪	৯০	১২৪	১১১	১১৫
৬৬০	৬৬০	৫৬০	৬৬০	৬৫১	৬৭৬

পরবর্ত্তী সর্গের আভাস-জ্ঞাপক আধুনিক ছন্দের শ্লোকগুলিও তিনিই রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্লোকের এবং সর্গের সংখ্যা-নির্দ্দেশও তিনিই করিয়াছিলেন।

উত্তর কাণ্ডকারের কার্য্য।

উত্তরকাণ্ড খৃষ্টোত্তর যুগের লিখিত। রামায়ণ প্রথম প্রচারের পরে যখন উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাণ্ডটীকে রামায়ণের অঙ্গ বলিয়া রামায়ণের পশ্চাদ্ভাগে যুক্ত করিয়া প্রচার করেন, তখন তিনি ৪র্থ সর্গের উল্লেখিত শ্লোক, সর্গ ও কাণ্ড সংখ্যার পরিবর্ত্তন করিয়া—

" চতুর্ব্বিংশসহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবানৃষিঃ।
তথা সর্গ শতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্ ॥"

এই শ্লোকটীর মধ্যেও পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সংসাধন করেন। এই দ্বিতীয় প্রতিসংস্কারক দ্বারা " চতুর্ব্বিংশ " "পঞ্চ" ও "তথোত্তরম্" এই তিনটী

শব্দের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল—বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। আমাদের বিশ্বাস—১ম প্রচারকের সময় শ্লোক সংখ্যা ২৪ হাজার অপেক্ষা অনেক কম ছিল; সর্গও পঞ্চ শত অপেক্ষা কম ছিল এবং 'ষট্‌কাণ্ডানি' শব্দের পরের শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়া সেই স্থলে "তথোত্তরম্" যুক্ত হইয়াছিল; এবং এই "তথোত্তরম্" শব্দটিকে সমর্থন জন্য দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্মা সম্বন্ধীয় গল্পটি ও তৃতীয় সর্গের শেষ ভাগের উত্তরকাণ্ড সম্পর্কীয় কয়েকটি ঘটনা সূচী-ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

উত্তরকাণ্ডেও যে অনেক পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত সর্গ আছে, তাহা রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের প্রাচীন টীকাকারগণই স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।*

উত্তরকাণ্ড আলোচনা।

যাহা হউক, উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা উত্তরকাণ্ডকে রামায়ণের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া যে তাহাতে মোট চব্বিশ হাজার শ্লোক ও পাঁচশত সর্গ পাইয়াছিলেন, এ অনুমান যে আমরা করিতে পারি, তাহার প্রমাণ উত্তরকাণ্ড রচয়িতাই আমাদিগকে উত্তরকাণ্ডের ১০৭ম সর্গে বলিয়া দিতেছেন।

উত্তরকাণ্ডে আছে, কুশী-লবের গানে রাম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"এ কাব্যের পরিমাণ কত, কাব্যের বিষয়ইবা কি, রচয়িতাইবা কে? সেই মুনিবরইবা কোথায়?

* "এতেষাং প্রক্ষিপ্তত্বাৎ..." বলিয়া রামানুজ বহু সর্গ ও শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উত্তরকাণ্ডের ২৪শ সর্গ হইতে ২৮ সর্গ; ৪৩ সর্গ হইতে ৪৭ সর্গ, ৭০ হইতে ৭২ প্রভৃতি সর্গগুলি একেবারে সম্পূর্ণই প্রক্ষিপ্ত। এই সর্গগুলি উত্তরকাণ্ড লেখকেরও নহে। বঙ্গীয় পাঠকগণ এই প্রক্ষিপ্ত সর্গগুলি হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের অনুবাদে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। অনুবাদক এই ১৩টী অধ্যায়কে অনুবাদে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে কুশী-লব বলিতেছে :—

বাল্মীকির্ভগবান্ কর্ত্তা সম্প্রাপ্তো যজ্ঞসংবিধম্।
যেনেদং চরিতং তুভ্যমশেষং সম্প্রদর্শিতম্॥ ২৪
সন্নিবদ্ধং হি শ্লোকানাং চতুর্বিংশৎ সহস্রকম্।
উপাখ্যান শতঞ্চৈব ভার্গবেণ তপস্বিনা॥ ২৫
আদি প্রভৃতি বৈ রাজন্ পঞ্চসর্গশতানি চ।
কাণ্ডানি ষট্ কৃতানীহ সোত্তরাণি মহাত্মনা॥ ২৬

এই স্থানে—উত্তরকাণ্ড সহিতেই যে ২৪ সহস্র শ্লোক ও পাঁচ শত সর্গ, তাহা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। শুধু তাহা নহে ; এখানে একটী অতিরিক্ত কথারও যোগ আছে—তাহা এই যে, রামায়ণে এক শত উপাখ্যানও বর্ণিত হইয়াছে।

উত্তরকাণ্ডটী যোগ করিয়া শ্লোকের সংখ্যা ও সর্গের সংখ্যা আদি-কাণ্ডের ৪র্থ সর্গের নির্দ্দেশ অনুরূপ ঠিক করা হইয়াছিল। ইহার পর শ্লোক সংখ্যা অনেক পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিন্তু ঐ সংখ্যা নির্দ্দেশক শ্লোকটী আর পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বোধহয় পরিবর্ত্তন করিবার কাহারও রুচি হয় নাই।

সর্গ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির একটী স্বাভাবিক কারণ আছে ; তাহা এই স্থলে আলোচ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে যে একটী বিষয়কেই দুই, তিন বা ততোধিক সর্গে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে সর্গ সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে ; এইরূপ বৃদ্ধি প্রাচীনকালে হস্তলিপি-কারকের খেয়ালে হইত ; বর্ত্তমান কালে গ্রন্থ প্রকাশকগণের ইচ্ছায় হয়। অনেক বাঙ্গালা পাণ্ডু লিপিতে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। রামায়ণের সংস্করণ গুলিতেও তাহার অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি—

সর্গ হ্রাস বৃদ্ধির কারণ।

বেনীমাধব দের রামায়ণের আরণ্যকাণ্ডের ১৫শ সর্গ ও বঙ্গবাসীর আরণ্য কাণ্ডের ১১শ সর্গ এক বিষয়ক। বঙ্গবাসীর রামায়ণের ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ও লঙ্কাকাণ্ডের দুইটী সর্গে এইরূপ গোল হওয়ায় সর্গ সংখ্যা এই দুই খানার ভিতর অনৈক্য হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের রামায়ণে দুই সর্গ এক সর্গের অধীন; বঙ্গবাসীর সংস্করণে তাহা পৃথক পৃথক। এইরূপে সর্গ সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, ও হইয়া থাকে।

উত্তরকাণ্ড ব্যতীত রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে এখন প্রায় কুড়ি হাজার শ্লোক ও ৪৭০ হইতে ৫৬১ সর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রক্ষিত সম্পদেরও যে বহু অংশ কৃত্রিম, তাহা ইতিহাস অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে আলোচনা মাত্রেই ধরা পড়িবে।

প্রাচীন গ্রন্থের ভিতর কৃত্রিমতা কি প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে এবং কেন প্রবেশ করিয়া থাকে? এরূপ স্থলে, এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উত্থিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহার অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কারণ গুলি এইরূপ—

কৃত্রিম রচনা প্রক্ষেপের হেতু।

(১) বর্ত্তমান যুগের লেখকদিগের ন্যায় সেকালের লেখকদিগের নাম প্রচার করিয়া যশঃ অর্জ্জনের স্পৃহা ছিল না বটে, কিন্তু নিজ লেখাকে বা স্বকীয় মতকে সাধারণ্যে প্রচার করিবার প্রবৃত্তি খুব প্রবল ছিল। উত্তরকাণ্ডের অজ্ঞাতনামা লেখক এই কারণেই তাঁহার বিরাট শ্রমকে বাল্মীকির নামে প্রচার করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপ কারণে হরিবংশ লেখক তাঁহার হরিবংশকে মহাভারতের পরিশিষ্টরূপে প্রচার করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন; "গীতা"কার তাঁহার মহা

পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক যুক্তিবাদকেও ব্যাসের নামে প্রচার করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ অসমীচীন হইবে না।

(২) স্বার্থান্বেষী লোক, নিজ সম্প্রদায়গত স্বার্থ সাধন জন্য প্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্বার্থের কথা প্রবেশ করাইয়া থাকেন; এইরূপে প্রাচীন গ্রন্থ কলুষিত হইয়া থাকে। রামায়ণের পত্রে পত্রে এইরূপ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা প্রমাণিত হইবে। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে এখনও এইরূপ কৃত্রিমতা চলিতেছে।

(৩) দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের মনের ও চিন্তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন পুস্তকে নূতন চিন্তা প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়। এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্প্রদায় বিশেষের ইচ্ছায় হয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধন জন্য হয়, ব্যক্তিগত অজ্ঞতার জন্য হয় এবং ব্যক্তিগত কবিত্বের প্রভাবে হয়। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলনের পূর্ব্বে হস্তলিখিত পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া প্রচারিত হইত। অনুলিপিকারকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কবিত্ব যে অন্ধ ভাবে আদর্শ লিপিরই অনুসরণ করিত, তাহা নহে। লিপিকারকের রুচির আদর্শও সময় সময় কবিত্বে উৎসারিত হইয়া অনুলিপিকে কলঙ্কিত করিত। নিজের বা সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথাও এই অবসরে প্রতিলিপিতে প্রবেশ করিতে সুবিধা পাইত। এইরূপে আদর্শ ও অনুলিপিতে পাঠ ভেদ হইত। বাঙ্গলা কৃত্তিবাসী রামায়ণকে এইরূপেই জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের হস্তে পড়িয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। (৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৪) আদর্শ লিপির অক্ষর দোষ। আদর্শের হস্তাক্ষর স্পষ্ট ও

পাঠ্য না হইলে অনুলিপিতে ভুলের ও ত্রুটীর মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া যাইত। হস্তাক্ষর অপাঠ্য বা অস্পষ্ট হইলে অনুলিপি কারকের জ্ঞান-বিশ্বাসের প্রভাব অনুসারে শব্দ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনুলিপিতে স্থান প্রাপ্ত হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গীয় সংস্করণ ও বোম্বাই সংস্করণের একটী ব্যতিক্রম পাঠের উল্লেখ করিতেছি।

বঙ্গীয় সংস্করণের রামায়ণে (অযোধ্যা, ৪৮ সর্গে) আছে, যে দিন রাম বনবাসে যাত্রা করিলেন, সে দিন—

ন চাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্।
ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপঠন্ গৃহমেধিনঃ॥ ৪।২।৪৮

উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তির "নাপঠন্" স্থলে বোম্বাই সংস্করণে আছে "ন পচন্"। ফলে বঙ্গীয় সংস্করণ অনুসারে অর্থ হইয়াছে—

ত্রুটীর একটী দৃষ্টান্ত।

রাম যে দিন বনে গিয়াছিলেন, সে দিন অযোধ্যার লোকদের এত দুঃখ হইয়াছিল যে গৃহস্থেরা সে দিন বেদ পাঠ ছাড়িলেন। বোম্বাই সংস্করণের অর্থ হইল...'গৃহস্থেরা সেদিন রান্না করিল না।'

এই পাঠ বিভ্রাটের কারণ লিপিকারকের সংস্কার ব্যতীত আর কি হইতে পারে? *

লিপি কারকের সংস্কার অনুসারে যে লিপি প্রমাদ ঘটিতে পারে এবং আর্ষ-রামায়ণের অনেক স্থানেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনায় স্থানে স্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

* আমরা উপায়হীন হইয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের শরণাগত হইয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—" এখানে বেদ পাঠই খুব সঙ্গত, কেন না, বেদ পাঠ তখন গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম ছিল। অশৌচ হইলেই কেবল ঐ কার্য্যে বাধা পড়িত। রাম বনবাস এত গুরুতর বিবেচিত হইয়াছিল যে অশৌচের ন্যায় গৃহস্থেরা নিত্যকর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদপাঠ ছাড়িয়া দিয়াছিল।"

দশম অধ্যায়।

রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডটী যে মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশের ন্যায় সম্পূর্ণ একখানা পৃথক গ্রন্থ, এ মত শিক্ষিত সমাজে খুব প্রবল; আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গেও যথা স্থানে করিব।

উত্তরকাণ্ডের ন্যায় রামায়ণের আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ডকেও কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। লঘু-রামায়ণের গ্রন্থকার তাঁহাদের মধ্যে একজন। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে বাল্মীকির প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—

আদিকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত কিনা?

বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথাতে নারদাচ্ছ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীরতঃ॥" ৩৩।১।২

অর্থ—তুমি নারদের নিকট রামের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, সেইরূপে তাহা প্রকাশ কর।

লঘু-রামায়ণের "বৃত্তং প্রথয়" স্থলে আমাদের গ্রন্থে আছে 'বৃত্তংকথয়'; ইহাতে অর্থের কোন গোল হয় নাই।

এই শ্লোকটী হইতেই নাকি লঘু-রামায়ণকার মনে করেন যে বাল্মীকির রামায়ণ আদিতে কেবল অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। পরে তাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং আদিকাণ্ড যুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা দ্বিতীয় সর্গের এই ব্রহ্মার উক্তিকে রামায়ণের সংগ্রহ কারকের পরবর্ত্তী, অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং এইরূপ মনে করিবার কারণ যথাস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছি। (৫০ পৃষ্ঠা)

এই উক্তিটীকে সংগ্রাহকের মুখবন্ধের অন্তর্গত ধরিয়া লইলেও তাহা হইতে—সমগ্র আদিকাণ্ড যে এইরূপ নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়া রচনা করা যাইতে পারে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। সত্য বটে, প্রথম সর্গের প্রস্তাবনায় আছে, নারদ বাল্মীকির নিকট রামের গুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন—"ঈদৃশ গুণ যুক্ত যে রাম, সেই রামকে মহীপতি দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলে…বিমাতা কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য পিতৃ আজ্ঞার ইঙ্গিত অনুসারে তিনি বনে গমন করিলেন।" এবং ইহাও একটী যুক্তি যে এই স্থল হইতেই গ্রন্থ আরম্ভ হওয়া উচিত।

লঘু-রামায়ণকার তাহাই মনে করিতেছেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিচার প্রয়োজন।

রামের বনে গমন ব্যাপার হইতে নারদের বিবৃতি আরম্ভ হওয়ায় এবং সেই বিবৃতির উপর ব্রহ্মার অনুমোদন থাকায়—লঘু-রামায়ণকার আদিকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততার যে কারণ অনুমান করেন, আমাদের মনে হয়, এই কারণ অতি অকিঞ্চিৎকর।

মহাকবি বাল্মীকি সম্বন্ধীয় উদ্ভট কথার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদি তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তবে এই পরবর্ত্তী কাল্পনিক উক্তির কোন মূল্য থাকে না।

বাল্মীকিকে ও রামকে যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে বাল্মীকি যে রামকে জানিতেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; "কাব্য ও কবির পরিচয়" প্রসঙ্গে তাহা আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি। (৫পৃষ্ঠা) আর যদি রামায়ণকে কাব্যের হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়, এবং কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে এই কাব্যের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তিনি যে কোন ব্যক্তি বিশেষের নির্দ্দেশে বাধ্য থাকিবেন, এই বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে।

প্রতিভাবান কবিরা যে কাব্য রচনা করিতে কাহারও নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করিতে পারেন না, তাহা বুঝিয়াই আদি কবি ব্রহ্মাও 'পুরা' কবি বাল্মীকিকে পরবর্ত্তী শ্লোকেই বলিয়াছেন—

রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্‌বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ॥ ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতন্তে ভবিষ্যতি
ন তে বাগনৃতা কাব্যেকাচিদত্র ভবিষ্যতি॥৩৫ | ১ | ২

অর্থাৎ—রাম লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা তোমার অজ্ঞাত (অর্থাৎ তোমাকে বলা হয় নাই), তাহাও তুমি বিদিত হইতে পারিবে।

প্রকৃত প্রস্তাবেই কবি যে নারদের করধৃত পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াই রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন না, তৃতীয় সর্গের ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্লোক তাহার প্রমাণ। ১০ম শ্লোকটী দ্বারা, বাল্মীকি যে রামের জন্ম কথাও রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এ স্থলে প্রদর্শন করা গেল। শ্লোকটী এই—

জন্ম রামস্য সুমহদ্বীর্য্যং সর্ব্বানুকূলতাম্।
লোকস্য প্রিয়তাংক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্॥ ১০ | ১ | ৩

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক গুলিতে আদিকাণ্ডের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ঘটনা গুলিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং লঘু রামায়ণকারের উদ্ধৃত ব্রহ্মার উক্তির সমর্থনে সমগ্র আদিকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

আদিকাণ্ডের মূল ঘটনাবলীতে আমরা প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার মত তেমন কোন নিদর্শন বিদ্যমান দেখি না বটে, কিন্তু ঐ কাণ্ডের অনেক উপঘটনার বর্ণনাই যে প্রক্ষিপ্ত, এবং মূল ঘটনার প্রাচীন স্তরের মধ্যেও যে অনেক পরবর্ত্তী রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে করিতে কোনরূপ

কুণ্ঠা বোধ করিতেছি না। নিম্নে কারণ সহ সেই প্রক্ষিপ্ত রচনা গুলির আলোচনা করা গেল।

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের পঞ্চম শ্লোক হইতে বাল্মীকির রচনা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই প্রারম্ভ ভাগ হইতে চতুর্দ্দশ সর্গ পর্য্যন্ত রচনার ভাব প্রাচীন। এই রচনার ভিতর স্থানে স্থানে শব্দ-পরিবর্ত্তন ব্যতীত এবং দুই একটী শ্লোক-পরিবর্ত্তন ব্যতীত—গুরুতর পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন চিহ্ন নাই।

১৫শ সর্গ হইতে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম কথার সূচনা হইয়াছে। এই সর্গে অনেক পরবর্ত্তী চিন্তার নিদর্শন আছে; এবং সে নিদর্শন খুব স্পষ্ট।

অবতারবাদ প্রক্ষিপ্ত।

এই সর্গে প্রথম রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বাল্মীকির নিজের এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে, ৯ম সর্গে সুমন্ত্র যখন রাজা দশরথকে তাঁহার পুত্র প্রাপ্তির কল্পিত প্রাচীন ইতিহাসটী বিবৃত করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই তাহার আভাস থকিত। অথবা দ্বাদশ সর্গে যে স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশরথকে—

সর্ব্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্।
যস্য তে ধার্ম্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা। ১৩।১।১২

আপনি অবশ্যই অতি বিক্রমশালী চারিটী পুত্র প্রাপ্ত হইবেন; অর্থাৎ যেহেতু পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার ঈদৃশ সাধু সঙ্কল্প হইয়াছে—এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন, সেই স্থানেই বিষ্ণু যে স্বয়ংই রাজগৃহ আলোকিত করিবেন—এরূপ আভাস পাঠক পাইতে পারিতেন।

রামকে অবতার প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা বাল্মীকির থাকিলে, তাঁহার অন্তরের ভাব রামায়ণের সর্ব্বত্র সমানভাবে ফুটিয়া উঠিত। অধ্যাত্ম রামায়ণের কবির মনে সেরূপ ভাব ছিল, তাঁহার গ্রন্থেও তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাসের হৃদয়ে যে প্রকৃতই রাম-সীতা প্রভাব বিস্তারকরিয়া বসিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাতায় পাতায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার প্রভাবে সরল বিশ্বাসী বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়েও কৃত্তিবাসী রাম-সীতা লক্ষ্মীনারায়ণ রূপে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন।

বাল্মীকির রাম-সীতা তাঁহার রচনায় দুটী আদর্শ দম্পতিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন; ভরত চরিত্রও সাধারণ মানব অপেক্ষা উন্নত আদর্শের।

ভারতীয় আর্য্য সাহিত্যে অবতারবাদের কল্পনা প্রাচীন হইলেও রামকে অবতাররূপে প্রচার করিবার ভাব খুব প্রাচীন নহে। বুদ্ধদেব যখন হিন্দুর চিন্তায় অবতারের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন, রামও সেই সময়ে অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে রাম বা বুদ্ধ আর্য্য (হিন্দু) সাহিত্যে অবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই।

অবতারবাদ কল্পনা কত প্রাচীন।

এস্থলে প্রাচীন আর্য্য সাহিত্য হইতে অবতারবাদ সম্বন্ধে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বেদে অবতার কথা নাই। অবতার কথার প্রথম আভাস শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়। সেস্থলেও অবতার কথাটী নাই। শত-পথ ব্রাহ্মণে আছে—মৎস্য মনুকে জলপ্লাবনের সংবাদ জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অনুসারে মনু প্লাবন প্রাকালে মৎস্যের শরণাগত হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[১] শতপথের এই কাহিনীই মহাভারত,[২] মৎস্য পুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি হিন্দুর পুরাণ-ইতিহাসেও খৃষ্টানের বাইবেলে পল্লবিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পুরাণ ও বাইবেল,

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অবতারবাদ।

---

১ শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৬।৩

২ মহাভারত—বনপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়।

মূল পরিত্যাগ করিয়াও চিন্তার ধারায় ঐক্য রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রজাপতি যে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথাও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে।[৩] শতপথে কূর্ম্মকেই কচ্ছপ বা কশ্যপ বলা হইয়াছে; এবং উৎপন্ন প্রজাকে 'কাশ্যপ' বলা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে—যঃ সর্ব্বং পশ্যতি সঃ কশ্যপ—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। এই সকল ব্রাহ্মণ-উক্তি লইয়াই পরবর্ত্তী যুগে কূর্ম্মপুরাণ রচিত হইয়াছিল। কূর্ম্মপুরাণে কূর্ম্মকে বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অতঃপর অন্যান্য পুরাণেও এই কল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে বরাহেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বরাহের নাম তথায় এমূষ। বামনরূপী বিষ্ণুর উল্লেখও শতপথ ব্রাহ্মণে আছে; সেকথা ২৯ সর্গের আলোচনায় আলোচিত হইল।

এই সকল বৈদিক কল্পসূত্রে এই চারি অবতারের কথাই এইরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পর তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নৃসিংহ অবতারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ভিন্ন ভিন্ন নামের এই পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণগুলি রামায়ণ রচনার পরে রচিত হইয়াছিল। এবং বৈদিক যুগে ও রামায়ণ রচনার যুগে, যে সকল পুরাণ-কথা প্রচারিত ছিল, তাহাই ব্রাহ্মণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং এই ব্রাহ্মণগুলির গল্পাভাসই রামায়ণে থাকা স্বাভাবিক। ইহার অতিরিক্ত—পরবর্ত্তী যুগের বিশ্বসিত ও পরবর্ত্তী যুগের প্রবর্ত্তিত কোন বিষয় তাহাতে থাকিলে তাহা সন্দেহ জনক বলিয়া বিবেচিত হইবার বিষয় হইবে।

কোন্ অবতার কোন্ সময় জন্ম গ্রহণ করিবেন, এইরূপ কোন জনশ্রুতি প্রচারিত থাকা দেশ-কাল ভেদে খুব স্বাভাবিক। সুতরাং এইরূপ চিন্তা সেই যুগের বিশ্বাসের বিষয় হইলে, তাহা রামায়ণে থাকা অস্বাভাবিক নহে।

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৩

রামায়ণের আদিম স্তরের কোন স্থানেই অবতার কথার কোন উল্লেখ নাই। এস্থলে কি ভাবে হঠাৎ এই অবতার কথার অবতারণা করা হইয়াছে, পাঠক তাহা লক্ষ্য করুন।

ঋষ্যশৃঙ্গ বেদ বিধানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথা নিয়মে সমবেত হইলেন। যথা—

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
ভাবপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি॥ ৪। ১। ১৫

দেবগণ যজ্ঞস্থলে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে সমবেত হইয়াছেন—এ কল্পনা বৈদিক এবং বেশ স্বাভাবিক। এরূপ স্থলে সমবেত দেবগণের কোনরূপ মন্ত্রণাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির আবির্ভাবই আপত্তি জনক। (আপত্তির কারণ গুলি "সমাজের দেবতা" বিষয়ক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) পাঠক এই বার এই যজ্ঞভাগ গ্রহণ অভিলাষী দেবগণের মন্ত্রণার বিষয় ও কার্য্য প্রণালী লক্ষ্য করুন।

রামায়ণে অবতার প্রসঙ্গ।

দেবতারা সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়াই লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনার বর লাভ করিষা রাবণ নামক রাক্ষস বীর্য্য বলে আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে। ...আপনি শীঘ্র তাহার নিধনের উপায় বিধান করুন। (৫-১১ শ্লোক) ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ক্ষণকাল থাকিয়া রাবণ বধের উপায় বলিলে দেবগণ হর্ষলাভ করিলেন; ইত্যবসরে পীতাম্বর বিষ্ণুও গরুড় পৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...তখন দেবগণ বিষ্ণুকে দশরথের পত্নীগণের গর্ভে চারিভাগে যাইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলেন এবং প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলেন। বিষ্ণু দেবগণের ভয়ের কারণ সম্যক চিন্তা করিয়া একাদশ সহস্র বর্ষ (?) নরলোকে বাস করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেবগণকে আশ্বস্ত করিলেন। দেবগণ আশ্বস্ত

হইলেন, কিন্তু বিষ্ণুর চিন্তা দূর হইল না। তিনি তখনও চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কোথায় যাই, নরলোকে কার ঘরে জন্ম গ্রহণ করি?"

এবং দত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্॥
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ॥ ৩০।১।১৫

বিষ্ণুকে দিয়া এরূপ চিন্তা করাইবার সময় বোধ হয় প্রক্ষিপ্তকার ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে মন্ত্রণাটা হইতেছে কোথায়? স্বর্গে—দেবসভায়? না দশরথের যজ্ঞস্থলে আহুত হইয়া আসিয়া? এইরূপ ত্রুটী হেতুই ইহা প্রক্ষিপ্ত নহে; ভাবের অসামঞ্জস্যই এখানে প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের হেতু।

এইরূপে ১৫শ হইতে ১৮শ সর্গ পর্য্যন্ত এই প্রক্ষিপ্তভাব বিস্তৃত হইয়াছে। ১৮শ সর্গে বিষ্ণু চারি অংশে দশরথ পত্নীগণের গর্ভে আবির্ভূত হন। রাম বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশরূপে, ভরত বিষ্ণুর সিকি অবতাররূপে, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন মিলিত ভাবে বাকী সিকিরূপে আবির্ভূত হন।

এই রচনা যে বাল্মীকির ভাব সমর্থক নহে, ইহার আর এক প্রধান কারণ এই যে, যে রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য দেবগণের এত মন্ত্রণা ও উদ্বেগ প্রক্ষিপ্তকার (১৫শ সর্গে) দেবগণের মুখে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বাল্মীকির রামায়ণের মাঝে মাঝে সেই প্রক্ষিপ্তকারেরই কৃত এবম্বিধ ২।৪টা প্রক্ষিপ্ত উক্তি ব্যতীত, এত গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া, স্বর্গে মর্ত্ত্যে হুলস্থূল বাঁধাইয়া বধ করিবার মত চরিত্র রাবণের ছিল বলিয়া দেখা যায় না। বাল্মীকি তেমন ভাবে রাবণকে চিত্রিতও করেন নাই। বাল্মীকির রাবণ যে ধর্ম্ম জ্ঞান শূন্য পশু ভাবাপন্ন ছিলেন না, কিম্বা প্রক্ষিপ্তকারের অঙ্কিত গুরুদারগামী দেবরাজ ইন্দ্রের চরিত্র লইয়াও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না, সীতার অবলীলা ক্রমে সতীত্ব রক্ষা করিয়া থাকার ব্যাপারই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। প্রক্ষিপ্তকার তাহার এই কলুষিত কল্পনাকে সঙ্গতিদান করিবার জন্যই উত্তরকাণ্ডে রাবণ কর্ত্তৃক রম্ভা ধর্ষণের একটী আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিয়াছেন।

এবিষয়ে তাহার কল্পনার সঙ্গতি থাকিলেও বাল্মীকির রাবণ চরিত্রের সহিত উত্তরকাণ্ডের রাবণ-চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে নাই। সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইবার প্রধান কারণ, প্রক্ষিপ্তকারের উদ্দেশ্যের ব্যত্যয় এবং সেজন্য অনুরূপ প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাব।

এই সর্গের ৮ম, ৯ম ও ১০ ম শ্লোকে রাম লক্ষ্মণাদির জন্মের যে লগ্নমান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অনেক শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদের মতে প্রক্ষিপ্ত।[৪] মেষাদি রাশির সংজ্ঞা ও গ্রহ-নক্ষত্রের সম্বন্ধ তত প্রাচীন কালে ভারতীয় আর্য্যেরা অবগত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় না। মহাভারতে যাহা নাই, রামায়ণেরও অন্য কোন স্থলে যাহার পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তাহা সাধারণ বিচারে সন্দেহের বহির্ভূত নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের মত বিস্তৃত ভাবে গ্রন্থান্তরে আলোচিত হইল।[৫]

ব্রাহ্মণ গ্রন্থোক্ত প্রজাপতির মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হইবার ভাব অপেক্ষা মানব সমাজে ভগবানের অবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের ভাব বহু পরবর্ত্তী। এই পরবর্ত্তী ভাবের জন্ম দান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করিতেছি। আমাদের মনে হয়, গীতার—

মানব-অবতার কল্পনার সময়।

> "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
> ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এই উক্তিকে আশ্রয় করিয়াই তৎ পরবর্ত্তী কালে বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্ম পরিগ্রহের কল্পনা মহাভারত ও পুরাণ সমূহে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই মতের প্রবক্তা করিয়া

৪ আমাদের জ্যোতিষী। ১৬৪পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫ রামায়ণের জ্যোতিষ কথা "রামায়ণের সভ্যতা" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দণ্ডায়মান করা হইলেও তৎকালীন ভিন্ন মতাবলম্বী সমাজ শ্রীকৃষ্ণকে দশ অবতার মধ্যে গণনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নহে; "মহাভারতের সমাজ" গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

২০শ সর্গে রাজা দশরথের ক্ষত্রিয়োচিত চরিত্র ও উচ্চ মনোভাবকে প্রক্ষিপ্তকার দুর্ব্বলতার উপাদানে কলুষিত করিয়াছেন। রাজা দশরথের চরিত্রে এইরূপ হীনভাব ৭৫ সর্গে পুনরায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভাব বাল্মীকির প্রদর্শিত চিত্রের বিরোধী। যে দশরথের মুখে কবি বাহির করিয়াছেন—

দশরথের চরিত্রে বিরোধী ভাব।

যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥ ৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ ৩৭।২।১০

সেই দিকদেশাধিপতি দশরথ পরশুরামের নিকট কম্পিত কলেবরে রামের জীবন ভিক্ষা চাহিতেছেন! এইরূপ পরস্পর বিরোধী ভাবকে একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা নিরাপদ নহে। এই বিংশ সর্গেই দশরথের ষাইট হাজার বৎসর বয়ঃক্রমের কথাও আছে। এই উক্তিগুলিও যে পৌরাণিক যুগের, তাহার নির্দ্দেশ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। (৫৬ পৃষ্ঠা)

২৩শ সর্গের মদন-ভস্মের আখ্যানটী বৈদিক। বৈদিক আখ্যান ও পৌরাণিক আখ্যানের প্রভেদ প্রদর্শন জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে এই আখ্যানটীর আলোচনা করা গেল। রুদ্রের তেজে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল, এই কথাটী বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। এস্থলেও ঠিক তাহাই আছে। পুরাণ প্রভাব কালে

মদন-ভস্মের বৈদিক ভাব।

এই গল্পটীর সহিত উমা-মহেশ্বরের নাম যুক্ত হইয়া তাহার আখ্যান ভাগ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক রুদ্র বা অগ্নির স্থলে পুরাণে মহাদেব কল্পিত হইয়াছিলেন। শিব পুরাণে আছে—উমা মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে দেবগণের চক্রান্তে কাম তপস্যা নিরত মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করিতে অগ্রসর হন; এই অবস্থায় মহাদেবের ললাটের অগ্নিতে কাম ভস্মীভূত হন। ইত্যাদি—

এস্থলে শিবপুরাণের এই পৌরাণিক ভাবটী প্রবেশ করিতে পারে নাই। পৌরাণিক ভাবে প্রভাবিত রামায়ণের টীকাকারেরা কিন্তু রুদ্রকে মহাদেব রূপে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। রামায়ণে আছে—

অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণহ। ১৩ | ১ | ২৩

দেবেশ্বরকে রুদ্রের বিশেষণ মনে না করিয়া পৌরাণিক-মহাদেব মনে করা, আমরা সঙ্গত মনে করি না। পৌরাণিক যুগে মদন-ভস্মের বৈদিক আখ্যায়িকা নানা ভাবে পল্লবিত হইয়াছিল; তখন কোন গল্পই উমা-মহেশ্বরের সম্বন্ধ ব্যতীত বিবৃত হয় নাই। এস্থলে সেই পৌরাণিক ভাব নাই বলিয়াই ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা গেল না।

রুদ্র যে ক্রমে ক্রমে মহাদেবে পরিণত হইয়াছিলেন, সে ইতিহাস এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে "রামায়ণের দেবতা" শীর্ষক অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইল।

২৪শ সর্গের বৃত্রাসুর বধের উল্লেখটীও বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। পৌরাণিক প্রভাব ইহাতেও প্রবেশ করে নাই।

২৯শ সর্গে বর্ণিত বামন অবতারের গল্প ভাগ প্রক্ষিপ্ত। এই গল্পের মূল উপাদান—বিষ্ণুর ত্রি-পদ গমন নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গ বেদে আছে। ঋক বেদের—

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। ১।২২।১৭

ব্রাহ্মণদিগের আচমনের ঋকমন্ত্র—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" ১।২২।২০ ইত্যাদি মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে গল্প কল্পিত হইয়াছে, বামন পুরাণ তাহা আশ্রয় করিয়াই মহাপুরাণে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণে ব্রাহ্মণের গল্প গৃহীত হয় নাই ; বামন পুরাণের ও অন্যান্য পুরাণের পৌরাণিক কল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

বামন অবতার কল্পনার মূল উপাদান।

বেদের নির্দ্দেশকে পৌরাণিকেরা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত এই ঋক্ মন্ত্র দুটীর ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে দেখান গেল।

সূর্য্যকে বেদমন্ত্র সমূহে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বিষ্ণু (সূর্য্য) তিন পাদবিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ আকাশকে তিন ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে এক এক পাদ বলা হইয়াছে। এই পাদ বা ভাগ—কোথায় কোথায় ?

নিরুক্তকার গণের মত।

প্রাচীন নিরুক্তকার ঔর্ণবাভ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন—"সমারোহণে বিষ্ণু পাদে গয়া শিরসি।"[৬]

ইহার অর্থ—প্রথম পাদ—সমারোহণে অর্থাৎ উদয়ে বা উদয় গিরিতে আরোহণে, দ্বিতীয় পাদ—মধ্য আকাশে স্থিতিতে, তৃতীয় পাদ গয়াশিরসি বা অস্তাচলে (গয়শিরস্‌স্তং গিরৌ—দুর্গাচার্য্য)

মধ্য আকাশে অবস্থিত সূর্য্য-পাদকেই আচমন মন্ত্রে 'পরমং পদং 'বলা হইয়াছে এবং ঔর্ণবাভ—'বিষ্ণু পাদ' বলিয়াছেন।[৭]

এই সামান্য কথাগুলি হইতে যে কেবল বলি-বামনের কাহিনীই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে ; ঔর্ণবাভের "গয়া শিরসি" নির্দ্দেশ হইতে গয়া

৬। যাস্ক প্রণীত নিরুক্ত ১২। ১৯

৭। মধ্য আকাশের সূর্য্যই যে বিষ্ণু—এ সম্বন্ধে সত্যব্রত সামাশ্রমীর ব্যাখ্যা, "সমাজের দেবতা" অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

মাহাত্ম্যেরও উৎপত্তি হইয়াছে। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন—ঔর্ণবাভের "গয়া শিরসির" অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই গয়া মাহাত্ম্য প্রচারক গয়াতে বিষ্ণুপাদ স্থাপিত হওয়ার কল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষেও ঔর্ণবাভের পূর্ব্বের কোন সাহিত্যে গয়ার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।[৮]

গয়ামাহাত্ম্যের উৎপত্তির মূল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর ত্রি-পাদ গমনের গল্পটী এইরূপ ভাবে আছে—'দেবগণ অসুরদিগকে পরাজিত করিলে ইন্দ্র বলিলেন—বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন, ততটুকু দেবগণের; অবশিষ্ট অসুরদিগের। অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ-বিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন।[৯]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত।

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—"অসুরগণ বলিতেছে, বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত হয়, ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন।[১০]

শতপথ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণের মত।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক[১১] এবং পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণেও[১২] এই উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রামায়ণে এই সকল বৈদিক আখ্যান গৃহীত হয় নাই। বলী ও বামনের পৌরাণিক গল্প গৃহীত হইয়াছে।

৮। যাস্ক খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর নিরুক্তকার। তিনি তাঁহার নিরুক্তে ঔর্ণবাভের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং ঔর্ণবাভ আরো পূর্ব্বের লোক।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।২৮।৭ খণ্ড

১০। শতপথ ব্রাহ্মণ ১।২।১৩

১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৫।১

১২। তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ৭।৫

৩৫শ সর্গের গঙ্গোৎপত্তি বিষয়ক গল্পের কল্পনাটী খুব পরবর্ত্তী নহে। গঙ্গা খুব প্রাচীন নদী, ইহা বলাই বাহুল্য। এই নদী সম্বন্ধে বৈদিক যুগে যে কোন গল্প প্রচলিত ছিল না, তাহা বলা যায় না। এস্থলে উমা ও রুদ্রের যে সম্বন্ধ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার ভাব খুব প্রাচীন নহে; রুদ্র উমাপতি বলিয়া নারায়ণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছেন। এই সর্গে রুদ্র উমার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই। এই ভাবের উৎপত্তির ক্রম-ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে "সমাজের দেবতা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

রুদ্র-উমা সম্পর্ক প্রাচীন নহে।

৩৬শ সর্গে প্রাচীন ভাবের ভিতর অর্ব্বাচীন ভাব প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, এবং ৩৭শ সর্গটী ঐ ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য একেবারে নূতন করিয়া রচনা করা হইয়াছে। এই দুই সর্গের উদ্দেশ্য কার্ত্তিকেয়র জন্ম কথা বিবৃতি। "কুমার" শব্দ বৈদিক। "কার্ত্তিকেয়" বা "কার্ত্তিক" নাম বৈদিক নহে। এই নাম বৈদিক দেব-পুরাণ বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নাই। কুমার শব্দটী ঋকবেদেই আছে। ঋকবেদে অগ্নি হইতে কুমারের উৎপত্তি কথা অস্পষ্ট ভাষায় আছে।[১৩] ঐ অস্পষ্ট ভাবই ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে নানাভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকটির যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, সায়নাচার্য্য সেরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। মোটের উপর ঋকটীর অর্থ—মহতী অরনি ইহাকে (কুমারকে) উৎপন্ন করিয়াছেন। সায়ন কুমার শব্দে অগ্নি অর্থ করিয়াছেন। রামায়ণে বৈদিক রূপক পরিত্যক্ত হইয়া গল্পটী দাঁড়াইয়াছে—কুমার অগ্নির বীর্য্যে গঙ্গার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

কুমার কথা বৈদিক।

মহাভারতে কুমার রুদ্রের পুত্র; রুদ্র ও অগ্নি এক।[১৪] সুতরাং এই

১৩। ঋকবেদ ৫।২।১

১৪। মহাভারতের বনপর্ব্ব, শল্যপর্ব্ব, অনুশাসন পর্ব্ব প্রভৃতি নানা পর্ব্বে কুমার, স্কন্ধ

কল্পনাও বৈদিক পুরাণ আশ্রিত। এই ৩৭ সর্গে কেবল এই নির্দ্দেশটী থাকিলে ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার কোন কারণ থাকিত না। রামায়ণে এই প্রাচীন ভাবের উপর জোর করিয়া আনিয়া উমা-মহেশ্বরের পৌরাণিক রতি ক্রীড়ার গল্প যুক্ত কয়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শিব-শক্তির চিন্তাকে আমরা পৌরাণিক বলিয়াই মনে করি। এই সর্গের কৃত্তিকা নক্ষত্র সম্বন্ধীয় কথাও প্রাচীন। স্কন্দ ও কার্ত্তিককে পুরাণে অভিন্ন করা হইয়াছে। তাহাও বৈদিক চিন্তা প্রসূত নহে। রামায়ণে প্রাচীন ভাবের উপর এইরূপ পৌরাণিক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মহামতি তিলক বেদের সপ্তবধু উপাখ্যানের মূলে স্কন্ধ পুরাণের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন স্কন্দের বাহন কুক্কুট। কুক্কুট স্মৃতির অনুশাসনে পরিত্যক্ত হওয়ায় তৎস্থলে স্কন্দের বাহন ময়ূর কল্পিত হইয়াছে।

সগর-কথায় প্রক্ষিপ্ত অংশ।

৩৮শ হইতে ৪৪শ সর্গ—সগর বংশের বিবরণ। এই বিবরণ পদ্ম পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণ—এই তিন গ্রন্থে তিন ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গল্পটী প্রাচীন; অন্ততঃ ইক্ষ্বাকু কুলেরই প্রাচীন কথা বলিয়া রামায়ণের ভিতর তাহার স্থান থাকা উচিত। বোধহয় আদি রচনায় ছিলও সেইরূপ নির্দ্দোষ ভাবে। ক্রমে তাহাতে আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া কপিলের অবতারত্ব ও এইরূপ আরও অনেক অর্ব্বাচীন ভাব এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। বাসুদেব-কথাও পুনঃ পুনঃ এই সকল সর্গে আছে। যথাঃ—

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যৈষা স এব ভগবান্ প্রভুঃ॥ ২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্॥ আদি ৪০

বা কার্ত্তিকের জন্ম-কথা নানা ভাবে আছে। আমরা এস্থলে বনপর্ব্বের ২২৩ অধ্যায়ের কথা উল্লেখ করিলাম মাত্র।

অন্যত্র—দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥ ২৫।১।৪০

এই সকল ভাবকে অনেকেই অর্ব্বাচীন বলিয়া মনে করেন।[১৫] এই সর্গে এই ভাব অর্ব্বাচীন হইলেও কপিল, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দ মাত্রেই খুব আপত্তিজনক কি না বিচার্য্য বিষয়। রামায়ণের বাসুদেব দ্বারা যদি মহাভারতের বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করা হয়, তবে তাহা অবশ্যই আপত্তিজনক। নতুবা, বাসুদেব, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কপিল, জন্মেজয়, পরীক্ষিত—প্রভৃতি শব্দ কোন প্রাচীন গ্রন্থে থাকিলেই যে তাহা মহাভারত হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। 'জন্মেজয়' শব্দও রামায়ণের একস্থলে আছে, যথাঃ—

বাসুদেব, কপিল প্রভৃতি শব্দ বিচার।

যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ। ৪২।২।৬৪

ইহাও কেহ কেহ আপত্তি জনক বলিয়া মনে করিয়াছেন; আমরা কিন্তু তেমন আপত্তি জনক মনে করি না। কেন না, জন্মেজয় নামটী ততোধিক প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে আছে। সূর্য্যবংশের ৩৯ পুরুষে হরিশ্চন্দ্রের ধারায় এক বসুদেব ও ৩৭ পুরুষে বুধের ধারায় এক জন্মেজয়ের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১৬] এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ শব্দ অর্জ্জুন শব্দের সহিত একত্র ঋকবেদে আছে।[১৭] কপিল শব্দও ঋক্‌বেদে আছে;[১৮] "পরীক্ষিত পুত্র জন্মেজয়" শব্দ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে।[১৯] পরীক্ষিত শব্দ অথর্ব্ববেদেও আছে।[২০] বাসুদেব নামটী নাকি চতুর্ব্বেদেই আছে; যথাঃ—

---

১৫ Vide Calcutta Review March 1922.

১৬ পৃথিবীর ইতিহাস ১ম ভাগ ২৯৩ পৃষ্ঠা—সূর্য্যবংশের তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৭ ঋক্‌বেদ ৬।৯।১

১৮ ঋক্‌বেদ ১০।২৭।১৬

১৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩৫।১

২০ অথর্ব্ববেদ ২০।১২৭

"বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষুচ চতুর্ব্বুচ"। (শব্দ কল্পদ্রুম)
সুতরাং শব্দ দেখিয়াই বিনা বিচারে তাহার প্রাচীনতা বা অর্ব্বাচীনতা নির্দ্দেশ করা সমীচীন নহে। শব্দের ভাব দ্বারাই বিচার সঙ্গত; আমরা সেরূপ ভাবেই কথাগুলি বলিলাম।

৪৫শ সর্গ—সমুদ্র মন্থন। রামায়ণের এই বিবরণটী শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতেও এই গল্প গৃহীত হইয়াছে। ঋক্-বেদের ৯ম মণ্ডলের ৪৮।৪, ১০৮।৩, ১১০।৮ প্রভৃতি ঋকের সোম আহরণের আভাস লইয়া এই পৌরাণিক গল্পের উৎপত্তি। শেষ ঋকটীতে স্বর্গ হইতে সোম দোহনের কথা আছে। আকাশের সহিত জলের সম্পর্ক হইতে পৌরাণি-কেরা আকাশকে সমুদ্র কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। অমৃত লইয়া দেব ও অসুরগণের দ্বন্দ্বের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে[২১]। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদির অবির্ভাব দ্বারাই এই প্রসঙ্গটীকে সন্দেহজনক করিয়া তোলা হইয়াছে। এই পরবর্ত্তী কল্পনাই শ্রীমদ্ভাগবতের।

সমুদ্র মন্থনের বৈদিক উপাদান।

৪৬শ ও ৪৭শ সর্গ—ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির গর্ভচ্ছেদ। দিতি শব্দ বেদে আছে, কিন্তু এই সর্গে বর্ণিত গল্পটী বৈদিক নহে। 'দিত' ধাতু ছেদনে—এই ভাব হইতেই বোধ হয় এই গল্পটীর সৃষ্টি।[২২] রামায়ণের এই গল্প বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত। বেদের ইন্দ্র, নিষ্টিগ্রীর পুত্র। ইন্দ্র যে পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, ঋকবেদের ৪।১৮।১২ ঋকে তাহার আভাস

মরুৎ উৎপত্তির মূল।

২১ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৬।৮

২২ এই স্থলে বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদের ৬।৫।২৩ শ্রুতিটী উল্লেখ যোগ্য। এই শ্রুতির অর্থ—হে ইন্দ্র তুমি সেই পথ অবলম্বন করিয়া গর্ভের সহিত বহির্গত হও।

আছে। ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিতির গর্ভ ছেদন হইলে তাহা হইতে মরুৎ-গণের উৎপত্তি হয়। মরুৎ উৎপত্তির কথাও প্রাচীন। ঋকবেদে মরুৎ উৎপত্তির কথা আছে।[২৩] বেদে মরুৎদিগের পিতা রুদ্র বা উগ্র, মাতা পৃশ্নি। এখানে পৌরাণিক কল্পনার আবরণে গল্পটী সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪৮শ ও ৪৯শ সর্গ—ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদ। রাম যে বিষ্ণুর অবতার, তাহা প্রমাণের জন্য এই গল্পটী কল্পিত হইয়াছে। চেষ্টা সফল হয় নাই। কেবল সমসাময়িক সামাজিক রুচিরই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অবতারবাদ কল্পনাটী যেমন ১৮শ সর্গের তিনটী মাত্র পংক্তিতে প্রাণহীন ভাবে উক্ত হইয়াছে, এই গল্পও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। গল্পের কোন স্থানেই উজ্জল দেব-ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। একটী মাত্র শব্দ "তারয়ৈনাং" দ্বারা সে ভাব প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে।

ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদ প্রক্ষিপ্ত।

তারয়ৈনাং মহাভাগামহল্যাং দেবরূপিণীম্ "

গল্পটী উত্তরকাণ্ডের ৩৫শ সর্গেও আছে কিন্তু উভয় বর্ণনার মিল নাই। উত্তরকাণ্ডের বর্ণনায় অবতার ভাব অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্রহ্মণার্থে মহাবাহুর্ব্বিষ্ণুর্ম্মানুষবিগ্রহঃ॥ ৪২
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে ততঃ পূতা ভবিষ্যসি।
সহি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৪৩

কৃত্তিবাসে সে ভাব আরো প্রাণ-পদ। পাঠক তাহা মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কোন এক ভাবের রচনার ভিতর পরবর্ত্তী যুগের ভিন্ন ভাবের রচনা প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিলে যে উভয় রচনার সঙ্গতি রক্ষিত

২৩ ঋকবেদ ১।২৩।১০

হয় না, পরন্তু পদে পদে অসঙ্গতি ধরাপড়ে, তাহা দেখাইবার জন্যই এ স্থলে আমরা এতকথা বলিলাম।

এই সর্গটী যে একেবারেই বাল্মীকির রচনা নহে, তাহা মনে করিবার আরো কারণ আছে। বাল্মীকির ভাব রামায়ণের সর্ব্বত্র সংযত। এরূপ অবস্থায় এই প্রকার অসঙ্গত হীন রুচির পরিচয় এইরূপ সংযত চিন্তার মধ্য হইতে বাহির হওয়া—বিশেষ কবির সম-সাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির পত্নীর বিরুদ্ধে—তথা, একজন সাক্ষাৎ সমুপস্থিত আচার্য্যের জননীর সম্পর্কে—আমরা কিছুতেই সমীচীন মনে করিতে পারি না। রামায়ণের কোন স্থলেও যদি এইরূপ হীন চিন্তার আভাস আমরা পাইতাম, তবে এরূপ মনে করিতাম না। উন্নত রুচির পরিচয় রামায়ণের কবি তাঁহার কাব্যে যত বেশী দিয়াছেন, জগতের আর কোন কাব্যে কোন কবি তেমন অধিক পরিমাণে দিয়াছেন—শুনা যায় না।

রামায়ণের এই অহল্যা কথা পুরাণে আছে। পুরাণের পক্ষে এ গল্প পুরাতনই বটে; কিন্তু রামায়ণের পক্ষে তাহা নহে। অহল্যার পুত্র শতানন্দ বিদেহ রাজ জনকের পুরোহিত, রাম লক্ষ্মণাদির বৈবাহিক ব্যাপারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। এরূপ সাক্ষাৎ উপস্থিত একজন ঋষির মাতার সম্বন্ধে বক্তা বিশ্বামিত্রইবা এসকল অপবাদ কথা প্রকাশ করেন কি প্রকারে?

দুরারোগ্য রোগ জন্মিলে রোগীর উদ্ধার জন্য সকল কার্য্যই করণীয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি আমাদের হিন্দুর দেবতা, দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপই মনুষ্যেরও অধম, এবং পশু-প্রকৃতির ছিলেন? তবে আমরা দেব চরিত্রের এত প্রশংসা করি কেন?

"Hindu Mythology"র ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন—

রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় জাতি বিদ্বেষের ভাব নাই, স্মৃতিতে-উক্ত নিম্ন জাতি সমূহের কোন উদ্ভবের আভাসও তাহাতে নাই। যে

জাতি বিদ্বেষ ভাব প্রাচীন নহে।

সময়ের ঋষি, অযোধ্যার রাজা রাম দ্বারা তাঁহারই রাজধানীর অদূরবর্ত্তী নিষাদ জাতীয় রাজাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করাইয়াছেন, অনার্য্য সুগ্রীবকে করমর্দ্দন করাইয়া সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ করাইয়াছেন, যে সময়ের রচনায় জাতির উচ্চ নীচ বিষয়ক কোন মাপকাঠিই ছিল বলিয়া জানা যায় না, চণ্ডাল বলিয়া কোন শ্রেণীই ছিল না, সেই সময়ের রচনার ভিতর যদি থাকে—

"ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্॥ ১৪।১।৫৯

কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ।

তবে কি তাহা সেই এক সময়ের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে? এই কতিপয় সর্গে এইরূপ বহু পরবর্ত্তী ভাব আছে।

৬০ম সর্গে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গ গমন কথা।

৬১ম ও ৬২ম সর্গে শুনঃশেফ কাহিনী। শুনঃশেফ কাহিনীর আভাস ঋকবেদে আছে।[২৮] ঋকবেদ হইতে তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে [২৯] ও বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে [৩০] গৃহীত হইয়াছে। ঋকবেদের শুনঃশেফ অজীগর্ত্তের পুত্র, রামায়ণের শুনঃসেফ ঋচিকের পুত্র। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে ঋকবেদের শুনঃশেফের যে গল্প বিকৃত হইয়াছে, রামায়ণে তাহা গৃহীত হয় নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—পুত্রহীন হরিশ্চন্দ্র পুত্র প্রাপ্তির জন্য বরুণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

---

২৮ ঋকবেদ ১।২৪

২৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩৩

৩০ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।২৩১

গর্ভে শতানন্দের জন্ম। টীকাকার শরদ্বানকেই গৌতম বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই স্থানে ইন্দ্রের কোন কথা নাই।

বিষ্ণুপুরাণ।

ভাগবত পুরাণেও [২৫] গৌতমের ঔরসে অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম কথা ব্যতীত আর কোন কথা নাই। শ্রেষ্ঠ পুরাণ গুলিতে যদি সেরূপ কথা নাই। তবে দেবরাজ ইন্দ্রের এই অপবাদের মূল কোথায়?

ভাগবত।

কথিত আছে যে বেদদ্বেষী বৌদ্ধ নিন্দুকেরা হিন্দু দেবদেবীর নিন্দা গাথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে মহাপণ্ডিত কুমারিল ভট্টের সহিত তাহাদের বিচার হয়। বৌদ্ধেরা বেদের অপব্যাখ্যা করিয়া যে সকল মত-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, কুমারিল ভট্ট তাহা খণ্ডন করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্র-অহল্যার ব্যাপারটী বৌদ্ধ প্রচারকগণ কর্ত্তৃক বেদের অপব্যাখ্যারই ফল। সেই সময় এই গল্পটী এত প্রসার লাভ করিয়াছিল যে তাহা আর্ষ রামায়ণের সাহায্যেও প্রচারিত হইয়াছিল। কুমারিল তখন এই গল্পেরই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কুমারিলের এই প্রতিবাদ-ব্যাখ্যা তৎপ্রণীত বৈদিক দেবতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা অধ্যাপক মেক্সমুলারের "Ancient Sanscrit Literature" গ্রন্থ হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বেদদ্বেষী বৌদ্ধদিগের কার্য্য।

কুমারিল বলেন—বেদের 'অহনিলীয়মানতয়া' এই বাক্যাংশের বিপর্য্যয় কল্পনা হইতেই এই অপবাদ মূলক গল্পের সৃষ্টি। ইহা প্রকৃত পক্ষে একটী রূপক বর্ণনা মাত্র। অহল্যা অর্থ রাত্রি, ইন্দ্র অর্থ সূর্য্য। "সমস্ত তেজাঃ

কুমারিল ভট্টের প্রতিবাদ।

২৫ ভাগবত পুরাণ ৪।২১।৩৩

পরমেশ্বরত্ব নিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যং সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দ-বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।”

অর্থ—তেজোময়সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতু ইন্দ্রপদ বাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করে বলিয়া সবিতাকে অহল্যাজার বলে; ব্যভিচার জন্য নহে।

বেদের একটী কথা পরবর্ত্তী কল্পনার প্রশ্রয়ে কিরূপ বিকৃত অর্থে প্রচারিত হইয়াছে—‘অহল্যা’ ও ‘ইন্দ্রজার’ কথাদ্বয় এবং ব্রহ্মার কন্যা গমন কথা তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মার কন্যাগমন কথাটীও বৈদিক। ঋকবেদে তাহা আছে।[২৬] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সে ভাব বিস্তৃত হইয়াছে।[২৭] এগুলি যে রূপক তাহাই কুমারিল দেখাইয়াছেন। কুমারিল বলেন—প্রজা-পালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে বেদে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। অরুণ উদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি। এজন্য উষা সূর্য্যের দুহিতা। উষার সহিত প্রজাপতি সূর্য্যের তেজের সংযোগ ঘটে, এই জন্য উষা ও সূর্য্য (প্রজাপতিকে) স্ত্রী পুরুষ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।’

ব্রহ্মার কন্যাগমনে কুমারীলের মত।

ঋকবেদের উক্তি এই ভাবের সমর্থক হইলেও বেদের এই সকল ভাবই বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় বিকৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল এবং সেই অনুসারে তৎকালীয় কবিগণ স্ব স্ব কল্পনার পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন।

কুমারিল পঞ্চম শতাব্দীর লোক। তাঁহার আবির্ভাব কালের পূর্ব্বেই রামায়ণে অহল্যা প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছিল। এতদ্বারা রামায়ণের

২৬ ঋকবেদ ১০।৬১।৬

২৭ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১৩।৯

অহল্যা কথারই প্রতিবাদ তিনি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সংস্কারের প্রভাব অচিন্তনীয়। সেই অচিন্তনীয় সংস্কার প্রভাবে কুমারিলের ব্যাখ্যা সমাজে গ্রাহ্য হয় নাই। তাই আমরা পরবর্ত্তী অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও সেই সকল উক্তির পুনরুক্তি দেখিতে পাই; এবং এক সময়ের সমাজের দুর্নীতির অবস্থাই তাহার সাহায্যে অবগত হইয়া থাকি।

পরিবর্ত্তন হেতু অসামঞ্জস্য।

৫০শ সর্গে কোন পরবর্ত্তী ভাব নাই। এই সর্গের যজ্ঞটী, যাহার সমাপনের আর দ্বাদশ দিবস অবশিষ্ট আছে বলিয়া ১৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, প্রক্ষিপ্তের চাপে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপনের কোন কথাই আর পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে দৃষ্ট হয় না।

প্রক্ষিপ্ততার চাপে এইরূপ উপেক্ষা আরো অনেক বিষয়েই হইয়াছে। ১১শ সর্গের ২২ শ্লোকে ঋষ্যশৃঙ্গ নিজ ভার্য্যার সহিত গমন করিতেছেন—দেখাযায়; সে সম্বন্ধে কিন্তু আর কোন কথারই উল্লেখ পরে কোথাও দেখাযায় না। ২২ সর্গে রাম কৌশল্যার নিকট বিদায় লইলেন আছে; কিন্তু লক্ষ্মণ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই নাই। এগুলিকে মহাকবির উপেক্ষা নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা প্রক্ষিপ্তকারের পরিবর্ত্তন-জাত ত্রুটী বলিয়া নির্দ্দেশ করাই উচিত মনে করি। কারণ—যেরূপ যত্ন লইয়া পরিবর্ত্তন করিলে রচনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে, তেমন যত্ন এই সকল স্থলে গৃহীত হয় নাই।

৫১শ সর্গে শতানন্দের মুখেই তদীয় মাতা অহল্যার অপরাধ কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

৫২শ—৬০ম সর্গে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ সংবাদ। এই গল্প বৈদিক হইলেও তাহাতে বহু পৌরাণিক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

" জাতীয় চরিত্রের আভাস জাতির দেবতার চরিত্রে ফুটিয়া উঠে। যে জাতির নৈতিক চিন্তা যেমন, সে জাতির কল্পনায় তাহাদের দেব চরিত্রও তেমন।"

এ সম্বন্ধে বৈদেশিক মত।

কথাটী অপ্রিয় হইলেও সত্য। আমরা যে আমাদের দেবরাজ ইন্দ্রকে গুরুপত্নী গমন রূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হইতে দেখি; আমাদের প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ কন্যায় উপগত হইয়াছিলেন, বলিয়া পাঠ করি; দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রবণ করি এবং এই সকল কথাকে ধর্ম্মকথা বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের হীনতার ও দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নয় কি?

আমাদের 'পুরাণ কথা' একেবারে মূল্য-হীন নহে। পুরাণ গুলি বেদের বাণী আশ্রয় করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে। বেদের সামান্য সামান্য শব্দকেই, কথাকেই—পুরাণকারগণ বৃহৎ বৃহৎ উপখ্যানে পরিণত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের রুচি যদি এক হইত, সকলের ভাব বুঝিবার শক্তি যদি অনুরূপ হইত, তবে পুরাণে পুরাণে এত প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। এস্থলে এই অহল্যা উপখ্যান দ্বারাই তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করা গেল।

পুরাণের মত।

যোগবাসিষ্ঠে অহল্যার কথা এইরূপ আছে—অহল্যা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। তিনি গোতম-পত্নী অহল্যা ও ইন্দ্রের পুরাণ-কাহিনী শুনিয়া ইন্দ্র নামক কোন এক ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্তা হন; রাজা জানিতে পারিয়া প্রণয়ী যুগলকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যোগবাসিষ্ঠ।

বিষ্ণুপুরাণে[২৪] অহল্যার কথা এইরূপ—শরদ্বানের ঔরসে অহল্যার

২৪ বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৯।১৬

প্রার্থনা ছিল, হরিশ্চন্দ্র পুত্রমুখ দর্শন করিয়া সেই পুত্রটী দ্বারাই বরুণের যাগ সম্পাদন করিবেন। পুত্র প্রাপ্তির পর কিন্তু হরিশ্চন্দ্র তাহা করিলেন না; এবং আজ-কাল করিয়া সময় কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া পুত্রের নিকট ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, পুত্র রোহিত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বনে চলিয়া গেলেন। তখন বরুণের চাপে হরিশ্চন্দ্রের উদরী রোগ হইল। এদিকে ইন্দ্রের পরামর্শে রোহিতও বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। শেষে রোহিত অজীগর্ত্তের নিকট হইতে শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া আনিয়া দিয়া পিতৃ ঋণ মুক্ত হইল। হরিশ্চন্দ্র তখন পুত্রের পরিবর্ত্তে শুনঃশেফকেই বলি স্বরূপ রাখিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা ছিলেন। শুনঃশেফ ইন্দ্রের স্তব করিয়া ইন্দ্রের উপদেশে মুক্তি পাইলেন।

ইহাই শুনঃশেফের বৈদিক আখ্যায়িকা। রামায়ণে এই আখ্যায়িকা গৃহীত হয় নাই। রামায়ণে রাজার নাম হরিশ্চন্দ্র স্থলে আছে অম্বরীষ; অজীগর্ত্তের স্থলে আছে, ভৃগু পুত্র ঋচিক। এইরূপ প্রভেদ থাকিলেই যে উহা প্রক্ষিপ্ত হইবে, তাহা নহে। পুরাণে থাকিলেও তাহা পৌরাণিক হইবে না। ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণেও এই গল্প আছে। বৈদিকগল্পও রামায়ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হইতে পারে, এবং সেই পরিবর্ত্তিত গল্পাংশ পুরাণে গৃহীত হইতে পারে। এইরূপ হইলেই তাহা দোষণীয় হইবে না।

এই সর্গে আপত্তি জনক উক্তি—ইন্দ্রানুজ বিষ্ণুর উল্লেখ। বিষ্ণু শব্দ বৈদিক হইলেও "বৈষ্ণব"[৩১] ভাবটী পৌরাণিক। পুরাণেই বিষ্ণুকে ইন্দ্রানুজ করা হইয়াছে।

---

৩১ বিষ্ণু শব্দ যখন প্রাচীন, তখন তাহার ধাতুগত বৈষ্ণব শব্দও প্রাচীন। যথা—"পবিত্রেস্থো বৈষ্ণবৌ"—বাজঃ সংহিতা ১।১২।১; শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।৩।১ আধুনিক বৈষ্ণব ভাবটীই পৌরাণিক।

"ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ। ২৫। ১। ৬২।
এই সর্গে এইরূপ আরও দুই একটী আপত্তিজনক পংক্তি আছে।

আমরা এই সর্গের আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, গল্পের অসামঞ্জস্যতা—প্রক্ষিপ্ত নির্দ্দেশের হেতু নহে। বৈদিকযুগেও শাখায় শাখায় রীতি ভেদ ছিল, সেই জন্য একই গল্প বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই বৈদিক গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতির উপরই পৌরাণিক যুগে পৌরাণিক দেব-প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। পৌরাণিক যুগ প্রভাবে যে প্রাচীন শব্দের স্থলে নূতন ভাব ও শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদত্ত হইল।

শব্দ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত।

রাম যে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সীতাকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন, এই ধনুর্ভঙ্গই আদিকাণ্ডের একটী প্রধান বিষয়। এই ধনুটীকে রামায়ণে 'হরধনু' বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। শিবের এক নাম—হর। "হরধনুকে" বাল্মীকির কল্পনা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, সমাজে হর বা শিবের আবির্ভাব কালকেও বাল্মীকির সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমরা তাহা করি নাই। কেন করি নাই, সমাজের দেবতা প্রসঙ্গে তাহা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি, রামায়ণের রচনা কালে আর্য্য সমাজে হরি-হরের, তথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিদেবতার পৌরাণিক কল্পনা ছিল না।

বালকাণ্ডের ৩১শ সর্গে বিশ্বামিত্র এই ধনুর পরিচয় দিতে যাইয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বে দেবতারা যজ্ঞ সভাতে রাজা জনককে যে ধনু দিয়াছিলেন, তাহা অপরিমিত-বল সম্পন্ন, তোমরা সেই স্থানে গেলে যজ্ঞ ও ধনু দেখিতে পাইবে।"

এ স্থলে ধনুটী যে মহাদেবের দান, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

বালকাণ্ডের ৬৬ম সর্গের ৭ম ও ৮ম শ্লোকে জনক রাজা নিজে ধনুর পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন—"এই ধনু কি প্রকারে আমার নিকট আছে, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাত নামে নরপতি ছিলেন, তাঁহার হস্তে দেবতারা এই ধনু ন্যাস স্বরূপ রাখিয়াছিলেন।..."

এই অংশকে আমরা প্রাচীন স্তরের ভাবযুক্ত রচনা বলিয়া মনে করিতে আপত্তির কারণ দেখি না; ইহার পরবর্ত্তী ৯ম হইতে ১২শ শ্লোকগুলিও আপত্তি জনক নহে। এই কতিপয় শ্লোকে এই ধনু যে "দেবদেবস্য", তাহা দক্ষযজ্ঞের একটি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে; এবং পরবর্ত্তী ১৮শ প্রভৃতি শ্লোকে এই ধনুকে 'হরধনু', শৈবধনু' ইত্যাদি নামে পরিচিত করা হইয়াছে।

দক্ষযজ্ঞ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ যোগ্য যে—দেবগণ কর্ত্তৃক পশুপতিকে (রামায়ণের দেবদেবকে) যজ্ঞ হইতে বহিষ্করণের কথা—যাহা এই স্থলে (১০ম শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তাহা অবৈদিক নহে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রুদ্র প্রভাব প্রসঙ্গে তাহার অতি সামান্য আভাস আছে।[৩২] শতপথ ব্রাহ্মণে তাহা বেশ স্পষ্ট ভাবেই আছে।[৩৩] আপত্তি—কেবল দেবতার নামটী লইয়া। শতপথের পশুদিগের দেবকে পুরাণে 'শিব' বা 'মহাদেব' করিয়া লওয়া হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে যে শব্দগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত, এস্থলে তাহা বিশেষ্যরূপে উক্ত হইয়াছে; ইহাই পৌরাণিক ভাব ও চেষ্টা। ইহাতে গুরুতর পরিবর্ত্তন কিছু নাই; কেবল মাঝে মাঝে প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে শব্দ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

দক্ষ যজ্ঞের ভাব প্রাচীন

---

৩২ তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৬

৩৩ শতপথ ব্রাহ্মণ – ১।৬।১।১ – ৪

শতপথ ব্রাহ্মণের দক্ষ পার্ব্বতী অর্থাৎ পর্ব্বতপুত্র।[৩৪] পতি প্রাপ্তি জন্য কুমারীগণের ত্র্যম্বকের পূজার কথাও শতপথে আছে।[৩৫] ঋক-বেদে দক্ষ তনয়াকে যজ্ঞ ভূমি বলা হইয়াছে।[৩৬] এই সকল উপদেশ সংযোগেই বোধহয় পুরাণের দক্ষযজ্ঞের গল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এইবার সীতার মুখে ধনুর পরিচয় শুনুন। অযোধ্যাকাণ্ডের ১১৮শ সর্গে সীতা অত্রি-পত্নীর নিকট নিজমুখে বলিতেছেন—

"আমার পিতার (জ্যেষ্ঠ) ভ্রাতা মহানুভব দেবরাতের মহাযজ্ঞে মহাত্মা বরুণদেব প্রীত হইয়া এই মহৎ ধনু ও অক্ষয় শারক সম্পন্ন তূনদ্বয় দিয়াছিলেন।" ... ইত্যাদি।

রামের মুখেও এই কথারই পুনরুক্তি অযোধ্যাকাণ্ডের ৩১শ সর্গে আছে। যথা, রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"যে চ রাজ্ঞো দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্।
জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে॥ ২৯।২।৩১

বরুণ বৈদিক দেবতা। বাল্মীকি তাঁহার যুগের দেবতা বরুণের ধনু বলিয়াই এই ধনুকে পরিচিত করিয়াছিলেন। ইহার কোন স্থলেই শিবের নাম ছিল না। শৈব মতের প্রভাব কালে বরুণ ধনুকেই 'হরধনু', 'শৈবধনু' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছিল। এইরূপেই বৈষ্ণব প্রভাব কালে রামকেও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং রামায়ণের সাহায্যে বাল্মীকির চিন্তার পরিচয়ে তাহা সহজ করিয়া তোলা হইয়াছিল।

বরুণধনু—হরধনু নহে।

৬৬ম সর্গ পর্য্যন্ত বিশ্বামিত্রের তপস্যার কথা বলা হইয়াছে।

৩৪ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।১।৬

৩৫ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৫।৯।১৪ ৩৬ ঋকবেদ ৩।২৭।৯

বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ সম্বন্ধে এই একটী প্রশ্ন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে যে, বেদের বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ ও রামায়ণের বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ অভিন্ন কি না?

ঐতিহাসিক ভাবে দেখিতে গেলে বেদের সুদাস হইতে দশরথ ও রাম বহু পুরুষ পরবর্ত্তী; অথচ এই সুদাস রাজারই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ উভয়ে। এইরূপ বিচারে এই দুই যুগের ঋষিগণ কখনই এক হইতে পারেন না। কিন্তু রামায়ণকে যদি কাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উপস্থিত হয় না।

বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ কথা।

আমাদের মনে হয়, বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ কাহারও নাম নহে। বংশের উপাধি মাত্র। বেদে ইহার প্রমাণ আছে। ঋক্‌বেদের বহু ঋকে 'বশিষ্ঠগণ', 'বিশ্বামিত্রগণ';—যজুর্ব্বেদে, 'ভৃগুগণ', অঙ্গিরাগণ, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। বসিষ্ঠগণের যে শ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ সুদাসের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, ঋকবেদে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনি মিত্রবরুণের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।[৩৭] রামায়ণের বসিষ্ঠ ব্রহ্ম-নন্দন।[৩৮] মিত্র-বারুণী বা মৈত্রা-বরণী পরিচয়ে তিনি রামায়ণের কোথাও পরিচিত হন নাই।

বিশ্বামিত্র ও বসিষ্ঠ নাম নহে, উপাধি।

অপর পক্ষে বৈদিক গাথি-নন্দন[৩৯] বিশ্বামিত্রকে পুরাণে গাধিনন্দন করা হইয়াছে এবং এই পৌরাণিক উক্তি রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। শব্দ পরিবর্ত্তনটী রামায়ণেই প্রথম করা হইয়াছে, কি পুরাণ হইতে অশুদ্ধ পাঠ রামায়ণ গৃহীত হইয়াছে, বুঝিবার উপায় নাই।

---

৩৭ ঋকবেদ ৭।৩৩।১০—১২

৩৮ রামায়ণ ৬।১।৫২; ২৪।১।৬৫

৩৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।৩৩।৬

ঋকবেদে ঋক্ষগণের কথা আছে।[৪০] ঋক্ষগণই পরে সপ্তর্ষি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।[৪১] সপ্তর্ষি মণ্ডলের একটী নক্ষত্র বসিষ্ঠ। লঙ্কা কাণ্ডে ৪র্থ সর্গে রাম ঐ সপ্তর্ষি মণ্ডল মধ্যস্থিত বসিষ্ঠকে তাঁহাদিগের কুল-পুরোহিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

সপ্তর্ষি-বসিষ্ঠ।

ত্রিশঙ্কুর্ব্বিমলো ভাতি রাজর্ষিঃ সপুরোহিতঃ।
পিতামহঃ পুরোঽস্মাকং ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মানাম্॥ ৪১।৬।৪

অর্থ—মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু (সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী) 'পুরোহিত' (বসিষ্ঠের) সহিত বিমল কিরণ প্রকাশ করিতেছেন। পুরোহিত শব্দ দ্বারা টীকাকারগণ বসিষ্ঠকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৈদিক সমাজে এমন বিশ্বাস ছিল যে, যাঁহারা পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ লোকের অধিকারী হন, তাঁহারা তারকারূপে আকাশে দেদীপ্যমান থাকিতে সমর্থ হন।[৪২] সপ্ত-ঋষির আদি-পুরুষগণ সেইরূপ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আকাশে স্থান পাইয়াছিলেন। সপ্তর্ষি নক্ষত্রের মধ্যে বসিষ্ঠ একটী নক্ষত্র। বেদ ও রামায়ণের বসিষ্ঠ ঋষি বোধ হয় সেই বসিষ্ঠেরই গোত্রজ।[৪৩]

রামায়ণে রামের উক্তিতেও যেন এই বিশ্বাসটীই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া

---

৪০ ঋকবেদ ১।২৪।১০

৪১ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৪

৪২ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২।৯।২৪।১৩

৪৩ আপস্তম্ব সূত্রের মুখবন্ধে বুলার সাহেব আপস্তম্ব ঋষিদিগের সম্বন্ধে এই রূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন আপস্তম্ব নাম নহে, গোত্র উপাধি। (Family name)— Georg Bhuler,s Introduction to Apasthamba. Page xv.

মনে হয়। বসিষ্ঠ যে একটী শ্রেষ্ঠ ধারা বা গোত্র, তাহার উল্লেখ আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রেও আছে।[৪৪]

গোত্র প্রবর্ত্তক আদি বসিষ্ঠের পত্নীর নাম ছিল অরুন্ধতী। রামায়ণের যুগে সেই অরুন্ধতী সপ্তর্ষির মধ্যস্থলে থাকিয়া বসিষ্ঠ-পত্নী রূপেই পরিচিতা ছিলেন। পৌরাণিক-যুগে তিনি উভয় যুগের অভিন্ন বসিষ্ঠের পত্নী বলিয়া পরিচিতা হন। আরণ্যকাণ্ডের ১৩শ সর্গের ৭ম শ্লোকে তাহার উল্লেখ আছে। সে স্থলে তাঁহাকে দেবতাশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া তাঁহার সহিত সীতার তুলনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধ ও বিশ্বামিত্র।

এদিকে বুদ্ধদেবের জীবনী গ্রন্থ "ললিত বিস্তারে" বিশ্বামিত্রের কথা আছে। বিশ্বামিত্রের নিকট বুদ্ধ লিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ স্থলে সকল বিশ্বামিত্র ও সকল বসিষ্ঠকে অভিন্ন মনে করিলে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হইবে না। কাব্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ইহার অধিক এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলা সঙ্গত মনে হয় না।

পরশুরাম পরাজয় প্রক্ষিপ্ত।

৭৪ম ও ৭৫ম সর্গে রাম ও পরশুরাম সংবাদ। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের প্রভাব অধিক প্রমাণ করিবার জন্য এক সম্প্রদায় কর্তৃক এক সময় রামায়ণে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের গল্পের ন্যায় রাম-পরশুরামেরও এই প্রতিযোগিতার কথা প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই অনুমান যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা মনে হয় না। ভারতবর্ষ

৪৪ আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৩। ২ ; গার্গ্যনারায়ণ কৃত আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র-বৃত্তি ৭। ২ ঋকবেদের ১। ১৩ সূক্ত বসিষ্ঠাদি গোত্রের আপ্রিসূক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ঐঃ ব্রাঃ ২। ৬। ৪) এই আপ্রি হইতেই আশ্বলায়ন প্রাচীন বসিষ্ঠ গোত্রের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিরোধেরই দেশ। দেশে যখন শৈব ও বৈষ্ণব প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন এই উভয় ভক্ত দলের মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সর্গগুলিতে সেই যুগ প্রভাবের চিহ্ন—রুদ্র-বিষ্ণুর বিরোধের বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সর্গ গুলিতে এইরূপ আরও অনেক পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা আছে।

৭৭ম সর্গে বালকাণ্ড শেষ হইয়াছে। এই সর্গের প্রথম ভাগ এবং শেষ ভাগ প্রক্ষিপ্ত।

ইহার পর অযোধ্যাকাণ্ড। এইরূপে আলোচনা করিতে গেলে প্রক্ষিপ্ত আলোচনার প্রসঙ্গেই একখানা বিরাট গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। তাই আমরা আপাততঃ এই স্থানেই প্রক্ষিপ্ত বিষয়ক এই ধারা বাহিক আলোচনা শেষ করিলাম।

অন্যান্য কাণ্ডের কথা।

রামায়ণের প্রতিকাণ্ডেই এইরূপ পরবর্ত্তী যুগের চিন্তা প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতঃপর খুব বিশেষ আপত্তি জনক ২।১টী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা গেল।

অযোধ্যাকাণ্ডেও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা আছে, তন্মধ্যে মাত্র দুইটী অধ্যায়ের উল্লেখ করা গেল।

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ম ও ১০৯ম সর্গে বর্ণিত রাম-জাবালি সংবাদ প্রক্ষিপ্ত। এই প্রসঙ্গে যে যুক্তিবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা রামায়ণী

জাবালির নাস্তিক্যবাদ প্রক্ষিপ্ত।

যুগের যুগধর্ম্ম নহে। ইহাতে যুক্তির অবতারণা দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্দা করা হইয়াছে। এক স্থানে "তথাগতের" নামটীরও স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। 'তথাগত' বলিতে বুদ্ধদেবকে নির্দ্দেশ করা হয়। রামায়ণের যুগ, যুক্তির যুগ নহে—তাহা আমরা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি। এই

যুগ যুক্তি-যুগ হইলে, রাম বনবাসের ন্যায় নিদারুণ ঘটনাতেই জাবালির মুখে অথবা অন্য কোন স্পষ্টবাদী বক্তার মুখে এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিতে পাওয়া যাইত। এই দুইটী সর্গকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে রামায়ণের কোন ক্ষতি হইবে না। বুদ্ধকে রামের মুখে নিন্দিত করিবার জন্য কোন বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী দ্বারা এই অধ্যায় দুইটী রচিত হইয়াছিল।

এই কাণ্ডের অন্যান্য সর্গের ভিতরও বহু প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও শব্দ প্রবেশ করাইবার চেষ্টার স্পষ্ট আভাস আছে। যথা—

দ্যুমৎসেন সুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্।
সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্ত্তিনীম্॥ ৬।২।৩০

সাবিত্রী-সত্যবান্ সম্পর্কীয় এই শ্লোকটী মহাভারতের শ্লোক; এখানে অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের—

তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্।
আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৮।৪।৪২

অর্থ—পুরুষোত্তম (কৃষ্ণ) সেই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আনিয়াছিলেন।

এই ভাব যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কাণ্ডের আরও অনেক বিষয়কে অনেকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন।

সুন্দরকাণ্ডেও বহু সন্দেহ জনক রচনা আছে।

লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণনায় পরবর্ত্তী রচনার অবধিই নাই। উত্তরকাণ্ডকার তাহার বর্ণিত রম্ভা ধর্ষণের গল্পটীও এই কাণ্ডে প্রবেশ করাইতে ত্রুটী করেন নাই। (লঃ ১৩)

এই কাণ্ডের শেষ অধ্যায়গুলি প্রায় সকলই রামায়ণের সংগ্রাহকের রচনা।

বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সমাবেশে আদি কবির বর্ণনায় যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখ করা গেল। হনুমানের লাঙ্গুলের (?) অগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইবার বর্ণনা সুন্দরকাণ্ডে আছে। হনুমানের এই লঙ্কা দগ্ধের বিবরণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে অগ্নি দগ্ধের পরে লঙ্কাকাণ্ডে বর্ণিত স্বর্ণ-লঙ্কার সম্পদ-বর্ণনা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে, এবং তার্কিকের কুতর্কের উপাদান আবিষ্কৃত হয়। এইরূপ অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বলিতেছেন—স্বর্ণ ধাতুটা যে অগ্নি সংস্পর্শে গলিয়া রূপান্তরিত হইতে পারে, প্রাচীন ভারতের কবির সে জ্ঞান ছিল না, লঙ্কাকাণ্ডের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনায় সে জ্ঞানের পরিচয় মাত্রই নাই। অথবা তখন হয়ত এমন জিনিসকেই ভারতীয়েরা স্বর্ণ বলিতেন, যাহা অগ্নি সংস্পর্শেও অবিচলিত থাকিত···ইত্যাদি।

এইরূপ গুরুতর ত্রুটী শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় থাকিতে পারে না।

আমরা মোটামুটি ভাবেই এস্থলে প্রক্ষিপ্ত রচনার আলোচনা করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয় আলোচনার মধ্যেও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনার আলোচনা যে করা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; এখানে আর দুই একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ব কথারই সমর্থন করা গেল মাত্র।

উত্তরকাণ্ডটী যে বাল্মীকির রচিত নহে, তাহা উত্তরকাণ্ডের ৪৮শ সর্গটী পাঠ করিলেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যাইবে। শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে গিয়া রামায়ণ গান শুনিয়া আসিয়াছিলেন। রামায়ণ পূর্ব্বে রচিত না হইলে তিনি উহা শুনিতে পারেন কি প্রকারে? এই একটী কথাকেই উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততার পক্ষে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উত্তরকাণ্ডের কথা।

দ্বিতীয়তঃ—উত্তরকাণ্ডের বর্ণনার সহিত বহু বিষয়েই মূল রামায়ণের

বর্ণনার ঐক্য নাই—অহল্যা-উদ্ধার প্রভৃতির গল্প তাহার প্রমাণ। ইহাও উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা আলোচনায় সময় লক্ষ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

তৃতীয়তঃ—মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত রামায়ণ-কথায়ও উত্তরকাণ্ডের বর্ণিত বিষয়ের কোন আভাস নাই। যাঁহারা রামায়ণকে মহাভারতের পূর্ব্বের রচনা বলিয়া মনে করিতে দ্বিধা বোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এটী বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। তাঁহারা এ বিষয়ের আলোচনায় নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন, মহাভারতে রামায়ণের গল্প গৃহীত হইবার পরে উত্তরকাণ্ডটী রামায়ণে যুক্ত হইয়াছিল।

উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত হইলেও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। ইহা যে যুগের রচনা, সেই যুগেরই যুগধর্ম্ম যে ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে—ইহা বলাই বাহুল্য।

একাদশ অধ্যায়।

প্রক্ষিপ্ততায় ক্ষতি কি ?

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পরবর্ত্তী ভাব প্রবেশ করিলে প্রাচীন গ্রন্থের মর্য্যাদা কি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, এই স্থলে তাহার আর একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি দ্বারা এবং রামায়ণ, মহাভারত, গুলিস্তান, ওডেসি, ইলিয়ড প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-মহাকাব্যগুলি দ্বারা সেই সেই সমাজের সম-সাময়িক আচার ব্যবহার ও সমাজ ধর্ম্মের প্রকৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; সেই সেই সমাজের রুচির এবং নীতিরও পরিমাণ করা যাইতে পারে; দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের গতিও লক্ষ্য করা যাইতে পারে; এক কথায় বলিতে গেলে—দেশ ও সমাজের সমগ্র ইতিহাস দেশের একখানা সুলিখিত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বা কাব্য-গ্রন্থ হইতে আহরণ করা যাইতে পারে। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে যে রামায়ণের সমাজের পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহাও কেবল মাত্র মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত গীতিকাব্য রামায়ণের সাহায্যেই করিয়াছি।

এরূপ স্থলে এই সকল প্রাচীন রচনায় যদি পরবর্ত্তীকালের চিন্তা ও চিত্র প্রবেশ করিতে সুবিধা পায়, তবে যে তাহা মূল গ্রন্থের রচয়িতার সমসাময়িক সমাজের চিত্র ও চিন্তা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

যদিও দুগ্ধে গোচনা সংস্পর্শের ন্যায় এইরূপ অতি সামান্য কথার

সংশ্রব দোষে সুপ্রাচীন গ্রন্থ স্বীয় প্রাচীনতার গৌরব হারাইয়া অর্ব্বাচীন ও মূল্যহীন হইয়া যায় না, তথাপি নিন্দুক ও ছিদ্রান্বেষীদিগের বিচারে তাহা সন্দেহ-জনক প্রতিপন্ন হয় এবং তাহাদের ঐরূপ সন্দেহের ফলে অনেক কুতর্কের সুযোগ সম্মিলিত হয়। দুই একটা কুতর্কের দৃষ্টান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে ; এস্থলে এইরূপ আরো কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করা গেল।

জাবালির উক্তির ফল।

রামায়ণের বর্ত্তমান সংস্করণ গুলিতে জাবালি কথিত নাস্তিক বাদটী যে বৌদ্ধযুগের অবসানে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে, কোন বুদ্ধদ্বেষী সম্প্রদায় দ্বারা বুদ্ধের মতকে নিন্দা করিবার জন্য প্রবেশ করান হইয়াছিল, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। (১২০ পৃষ্ঠা)

জাবালির মুখে এই নাস্তিক্য চিন্তা ও বুদ্ধ-বিদ্বেষ রামায়ণের অঙ্গে বিন্যস্ত থাকায় অনেকে মনে করিয়া থাকেন, রামায়ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বুদ্ধকে এবং তাঁহার ধর্ম্মকে নিন্দা করিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল। এইরূপ মত যাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ঐতিহাসিক হুইলার সাহেব তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধের নাম বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের উল্লেখ যদিও রামায়ণের আর কোন স্থলেই নাই, তথাপি হুইলারের সন্দেহাত্মক লেখনী সরল পন্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। হুইলার ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন—"Valmiki the author of Ramayana appears to have flourished in the age of Brahmanical revival, and the main object of his poem is to blaken the character of the Buddhists & to represent Rama as an incurnation of Vishnu"[১]

এরূপ স্থলে হয় আমাদিগকে এই কলুষিত মত স্বীকার করিয়া লইতে

[১] Wheeler's Ramayana—Introduction.

হইবে, নতুবা ঐ অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিয়া বিচার করিতে হইবে।

অবতার কথার ফল।

রামায়ণের স্থানে স্থানে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা প্রক্ষিপ্ত আছে দেখিয়া ভারত-গৌরব ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পর্য্যন্ত এই হুইলারি মতে সায় দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

রামায়ণ নাকি অশ্লীল গ্রন্থ।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের (অর্থাৎ কাশী সংস্করণের) একখানা সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া বেনারেস কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিথ সাহেব (R. T. H. Griffith) রামায়ণের এক ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। গ্রিফিথ সাহেব যে মূল রামায়ণ খানা আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ মূল আদর্শে নাকি এমন কয়েকটী অশ্লীল কবিতা ছিল, যাহার ভাব অনুবাদ করিতেও গ্রিফিথ লজ্জা বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্রিফিতের এসম্বন্ধীয় মন্তব্য উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টান পাদরীরা রামায়ণকে একখানা "কুরুচি-পূর্ণ অশ্লীল-কাব্য" বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। C. T. Societyর প্রচারিত রামায়ণ কথার মুখবন্ধে প্রচারক গ্রিফিথের পরিত্যক্ত স্থানের উল্লেখে লিখিয়াছেন——"Some seetions of the poem are so indecent that Grifith could not translate them in English."

গ্রিফিথ ঐ সমস্ত স্থানের ইংরেজী অনুবাদ প্রদান করিতে লজ্জা বোধ করিয়া ল্যাটিন অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্ত ঐ সকল স্থানের ইংরেজী অনুবাদই দিয়াছেন।[২] কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বঙ্গদেশে যে সকল সংস্করণ প্রচলিত

[২] M. N, Datta,s Ramayana P, 988.

আছে, এবং আমরা তাহার যে কতগুলি দেখিয়াছি, কোন খানিতেই আমরা গ্রিফিথ সাহেবের পরিত্যক্ত অংশের অস্তিত্বের আভাস প্রাপ্ত হই নাই। গ্রিফিথ সাহেব ও মন্মথ বাবু এই উভয়ে যে একই অমূলক চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, অথবা পরবর্ত্তী বাঙ্গালী অনুবাদক স্বীয় কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যে পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজ অনুবাদকের অন্ধ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাও আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

রামায়ণের কবি বাল্মীকির রুচি অত্যন্ত সংযত। আমরা তাঁহার রচনার কুত্রাপিও অশ্লীলতার চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাই না। এমন অবস্থায় এই অশ্লীল ভাবগুলি নিতান্তই যদি কোন রামায়ণে থাকে, তবে তাহা যে পরবর্ত্তী যুগের প্রাদেশিক চিন্তার ফল, তাহা মনে করা ব্যতীত অন্য উপায় দেখি না।

প্রাদেশিক চিন্তার ফলে প্রাদেশিক সংস্করণ গুলিতে যে কি পর্য্যন্ত আধুনিক ভাব প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, ডোনাল্ড মেকেঞ্জির রামায়ণ কথা তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। Donald A. Mackenzie প্রণীত "Indian Myth & Legend" গ্রন্থে, গ্রন্থকার তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের জন্য হিন্দুর বিবিধ কাব্য-সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থের গল্পকথা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থ হইতে রামের বাল্য জীবনের একটী অধ্যায়ের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক, বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন—এই বিলাতী রামায়ণী কথা মোটেই আর্ষ রামায়ণ হইতে গৃহীত হয় নাই।

মেকেঞ্জী অঙ্কিত রামের বাল্য জীবন।

রামের বাল্য-লীলা বর্ণনা করিতে যাইয়া লেখা হইয়াছে—"One evening a full moon rose in all its splendour & Rama stretched out his hands because he desired

to have it for a toy. His mother brought him jewels, but he threw them from him & wailed & wept until his eyes were red & swollen. Many of the women assembled round the cradle in deep concern. One said that the child was hungry, but he refused to drink, another that the Sasti was unpropitious and offerings were at once made to that goddess; still Rama wept. A third woman declaired that a ghost haunted & terrified the child & mantras were chanted......the moharaja was called but Rama heeded him not. In this dispair Dasaratha sent for his chief councellor who placed Ram's hands a mirror which reflacted the moon. Then the little prince was comforted......"

পাঠক, রামের শৈশব লীলার আভাস পাইলেন; অতঃপর তৎ পরবর্ত্তী কালের দুই একটী কথা শ্রবণ করুন:—

"When the children grew older they began to lisp words & as they were unable to pronounce were asked his name, he answered "Ama......
In their third year the princes had their ears pierced & after that they played with other children. They made clay images & put clay offerings in their mouth, & they broke the images because they would not eat.

Their education begun when they were five years old. Vasistha was the Preceptor; first he worshiped Saraswati goddess of learning & instructed his pupils to make offerings of flowers & fruits. They received instruction daily begining with alphabets."[৩]

এই বিস্তৃত অংশের সংক্ষিপ্ত ভাব এই যে—শিশুকালে একদিন রাম আকাশের পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া অনবরত কাঁদিতে থাকেন। রাণী তাহাকে কত কিছু দিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না; রাম চাহেন্ আকাশের চাঁদ। তখন রামের অবস্থা দেখিয়া সমবেত নারীগণের কেহ বলিলেন, তাহার ক্ষুধা পাইয়াছে; কেহ বলিলেন, ষষ্ঠী দেবীর কোপ তাহার উপর পড়িয়াছে; কেহ বলিলেন, ছেলেকে ভূতে পাইয়াছে। যে যেমন বলিলেন, তেমনি সব প্রতিকার তখন তখন করা হইল। খাদ্য আনীত হইল; ষোড়শোপচারে ষষ্ঠী দেবীর পূজা প্রদত্ত .হইল; ভূতের উঝা আসিয়া ঝাড়া-ফুকা করিল; কিন্তু কিছুতেই রামের কান্নার নিবৃত্তি হইল না। তখন স্বয়ং রাজা আসিলেন; রাজমন্ত্রীরাও আসিলেন! পরামর্শ চলিল। ইত্যবসরে এক মন্ত্রী বুদ্ধি করিয়া একখানা দর্পণ আনিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিতেই সে চাঁদ হাতে পাইয়াছে মনে করিয়া আব্দার পরিত্যাগ করিল।···

বালকেরা বয়োবৃদ্ধির সহিত মাকে আ-ম্-মা ··· ইত্যাদি বলিতে শিখিল। তৃতীয় বর্ষে তাহাদের কর্ণভেদ হইল। তারপর তাহারা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার সম্মুখে বালির নৈবেদ্য দিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যখন দেখিল, মাটির পুতুল নৈবেদ্য খায় না, তখন তাহারা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ··· ··· ··· ···

৩ Indian Myth & Legend P. 378.

পাঁচ বৎসরে তাহাদের বিদ্যারম্ভ হইল। কুলগুরু বসিষ্ঠ বিদ্যার দেবতা সরস্বতীর পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি ও ফল উপকরণ দ্বারা ছেলেদের বিদ্যারম্ভ করাইলেন। তাহারা প্রতিদিন বর্ণমালা শিখিতে আরম্ভ করিল···ইত্যাদি।

মেকেঞ্জি ভারতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের উপর প্রচুর শ্রদ্ধাবান; তাঁহার শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিলে হৃদয় উৎফুল্ল হয়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে তিনি বাল্মীকির রামায়ণ বলিয়া যে রামায়ণের রামলীলা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা মোটেই মহাকবি বাল্মীকির রচিত রামায়ণের নায়ক রামের কথা নহে। তাঁহার বিবরণ তুলসীদাস ও ভগবতদাসের রামায়ণ ও রামলীলা গ্রন্থের সম্মিলিত চিন্তা হইতে গৃহীত। কৃত্তিবাস স্বীয় রামায়ণে যেরূপ বাঙ্গালী জীবনের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তুলসীদাস, ভগবতদাস প্রভৃতিও সেইরূপ প্রাদেশিক সমাজ-জীবনের ভাব ও ছায়া লইয়া স্ব স্ব রামায়ণী কথা রচনা করিয়া গিয়াছেন। হুইলার এবং মেকেঞ্জি উভয়েই সেই প্রাদেশিক রাম লীলার পালাগুলি হইতে গল্প ভাগ লইয়া মূল রামায়ণের বিচার করিয়াছেন।[৪]

আলোচনা।

হুইলার ও মেকেঞ্জি মূল বাল্মীকি রামায়ণের সংস্করণ গুলি দেখিয়া

৪ এস্থলে একথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নহে যে এই মেকেঞ্জি রামায়ণী কথারই গল্পভাগ লইয়া Mac. Millan প্রভৃতি বিলাতের প্রসিদ্ধ স্কুল-পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশকগণ ভারতীয় বালকদিগের জন্য প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকে এইরূপ রামায়ণ কথাই প্রচার করিতেছেন। আমাদের বালকেরা সাহেব-মুখে সেই রামায়ণী কথা পাঠ করিয়া রামায়ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতেছে। এসম্বন্ধে Mac Millan's King Reader for India, No III পুস্তকের "Rama crying for the Moon" দ্রষ্টব্য।

তাহা হইতে গল্প ভাগ চয়ন করিলে যে এইরূপ অন্যবিধ কোন ক্রটী করিতেন না, তাহা নহে; মূল রামায়ণের সংস্করণ গুলিতেও অনুরূপ সাময়িক কল্পনা কালেকালে আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে ; তাঁহারা মূল রামায়ণের সংস্করণ গুলির সাহায্য গ্রহণ করিলেও স্ব স্ব সংস্কার অনুসারেই অপসিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেন।

প্রাচীন ভাবের সহিত নবীন ভাবের সামঞ্জস্য বিধান খুব বেশী চেষ্টা না করিলে হয় না। রামায়ণের সংস্করণ গুলিতে এই চেষ্টার অভাব হেতু অসামঞ্জস্য খুব সহজেই ধরা পড়ে; তাই যাঁহারা ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের বিচার বুদ্ধিতে প্রাচীন ভাবের ও অর্ব্বাচীন ভাবের অসামঞ্জস্য সহজেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইঁহারা উভয়েই প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন ভাবে লিখিত কাব্য-কথার অনুসরণ করায় ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের ও স্বাধীন বিচার বুদ্ধি পরিচালনের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। পরন্তু নিজের অপসিদ্ধান্ত রক্ষাব জন্যই প্রাণপণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠীদেবী, ভৌতিক ব্যাপার, তন্ত্র-মন্ত্র, কর্ণভেদ প্রথা, মূর্ত্তিপূজা, সরস্বতী দেবীকে ফুল-ফল দ্বারা নৈবেদ্য দান, বর্ণমালা শিক্ষা প্রভৃতি যে সকল পরবর্ত্তী সমাজ-চিন্তার উপাদান মেকেঞ্জী রামায়ণী কথার উদ্ধৃত অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল যে বাস্তবিকই অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তার ফল, তাহা হুইলার যেমন স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ মেকেঞ্জিও স্বীকার করিয়াছেন। মেকেঞ্জি এই সকল আধুনিক কল্পনাগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই বলিয়াছেন—বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব লুপ্ত হইয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইলে বৈদিক দেবগণ নিস্তেজ হইয়া পড়েন; তখন পৌরাণিক দেবগণ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব জাগ্রত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব স্ত্রী (দেবী) দিগকে

লইয়া আসিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। রামায়ণ এই সময়ের রচনা।*

হুইলার ও মেকেঞ্জি অনুরূপ উপাদান লইয়া বিচার করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুরূপই হইবে। কালী, দুর্গা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ যে পৌরাণিক দেবতা—কিছুতেই বৈদিক দেবতা নহেন—ইহা পৌরাণিক হিন্দু সমাজের বিশ্বাসের বাহিরের কথা হইলেও ছিদ্রান্বেষী বৈদেশিক লেখকদিগের জ্ঞানের বাহিরে নহে। এই ত্রুটীর জন্য দোষী আমরা। আমাদের নিজ ত্রুটী সংশোধন করিতে বিচার বুদ্ধি ব্যয় করিয়া মাথা ঘামাইতে যাইবে কেন অপরে? তাঁহাদের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে। জগতে সত্য উদ্ঘাটন প্রয়াসী লোকেরও অভাব নাই। সত্য উদ্ঘাটন প্রয়োজনে ঐ সমস্ত মহানুভব ব্যক্তিরা নিজের খাইয়াও বনের মহিষ তাড়াইয়া থাকেন। যাঁহারা সত্য উদ্ঘাটন প্রয়াসী তাঁহারা প্রাচীন স্তরের রচনার সহিত নবীন স্তরের রচনার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াই বিচার করিয়া থাকেন। বিচার প্রণালী তাঁহাদের উদ্দেশ্য মূলক নহে, প্রমাণ মূলক। নিজ ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত বা উদ্দেশ্য প্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা মিথ্যা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া বিষয়ের প্রকৃত

সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা।

* When the influence of the Buddhism declined, the Panthion is found to have been revolutionized and rendered throughly mediterranean in character. The Vedic Gods had in the intervals suffered eclipse; they were subject to the greater personal Gods—Brahma with Vishnu & Siva each of whom had Goddess for wife, (Introduction· P.XL)

অর্থ গোপন করেন না; তাঁহারা প্রকৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের মধ্যেও এরূপ সত্য উদ্‌ঘাটন প্রয়াসী লোকের অভাব নাই। এ স্থলে সেইরূপ পণ্ডিত লোকের মতও আলোচনা করা গেল।

বিলাতের "Westminister Review" পত্রে রামায়ণের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি লিখিয়াছেন—"The Poem has evidently undergone considerable alteration since the time of the 1st composition, but still underneath all the subsequent additions the original eliments are preserved & careful criticism might perhaps separate the interpolation and present the genuine parts of a whole by themselves. The task however would be difficult and perhaps as impracticable as it had proved in the homeric poems."

ভাবার্থ—রামায়ণের আদি রচনার ভিতর যুগে যুগে বহু পরবর্ত্তী সাময়িক চিন্তা ও ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিশেষ যত্নের সহিত তাহা বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিলে—তবে কবির প্রাচীন মৌলিক সম্পদ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ পরীক্ষার ব্যাপার অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য এবং প্রায় অসম্ভব। ঠিক হোমারের রচনা উদ্ধারের ন্যায় অসম্ভব।

হোমারের ইলিয়ড্-ওডেসিও যে রামায়ণ মহাভারতের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। (৭৩ পৃষ্ঠা)

Westminister Reviewর লেখক এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। তিনি ইহার

পরেই লিখিয়াছেন—"But when the Pesistratus arose who collected these separate songs & reduced them to their present shape, the genuine & spurious were alike included & no hindoo critic ever appears to have attempted to discriminate between them."

অর্থাৎ—যখন আদি সঙ্গীতগুলি সংগৃহীত এবং গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন সেই অকৃত্রিম গাথার সহিত বহু কৃত্রিম গাথাও প্রস্তুত হইয়া তাহার ভিতর যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই যে একটা অন্যায় কাজ হইয়াছিল, কোন ভারতীয় সমালোচকই ইহার সংস্কার জন্য অনুমাত্রও সচেষ্ট হইলেন না।

গ্রীফিথ সাহেব এই মত সম্পূর্ণই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অবতার-বাদ, জাবালির নাস্তিক্য-বাদ প্রভৃতিকে—"These are manifestly spurions" (স্পষ্ট জাল) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত গেরেসিওরও এই মত। গেরেসিওর মতও গ্রিফিথ তাঁহার রামায়ণের Introductionএ গ্রহণ করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর তাহা উদ্ধৃত হইল না।

সুপণ্ডিত Monier Williams বলেন—* বৌদ্ধ মতের আলোচনা ও রামের অবতার-বাদ প্রভৃতির ন্যায় পরবর্ত্তী চিন্তা এই কাব্যের ভিতর প্রচুর পরিমাণে থাকায় রামায়ণের সময় নিরূপণ চেষ্টা একরূপ অসাধ্য; তবে সহমরণ প্রসঙ্গের (Case of Sati) কোন উল্লেখ না থাকায় এবং দাক্ষিণাত্য জনপদে আর্য্যবসতির চিহ্ন লক্ষিত না হওয়ায় রামায়ণের রচনার কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে মাত্র।

* Indian Wisdom.—Page 312.

এই গ্রন্থকারই তাঁহার অন্য এক গ্রন্থে [৭] বলেন—"The introductory chapters of the First Book giving a summary of the plot & the passages identifying Rama with Vishnu or the supreme Being are in all probability comparatively modern appendages. No suspicion, however of interpolations and variations avail to impare the sacred character of the poem in the eyes of the natives".

অর্থ—রামায়ণে মুখবন্ধ রূপে এবং মোট ঘটনার সংক্ষিপ্ত সার রূপে যে কয়েকটী অধ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং রামকে বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণনার চেষ্টা যে অংশে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের যোজনা হইলেও, এই সকল ভাব দ্বারা (রামায়ণের ঐতিহাসিক ক্ষতি যাহা হইয়াছে, তাহা ব্যতীত) এতদ্দেশীয় পাঠকের মনে রামায়ণের প্রতি ভক্তিভাবের কোন ত্রুটি সাধিত হয় নাই।

ঐতিহাসিকেরা যে ভাবে রচনার বিচার করিয়া থাকেন, সাধারণ পাঠক সে ভাবে বিচার করেন না; ইহা শুধু এ দেশে নহে, সকল দেশের, সকল সমাজেই এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়।

ভারতের পরবর্ত্তী কবিরা যখনই কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কবির প্রাচীন রচনার উপর নূতন ভাব যোজনা করিতে গিয়াছেন, অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা জাতির অথবা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের অনুকূলে এবং রুচির অনুকূলে তাহা করিয়াছেন; সেই জন্য, তাহা অনিষ্টকারী হইলেও—জাল-জুয়াচুরি হইলেও [৮] সমাজের প্রতিবাদের বিষয় হয় নাই। সমাজ এইরূপ

[৭] Indian Epic Poetry. Pages 3 & 4.

[৮] ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ততার অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বেণ্টলি লিখিয়াছেন—সাহিত্যের জালিয়তি ভারতে এত অধিক প্রচলিত ছিল যে, কোন্

কার্য্যকে দোষণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই। সমাজ সাময়িক উদ্দেশ্য লইয়াই বিচার করিয়াছে।

কৃত্রিম উপায়ে উদ্দেশ্য লাভের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা উচ্চ উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হয় না, বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে অধিক। রামায়ণে পরবর্ত্তীকালে যে সকল সাময়িক ভাব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা, সমাজ বা সম্প্রদায় সাময়িক ভাবে উপকৃত হইলেও রামায়ণের প্রাচীনত্বের গৌরব সাধারণ শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত বিষয় সমূহও জগতের সম্মুখে হেয় এবং অর্ব্বাচীন বলিয়া শ্রদ্ধা হারাইতে বসিয়াছে।

রামায়ণের প্রাচীন রচনার ভাব পরিবর্ত্তন ও প্রাচীন রচনার মধ্যে নূতন রচনার সমাবেশ যাহারা করিয়াছেন, নিন্দুকের নিকট এবং সাধারণ পাঠকের নিকট রামায়ণের গৌরব তাহারাই হ্রাস করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক বা ছিদ্রান্বেষী সমালোচকের অপরাধ তাহাদের তুলনায় সামান্য। অকৃত্রিমতা গৌরবের এবং সম্মানের নিদান; কৃত্রিমতা তাহার বিরোধী।

কিন্তু যাঁহারা রামায়ণের রচনার ভিতর সন্দেহ জনক অর্ব্বাচীন ভাব দেখেন, তাঁহারা যদি একটু শ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ঐ ভাবের উপর লক্ষ্য করেন, সেই প্রাচীন সম্পদের প্রাচীনতার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা রাখিয়া বিচার করেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন—প্রাচীন রচনা ও অর্ব্বাচীন রচনা একই পংক্তিতে পাশাপাশি থাকিয়াও তাহাদের

প্রক্ষিপ্ত রচনা সহজে ধরা পড়িবার কারণ।

গ্রন্থ কৃত্রিম কোন্ গ্রন্থ অকৃত্রিম, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ভারতে এমন কোন বিধান নাই, যাহা ঐ জালকারীদিগকে জানাইয়া দেয় যে এইরূপ চেষ্টা (Interpolation) নিতান্ত অন্যায়।

সূক্ষ্মদৃষ্টির নিকট আত্ম পরিচয় গোপন রাখিতে পারিবে না। অভিজ্ঞ ডিটেকটীভের নিকট চোর ও সাধুর যে পার্থক্য দৃষ্ট হইবে, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের নিকট অকৃত্রিম ও জাল রচনার তেমনি পার্থক্য ধরা পড়িবে। জর্ম্মণ অধ্যাপক জর্জ্জ বুলার এইরূপ রচনার বিচার করিতে যাইয়া তাঁহার অনূদিত গৌতম ধর্ম্ম-সূত্রের অবতরণিকায় বলিয়াছেন—"I do not think that the interpolation and alteration can have effected the general character of the book very much."[৯]

এই উক্তি শ্রদ্ধাবান এবং দূরদর্শী সমালোচকের উক্তি। ডাঃ বুলার তেমনই শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার এই উক্তির কারণ প্রদর্শন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"It is too methodically planned & too carefully arranged to admit of any great changes."[১০]

অর্থাৎ যেমন যত্ন, চেষ্টা ও কৌশল প্রয়োগ প্রাচীন ও নূতন ভাবের অভিন্নতা প্রদর্শনে প্রয়োজন, তেমন যত্ন চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া এই সকল পরিবর্ত্তন করা হয় না—সুতরাং এইরূপ চিন্তা-হীনতার পরিচায়ক যে পরিবর্ত্তন ও সংযোজন, তাহা সহজেই ধরা পড়ে; তাহা দ্বারা মূলের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে না।

অধ্যাপক বুলার শ্রদ্ধাবান, দূরদর্শী ও বিশেষজ্ঞের পক্ষের কথাই বিচার করিয়াছেন; নিন্দুক, ছিদ্রান্বেষী বা সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধে বিচার করিয়া এরূপ কথা বলেন নাই।

রামায়ণে প্রাচীন রচনার ভিতর প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করাইতে

[৯] Introduction of Goutama Dharma Sutra. Page Lix.
[১০] Ibid.

এরূপ যত্ন, চেষ্টা ও কৌশল মোটেই অবলম্বিত হয় নাই; তাহার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আমরা যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি, এই গ্রন্থের অন্যান্য স্থলেও তাহা সেইরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বাস্তবিক পক্ষে সূক্ষ্মদর্শী পাঠক অর্থাৎ এইরূপ বিচার বিবেচনা করিয়া গ্রহণ ও ত্যাগ করিবার মত ক্ষমতাশালী পাঠক অপেক্ষা, এই সকল গ্রন্থের সাধারণ পাঠকই অধিক; সুতরাং সাধারণের নিকট রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত রচনাগুলি সেই প্রাচীন পুস্তকের গৌরবের পক্ষে যথেষ্ট হানিজনক হইয়া রহিয়াছে এবং তাহাই এখন রামায়ণকে অর্ব্বাচীন বলিয়া ছিদ্রান্বেষীদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রামায়ণ-কথার প্রচার।

প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে রামায়ণ-কথার উল্লেখ বা প্রচার প্রথম মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বের ২৭৩ হইতে ২৯০ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই আঠারটী অধ্যায়ে রামায়ণের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে রামের জন্ম হইতে—বনবাস কালের পর রামের সিংহাসন আরোহণ পর্য্যন্ত—ঘটনাবলী আছে। ইহাতেও উত্তরকাণ্ডের কোন কথা নাই।

মহাভারতে রামায়ণ-কথা।

মহাভারতে রামায়ণ-কথাকে পুরাণ ইতিহাস বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। যথা—

"শৃণু রাজন্ যথা বৃত্ত মিতিহাসং পুরাতনম্"। ৩। ২৭৩। ৬

এই প্রাচীন গীত যে প্রাচীন কবি বাল্মীকির রচিত, তাহারও উল্লেখ মহাভারতকার দ্রোণপর্ব্বে করিয়াছেন। যথা—

"অপিচায়ং পুরাগীতঃ শ্লোকো বাল্মীকিনা ভুবি।"

মহাভারতের পর যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের নাম করা যাইতে পারে। যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে বসিষ্ঠ ঋষি রামকে আত্মজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহা বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, নির্ব্বাণ প্রকরণ—প্রভৃতি ছয়টী প্রকরণে বিভক্ত। ধর্ম্ম উপদেশ ছলে বহু উপাখ্যানও এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে; এই সঙ্গে ইক্ষ্বাকু-মনু সংবাদও

যুগবাসিষ্ঠে রামায়ণ-কথা।

প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থখানা রামায়ণ নহে; রাম সম্পর্কিত ধর্ম্মদর্শন গ্রন্থ। ইহার রচনকালও মূল রামায়ণের অনেক পরবর্ত্তী।

এই স্থলে বৌদ্ধ সাহিত্যের কয়েকখানা গ্রন্থের আলোচনা করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অনেক গ্রন্থে রামায়ণের কথার আভাস আছে; তন্মধ্যে "লঙ্কাবতার সূত্র", "দশরথ জাতক", "মহাবিভাষা" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। লঙ্কাবতার সূত্রে রামের কোন কথাই নাই। না থাকিলেও রামের সমসাময়িক বীর, লঙ্কাধিপতি রাবণের কথা আছে। রাবণ বৌদ্ধ সাহিত্যে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছেন, তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে, প্রয়োজন হেতু, এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল।

বৌদ্ধ সাহিত্য—
লঙ্কাবতার সূত্র।

'লঙ্কাবতার সূত্রে' রাবণকে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণও লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের একটী প্রবন্ধ হইতে লঙ্কাবতার সূত্রের বিবরণ গৃহীত হইল।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ লঙ্কানগরীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী মলয় শিখরে বিহার করিতেছিলেন; লঙ্কাধিপ রাবণ ভগবানের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অহ্লাদের সহিত তাঁহাকে লঙ্কার অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে আসিলেন।

রাবণ শুক ও সারণ নামক অমাত্যদ্বয় ও নিজ পরিবার সহ পুষ্পক রথে বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া লঙ্কায় লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রাবণ বলিলেন—"এই লঙ্কাপুরী দিব্যবত্নে ভূষিত; ইন্দ্র-নীলমণি দ্বারা উদ্ভাসিত। আমরা যক্ষ-রক্ষোগণ এখানে বাস করিতেছি।

কুম্ভকর্ণ প্রমুখ রাক্ষসগণ মহাযান ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। অতএব, হে মুনি, আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জিন-পুত্রগণের সহিত আগমন করুন। আমি বুদ্ধগণের ও জিন-পুত্রগণের আজ্ঞাকারী। ...”

বুদ্ধদেব রাবণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জিন-পুত্রগণ সহ লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ভগবান জিন-পুত্রগণ সহ পূজা গ্রহণ করিয়া “প্রত্যাত্মগতিগোচর ধর্ম্ম” ব্যাখ্যা করিলেন।

দশানন বুদ্ধের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘের আশ্রয় লইলেন।

রাবণ বুদ্ধের নিকট ১০৮টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বুদ্ধ সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ই ছিল।

বৌদ্ধগণ এই গ্রন্থকে পরম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভগবান বুদ্ধ রাবণকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই ‘লঙ্কাবতার সূত্র’ বিরচিত হইয়াছিল।

এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৪৪৩, ৫১৩ ও ৭০৪ অব্দে চীন ভাষায় পুনঃ পুনঃ অনুদিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের মত শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে আলোচনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে উল্লেখ করিয়াছেন।

এই লঙ্কাবতারসূত্রের আলোচনায় এমন ধারণাও যদি পাঠকের মনে জন্মিয়া থাকে যে, বৌদ্ধযুগের ভারতীয় জনগণও ভারত মহাসাগরের বক্ষস্থিত লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে যে একজন নরপতি ছিলেন, তাঁহার কথা জানিত, বা শুনিয়াছিল, তবেই এস্থলে এই পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলনের চেষ্টা সার্থক হইল, মনে করিব।

"দশরথ-জাতক" রামায়ণ সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ। জাতকগুলি বুদ্ধের মুখে প্রকাশিত—তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিয়া প্রচারিত। বুদ্ধ যে পূর্ব্ব জন্মে দশরথের পুত্র রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দশরথজাতকের গল্পটী দ্বারা তাহা তিনি বিবৃত করিয়াছেন। রামায়ণের গল্পের সহিত এই জাতকের গল্পের অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। গল্পটী নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

দশরথজাতক

বারাণসীর রাজা দশরথের ষোল সহস্র পত্নী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি রাজমহিষী ছিলেন, তাঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা। তাহাদের নাম ছিল যথাক্রমে—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা। জ্যেষ্ঠ রাম সুপণ্ডিত ছিলেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে রামপণ্ডিত বলিত।

হঠাৎ একদিন রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী পুত্রকন্যাদিগকে মাতৃহীন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন; রাজা দুঃখিত অন্তরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া অন্য এক রাণীকে মহিষী মনোনীত করিলেন।

নূতন মহিষী রাজাকে খুব বাধ্য করিলেন। রাজা তাঁহার আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, রাণী বলিলেন—"যদি আমাকে ভালইবাস, বেশ; আমার বর আমার প্রয়োজন মত চাহিয়া লইব; তখন অস্বীকার করিবে না তো?"

রাজা বলিলেন—"সে কি হয়? নিশ্চয় দিব।"

কিছু দিন পরে এই মহিষীর পুত্র ভরত একটু বড় হইলে, রাণী রাজার নিকট তাঁহার অঙ্গীকৃত বরটী চাহিলেন।

রাণী বলিলেন—"তুমি যদি আমাকে ভালইবাস, আমার ছেলে ভরতকে রাজা করিয়া দাও।"

রাজা দশরথ শুনিয়া ভায়ানক রাগ করিলেন। কিছুতেই এরূপ বর দেওয়া যাইতে পারে না। আমার উপযুক্ত পুত্র রামপণ্ডিত বর্ত্তমান থাকিতে আমি অন্য কাহাকেও রাজা করিতে পারিব না। রাজার মনের অবস্থা বুঝিয়া রাণী সে যাত্রা নীরব হইয়া রহিলেন। কিছু দিন এইরূপে চলিল।

আর একদিন যথনই রাজা রাণীর সহিত ভালবাসা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, অবস্থা বুঝিয়া রাণী তাঁহার বরটী পুনরায় প্রার্থনা করিলেন। রাজা এবার কিছুই বলিলেন না; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিলেন—"বিমাতার সংসার, উপায় কি?"

রাজা দৈবজ্ঞ দ্বারা গণনা করাইয়া জানিলেন, তাঁহার পরমায়ু আর মাত্র বার বৎসর। তিনি বিমাতার চক্রান্ত হইতে ছেলে দুইটীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে এবং এই বার বৎসর পরে আসিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতে উপদেশ দিলেন।

পিতৃ উপদেশে রাম লক্ষ্মণ বনে চলিলেন। ভ্রাতাদিগকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভগ্নী সীতাও কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। অবশেষে তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুগমন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ পুত্রশোকে কিছু কাল পরেই মরিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাণী বলিলেন—"এখন আমার পুত্রই রাজা।"

পাত্র মিত্রগণ বলিলেন—"তাহা কেমন করিয়া হয়? জ্যেষ্ঠাধিকারী বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠের সিংহাসনে অধিকার হইতে পারে না।

ভরত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বলিলেন—"তাহাই হইবে, দাদাকেই খুঁজিয়া আনিতে হইবে।

ভরত পৌরজন লইয়া জ্যেষ্ঠ রামপণ্ডিতকে আনয়ন করিতে বনে

গেলেন। রাম আসিলেন না; তিনি বলিলেন, পিতৃ আদেশ—দ্বাদশবর্ষ পরে রাজধানীতে যাইতে; এখনও যে তাহার তিন বৎসর বাকী। তুমি লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া যাও; আমি পিতৃ আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিব না।

ভরত বলিলেন—"আমরা তবে কাহার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিব?

রাম বলিলেন "কেন? তোমার।"

ভরত স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম স্বীয় পাতুকা যুগল দেখাইয়া বলিলেন—"আমার এই পাতুকাদ্বয় লইয়া যাও।"

ভরত—লক্ষ্মণ, সীতা ও পাতুকাদ্বয় সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসিংহাসনে রামের পাতুকা স্থাপন করিয়া সেই পাতুকার ইঙ্গিতে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন বৎসর পরে রাম কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া সহোদরা ভগ্নী সীতাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এইরূপে রাম ষোল হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।"

বুদ্ধদেব গল্পটী শেষ করিয়া বলিলেন—"এই রামই আমি, দশরথ আমার পিতা শুদ্ধোধন, সীতা আমার পত্নী গোপা, আর ভরত আমার শিষ্য আনন্দ।"

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক যুগে রামায়ণ-কথা কিরূপ ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা দশরথজাতক পাঠ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। জাতকগুলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরে রচিত হইয়াছিল। মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে—যে আকারেই হউক—বৌদ্ধযুগে ঐ সময়ের লোক রামায়ণের ঘটনা জানিতেন।

এই জাতকটী দ্বারা আর একটী ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে

এই যে, শাক্যদিগের মধ্যে সহোদরা বিবাহ অভিনব ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত না।[১]

সীতা হরণের কথা এই জাতকে নাই; থাকিলে বোধহয় "লঙ্কাবতার সূত্রের" বিবরণ পণ্ড হইয়া যায়।

অযোধ্যার নামও এই জাতকে নাই; তখন বারাণসী শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিচিত। অযোধ্যা এই যুগ হইতে "সাকেত" নামে পরিচিত।

এই জাতক-কথা বুদ্ধদেবের বাণী বলিয়া কথিত হইলেও তাহা তাঁহার বহু পরবর্ত্তী শিষ্যগণের রচনা; এই কারণেই আমরা কাহাকেও ইহা অবিশ্বাস করিতে বলি না; বিশ্বাস করিতেও বলি না। ইহার দুই একটী বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি মাত্র।

দশরথ জাতকে বুদ্ধের মুখে রাম লক্ষ্মণকে সহোদর বলা হইয়াছে। রামায়ণে এই সম্পর্ক—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। রামায়ণ যদি কাব্যই হয়,

বৌদ্ধ সাহিত্যের দুই একটী কথা।

তবে মহাকবি লক্ষ্মণকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা করিয়া এই কাব্যের কি উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন?

বালকাণ্ডের ১৮শ সর্গটীতে রাম লক্ষ্মণাদির জন্ম বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়টী যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা "রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত রচনা" অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইল। (৯৬ পৃষ্ঠা) এই সর্গের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া বিচার করিলে রামায়ণে পাওয়া যাইবে—লক্ষ্মণ

১ 'মহাবংশ' লঙ্কা বা সিংহলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এই গ্রন্থেও বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহু যে তাঁহার সহোদরা ভগিনী সিবলীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এই ভ্রাতার ঔরসে ও ভগ্নীর গর্ভে বিজয়সিংহের জন্ম। বিজয়ের কনিষ্ঠ সুমিত্র। মহাবংশ ভ্রাতা ভগ্নির এই যৌনসম্বন্ধকে অভিনবত্বে বিশ্লেষিত করে নাই। মহাবংশে লঙ্কা, সিংহল ও তাম্রপর্ণীকে (পালি—তম্বপন্নি) এক দ্বীপ বলা হইয়াছে।

রামের সহোদর ভ্রাতা, এবং কৌশল্যার গর্ভজাত পুত্র বা তনয়।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রাম বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।

তন্তুদেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ। ১৪।৬।১০২

পণ্ডিতেরা এইরূপ উক্তিকে যথার্থ প্রয়োগ মনে না করিয়া উপলক্ষণ বলিয়া মনে করেন কেন?

অন্যত্র—কদা প্রাণী সহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ।[২]

লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ॥ ১৩।২।৪৩

কৌশল্যার এই উক্তিকেই বা অগ্রাহ্য করি কেন?

সীতাও যে রামের সহোদরা ভগিনী এইরূপ তর্ককেই বা কুতর্ক বলিবার হেতু কি?

ঋকবেদে যম ও যমী এই সহোদর ভ্রাতাভগিনীর কথোপকথনে যৌনভাবের আভাস আছে; ইহার পর বৌদ্ধ সাহিত্যের এই উল্লেখ। এই উভয় যুগের মধ্যের অবস্থা—বহু পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্ত কাব্যের উপর নির্ভর না করিয়া—স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে আপত্তি কি?

বৌদ্ধ রামায়ণ।

বৌদ্ধদিগের লিখিত আরো দুইখানা রামায়ণ আছে; একখানা তীর্থপাল প্রণীত; অপরখানি দেবজয় প্রণীত। এগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানকালে খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। শুভপাল নামক এক ব্যক্তি তীর্থপাল রামায়ণের টীকা করিয়াছিলেন।[৮] এগুলি নাকি হিন্দু ধর্ম্মের বিরোধী কথায় পূর্ণ।

২ আত্মজ শব্দ পুত্র অর্থে ব্যবহৃত হইলেও পুত্রকে মাতার আত্মজ বলা যায় না। পুত্র পিতার আত্মজ মাতার গর্ভজাত। কৌশল্যার উক্তিতে আত্মজ শব্দ পুত্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাকে অনেকে আর্ষ প্রয়োগ বলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের কথা আছে—তাহার আলোচনা পরে করিব।

পুরাণে রামায়ণ কথা।

পুরাণগুলির মধ্যে পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, গরুড়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীভাগবত ও বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি 'পুরাণ' গ্রন্থগুলিতে অল্প-বিস্তর রামায়ণ সম্পর্কিত কথা আছে।

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে রামায়ণ কথা আছে। মূল রামায়ণের পশ্চাতে যে উত্তরকাণ্ড যোজিত আছে, তাহাতে রামের সহিত কুশীলবের যুদ্ধ নাই। এই পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে তাহা আছে। কৃত্তিবাস পাতালখণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই লব-কুশের যুদ্ধ লিখিয়া-ছিলেন। পাতালখণ্ডে রাম সম্পর্কিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বাল্মীকির রামায়ণেতো নাই-ই, উত্তরকাণ্ডেও নাই; কৃত্তিবাস পণ্ডিতও তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ণুপুরাণ ১ম ভাগের, ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণের বা শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা আছে। এই পুরাণেও কুশী-লবের কথা আছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে রামোপাখ্যান ও কুশ-বংশের বিবরণ আছে।

গরুড়পুরাণের ১৪৭তম অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণের ১৫৪তম হইতে ১৫৭তম অধ্যায়ে রাম-কথা আছে।

স্কন্দপুরাণের তৃতীয় খণ্ডে রাম চরিত বিবৃত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণের ১৭শ অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ কথা ও ২৩৮তম হইতে ২৪২তম

অধ্যায়ে রামোক্ত নীতি কথিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণের ৮৮তম অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকু বংশের বিবরণ আছে।

মৎস্যপুরাণের ১২শ অধ্যায়ে সূর্য্য-বংশের বিবরণের সহিত রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির নাম আছে। রামের দুর্গা পূজার কথাও এই পুরাণে আছে। এই পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দুর্গাপূজা হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে ও শিবপুরাণের ধর্ম্ম সংহিতা খণ্ডের ৬০—৬২তম অধ্যায়ে সূর্য্য-বংশের কথা আছে।

দেবীভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ২৮শ হইতে ৩০শ এবং ৭ম স্কন্ধের ১ম অধ্যায়ে সূর্য্যবংশ-কথা বিবৃত হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডে ১৮শ অধ্যায় হইতে বিস্তৃতভাবে রামায়ণ কথার আলোচনা হইয়াছে। রামের দুর্গাপূজার বিবরণ এই পুরাণেও আছে এবং এই দুই পুরাণ অনুসারেও বাঙ্গালার কোন কোন অঞ্চলে শারদীয়পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পুরাণের ৩০শ অধ্যায়ে (পূর্ব্বখণ্ড) "বাল্মীকি কর্ত্তৃক ব্যাসের প্রতি মহাভারত রচনার উপদেশ" ও আছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি ব্যতীত দেবীপুরাণ, বৃহৎনন্দিকেশ্বর পুরাণ প্রভৃতির বিধান অনুসারেও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে শারদীয় পূজা হইয়া থাকে।

এই পুরাণগুলি মহাভারত রচয়িতা ব্যাসের নামে পরিচিত। ব্যাসদেবের নামে একখানা রামায়ণও প্রাচারিত আছে, তাহার নাম অধ্যাত্মরামায়ণ। এই অধ্যাত্ম রামায়ণে বাল্মীকি রামায়ণের পুনরাবৃত্তি করা হইলেও অনেক স্থলেই আর্য্য রামায়ণের মত ইহাতে রক্ষিত হয় নাই।

অধ্যাত্ম রমায়ণ-কথা।

যেমন—রামের চৌদ্দ বৎসর বনবাস স্থলে এই পুস্তকে বার বৎসরের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মাণ্ডপুরাণ অন্তর্গত রামায়ণ কথা; সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত এবং ৪০০০ শ্লোকে রচিত। কলির জীবকে রামায়ণ শুনাইবার জন্য ব্যাসদেব এই প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। রাম-কথা ব্যতীত ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির আলোচনার সহিত রাম-গীতা নামেও কয়েকটী সর্গ আছে। ব্যাসদেবকে ইহার রচয়িতা বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইলেও ব্যাস-দেবের মহাভারতে প্রচারিত রামায়ণ কথার সহিত এই রামায়ণ কথার অনেক স্থলেই ঐক্য নাই। কৃত্তিবাস এই অধ্যাত্ম রামায়ণের কথাই, অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা খুব আধুনিক গ্রন্থ।[৩] রত্নাকর দস্যুর কথা এই গ্রন্থেও আছে।

৩ অধ্যাত্ম রামায়ণকে আমরা কেন এত আধুনিক মনে করি, তাহার প্রমাণ আলোচনার স্থান এখানে নাই। তথাপি কথা প্রসঙ্গে একটী মাত্র বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা তাহার সম্বন্ধে দুটীকথা বলিব। ডাক্তার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় "হরিবংশ" গ্রন্থে রোমান মুদ্রা দিনারের উল্লেখ দেখিয়া 'হরিবংশ' কে আধুনিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মেকডোনাল, হুইলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণেরও এই মত। এই মত কত দূর সমীচীন, গ্রন্থান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে। রোমান 'দীনার' (দিনারিস) মুদ্রা এ দেশে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুশর্ম্মা 'পঞ্চতন্ত্রে' তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্র সাময়িক গল্প-গ্রন্থ; প্রচলিত রীতির অনুসরণেই যে তাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার্য্য। ইহার পর ক্রমে সমগ্র হিন্দুস্থানে দীনার মুদ্রা চলিতে থাকে এবং আমেরিকার "তোবেগো" যেমন যুগ-যুগের আত্মীয়তার প্রভাবে আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই 'দীনার' মুদ্রাও সেইরূপ যুগব্যাপি সাহচর্য্যের প্রভাবে হিন্দুর জাতীয় মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলে কোষকার অমরসিংহ "অমর-কোষে" তাহাকে হিন্দুমুদ্রা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ব্যাকরণকারগণ তাহার ধাতু

অধ্যাত্ম রামায়ণের সহিত অগ্নিবেশ্য রামায়ণ, বোধায়ন রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, ভোজরাজ কৃত চম্পুরামায়ণ প্রভৃতি রামায়ণ গুলির নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুস্তকেই রামায়ণ কথা বিবৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণে একটু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের উল্লেখ এস্থলে করা হইল এইজন্য যে, এই ক্ষুদ্র রামায়ণ থানাও বাল্মীকির রচিত বলিয়াই প্রচারিত। ইহার বর্ণিত ঘটনাবলীও উত্তরকাণ্ডের ন্যায়। কবি নাকি উত্তরকাণ্ড লিখিয়াও সীতার মহিমা কীর্ত্তন শেষ করিতে পারেন নাই; তাই পরিশিষ্ট স্বরূপ "অদ্ভুত উত্তরকাণ্ড" নামক এই অদ্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী প্রচার করিয়াছেন।

অন্যান্য রামায়ণ।

অদ্ভুত রামায়ণের কথা।

অর্থ বাহির করিয়া (দীন—ধৃ+ঘঞ+স্বার্থে য়) একেবারে তাহাকে জাতীয় সম্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপে সমগ্র হিন্দুস্থানে যখন "দীনার" হিন্দুমুদ্রা বলিয়া বিশ্বসিত ও পরিচিত হইয়াছিল, সেই সময়ের রচিত ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে দীনার প্রাচীন হিন্দুমুদ্রা বলিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর মুসলমানেরা আসিয়া 'আসরফি' প্রচলন করেন। 'আসরফি' ও "দীনার" যখন হিন্দু-ভারতে প্রতিযোগিতায় চলিতেছিল এবং 'দীনার' যে বৈদেশিক মুদ্রা সে বিশ্বাস রঘুনন্দনের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিরও ছিল না, আমাদের মনে হয়, অধ্যাত্মরামায়ণ সেই সময়ের রচনা। অধ্যাত্মরামায়ণে 'দীনার' শব্দের এইরূপ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে—

"ইতিস্তুত্বা নৃপঃ প্রদাদ্ রাঘবায় মহাত্মনে
দীনারাণাং কোটি শতং রথানাময়ুতংতথা॥ ৭৬।৬।১

রামায়ণের নৃপতি জনক রামকে 'দীনার' দেন নাই, কোটি স্বর্ণখণ্ড (নিষ্ক) দিয়াছিলেন। এখন পাঠক অনুমান করুন—অধ্যাত্মরামায়ণ কত আধুনিক!

অদ্ভূত রামায়ণ সপ্তবিংশতি সর্গে ও ১৩৪১ শ্লোকে রচিত; নিম্নে সংক্ষেপে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের শ্রীমতী নামে পরমাসুন্দরী এক কন্যা ছিল। নারদ ও পর্ব্বত উভয়েই তাহার পাণিপ্রার্থী হন। বিষ্ণুর চক্রে অবশেষে ইঁহারা নিরাশ হন। ইঁহাদের ক্রোধে বিষ্ণুর অধোগতি হয়। বিষ্ণু আসিয়া অযোধ্যায় দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। সীতা জন্ম গ্রহণ করিলেন, মন্দোদরীর গর্ভে। মন্দোদরী সীতাকে কুরুক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিলে কুরুক্ষেত্র-তীর্থক্ষেত্র-কর্ষণ-যজ্ঞ কালে রাজা জনক তাহাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর রাম সীতার বিবাহ হয়।

ইহার পরের ঘটনা অতি সংক্ষেপ।—রাম সীতার বনগমন, সীতা হরণ ও রাবণ বধ। এই পুস্তকের আর একটী বিশেষত্ব এই—সীতা হারাইয়া রাম হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ কালে তাহার নিকট আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যযোগ, উপনিষদ-ধর্ম্ম (যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গীতা ব্যাখ্যার ন্যায়) ইত্যাদি অনেক ধর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতঃপর অদ্ভুত ঘটনা—দশস্কন্ধ রাবণের ভ্রাতা সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের বিবরণ। রাম সীতা বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে একদিন সীতা সকলের সমক্ষে সহস্রস্কন্ধ রাবণের বিবরণ বলেন। তখন রাম সসৈন্যে সেই সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধার্থ পুস্কর যাত্রা করেন। রাম এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সীতা কালিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে বধ করেন ও রামকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন।

এই বিভিন্ন রামায়ণ গ্রন্থগুলি—খুব প্রাচীন নহে। এগুলি খৃষ্টোত্তর যুগে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে, বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে হিন্দু জাতির ধর্ম্মগ্রন্থের ইহাই প্রচার-যুগ। এই সময় রামায়ণের যেমন এইরূপ বিবিধ সংস্করণ হইয়াছিল, সেইরূপ বহু টিকাকারের

সাহায্যে মূল রামায়ণও এই সময় ভারতবর্ষময় প্রচারিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যুগে এক রামায়ণের টীকা গ্রন্থই প্রচারিত হইয়াছিল সাড়ে সাইত্রিশ হাজার। (৭৪ পৃষ্ঠা) এই উক্তির সত্যতা প্রমাণের এখন আর কোন উপায় নাই। কিন্তু রামায়ণ যে ভারতের পল্লীতে পল্লীতে প্রচারিত হইয়াছিল এবং এই গল্প কথা আশ্রয় করিয়া যে সংস্কৃত ভাষার সম্পদ প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কাব্যে রামায়ণ কথা ও রামায়ণের টীকা।

কাব্য যুগে রামায়ণী কথা আশ্রয় করিয়া কবি ভাস "অভিষেক" নাটক, কালিদাস "রঘুবংশ", ভবভূতি "মহাবীর চরিত" ও "উত্তর রামচরিত" লিখিয়াছিলেন। "মহানাটক", "অনর্ঘ রাঘব", "রামরসায়ন" প্রভৃতি আধুনিক কাব্যগ্রন্থগুলিও রামায়ণের গল্প লইয়া রচিত। যে সকল টীকাকার টীকা লিখিয়া রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকটী নাম অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে মাত্র। অতঃপর তাহাও হয়ত থাকিবে না।

এগুলিই এখন সেই সাড়ে সাইত্রিশ হাজার টীকার ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন। 'বিশ্বকোষ' হইতে টীকাগুলির নাম উদ্ধৃত হইল।

(১) ঈশ্বর দীক্ষিত কৃত টীকা।
(২) উমা মহেশ্বর কৃত টীকা।
(৩) কতক টীকা।
(৪) গোবিন্দরাজ কৃত তিলক টীকা।
(৫) চতুরর্থ দীপিকা।
(৬) ত্র্যম্বক কৃত ধর্ম্মকুট।
(৭) দেবরামভট্ট কৃত টীকা।
(৮) নাগেশ রচিত টীকা।

(৯) নৃসিংহ টীকা।

(১০) মহেশ্বর তীর্থ কৃত রামায়ণ তত্ত্ব দীপ।

(১১) রামানন্দ তীর্থ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা।

(১২) রামানুজ কৃত রামায়ণ তিলক ব্যাখ্যা।

(১৩) রামাশ্রমাচার্য্য কৃত টীকা।

(১৪) রামায়ণ বিরোধ পরিহার।

(১৫) রামায়ণ তাৎপর্য্য বিরোধরঞ্জিনী।

(১৬) রামায়ণ সেতু।

(১৭) বরদারাজ কৃত বিবেক তিলক।

(১৮) বাল্মীকি হৃদয় টীকা। (১৯) বিদ্যানাথ কৃত টীকা।

(২০) বিদ্বন্মনোরমা টীকা। (২১) বিমলবোধ টীকা।

(২২) বিশ্বনাথ কৃত বাল্মীকি তাৎপর্য্য তারিণী।

(২৩) শিবরাম সন্ন্যাসী কৃত টীকা।

(২৪) শৃঙ্গার সুধাকর। (২৫) সর্ব্বজ্ঞের টীকা।

(২৬) সুবোধিনী।

(২৭) হয়গ্রীব শাস্ত্রী বিরচিত রামায়ণ সপ্তবিম্ব।

(২৮) হরিপণ্ডিত কৃত রামায়ণী টীকা।

(২৯) লোকনাথের মনোরমা টীকা।

দশ-অবতার কল্পনার যুগে রাম এবং বুদ্ধ, অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। এই সময় এবং তাহার পরে রামকে বিষ্ণুরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রাম সম্পর্কে কতগুলি উপনিষদও প্রচারিত হইয়াছিল। উপনিষদগুলির মধ্যে "রামোপনিষৎ", "শ্রীরাম পূর্ব্বতাপনিয়োপনিষৎ", "শ্রীরামোত্তর তপনীয়োপনিষৎ", "রামরহস্যোপনিষৎ"—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

উপনিষদে রাম-কথা।

"মুক্তিকউপনিষদে" রাম হনুমানকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন।

কোন কোন স্মৃতি গ্রন্থেও রামায়ণের ২।১টা কথার উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "পরাশর স্মৃতি" ও "কাত্যায়ণ স্মৃতির" উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরাশর সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে—রামের জন্য নল যে সেতুবন্ধে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ আছে। কাত্যায়ণ সংহিতার বিংশ খণ্ডে রাম যে স্বর্ণ-সীতা গড়িয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, (উত্তরকাণ্ড) তাহার উল্লেখ আছে।

স্মৃতি গ্রন্থে রাম-কথা।

এই প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা গেল, সে সকলের মধ্যে বৌদ্ধ গ্রন্থ "লঙ্কাবতার সূত্র" ও "দশরথ জাতক" ব্যতীত আর সকল গুলিই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; সুতরাং এ গুলির প্রচার তৎকালীন ভারতীয় শিক্ষিত সমাজেই আবদ্ধ ছিল; প্রাদেশিক বিভিন্ন ভাষা-ভাষী স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পাঠের বা আলোচনার বিষয় ছিল না।

ক্রমে তাহা সাধারণেরও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল—প্রাদেশিক জনগণের সুবিধার জন্য ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ কথা রচিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; এবং এইরূপে ভারতের অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষায় অসংখ্য অসংখ্য রামায়ণ রচিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক কবিগণ কর্ত্তৃক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এই রামায়ণগুলি যে মূল রামায়ণের অনুবাদরূপেই প্রচারিত হইয়াছিল বা অনুসরণে লিখিত হইয়াছিল, তাহা নহে; এগুলি প্রাদেশিক সমাজের ভাব ও চিন্তার প্রভাব লইয়া রচিত হইয়াছিল। এমন কি, রামসীতার মূল কাহিনী সম্বন্ধেও অনেক

প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ।

প্রাদেশিক কবি বাল্মীকির অনুসরণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। *

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় যে এইরূপ কত রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত সংখ্যা অবগত হইবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময় মহারাষ্ট্র ভাষায় ৮ খানা, তেলেগু ভাষায় ৫ খানা, তামিল ভাষায় ১২ খানা, উৎকল ভাষায় ৬ খানা, হিন্দি ভাষায় ১১ খানা এবং বঙ্গভাষায় ২৫ খানা প্রাদেশিক রামায়ণ পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে। ইহা যে ভারতীয় ভাষা সমূহের মোট তালিকা নহে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক লেখকগণের রামায়ণের সংখ্যাও যে এই সামান্য কয়েকখানা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আসামী ভাষায় রচিত 'অনন্ত রামায়ণ', রবিসেনের 'জৈন রামায়ণ', ও দ্রাবিড় দেশের 'দ্রাবিড় রামায়ণ' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

দ্রাবিড় রামায়ণ।

দ্রাবিড়ী রামায়ণের গল্পটীর সহিত বাল্মীকি রামায়ণের গল্পের বিশেষ ঐক্য নাই। এই রামায়ণের বর্ণিত বিষয়ের ভিতরও দশরথ জাতকের ন্যায় কোন প্রচ্ছন্ন সত্য আছে কি না, ঐতিহাসিকগণের আলোচনার জন্য তাহা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

সূর্য্য বংশের রাজা সগর দক্ষিণ দেশে দিগ্বিজয়ে গিয়া দ্রাবিড়ের এক রাজা জীমূতবাহনের মনোনীত এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে লইয়া আইসেন। এই ঘটনায় জীমূতবাহন নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া— নিজে শক্তিহীন বিধায়—লঙ্কার রাজা প্রবল-শক্তি ভীমের শরণাগত হন। ভীমের কোন পুত্র সন্তান ছিল না; তিনি জীমূতবাহনকে পুত্ররূপে স্থান দিয়া এবং নিজ রাক্ষসকুলে বিবাহ করাইয়া লঙ্কা ও পাতাল লঙ্কার অধিপতি করিয়াদিলেন।

জীমূতবাহনের বংশের ধবলকীর্ত্তি লঙ্কার রাজা হন। তাঁহার শ্যালক

শ্রীকণ্ঠকুমার পাতাল লঙ্কার উত্তরে বানর দ্বীপের কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঁহার ধ্বজাতে বানরমূর্ত্তি চিহ্নিত করেন। শ্রীকণ্ঠের বংশে বজ্রকণ্ঠ, ইন্দ্রায়ুধ, অমরপ্রভু ও কপিকেতু জন্ম গ্রহণ করেন। অমরপ্রভু লঙ্কার এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কপিকেতুর দুই পুত্রের নাম কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক। তাহারা সংবাদ পাইলেন, বিজয়ার্থ পর্ব্বতে আদিত্য নগরের রাজকন্যা মন্ত্রমালী স্বয়ম্বরা হইবেন। কিষ্কিন্ধ্যা ও অন্ধ্রক স্বয়ম্বর সভায় গেলেন। সভাতে বিদ্যাধর দেশের রাজা আশনী বেগের পুত্র বিজয় এবং লঙ্কার রাজকুমার সুকেশও উপস্থিত ছিলেন। কন্যা মন্ত্রমালী কিষ্কিন্ধ্যাকে বরণ করেন। বিজয় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে অন্ধ্রকের হস্তে বিজয় নিহত হইলে কিষ্কিন্ধ্যা কন্যা লইয়া চলিয়া গেলেন। বিজয়ের পিতা পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। লঙ্কার রাজা সুকেশ কিষ্কিন্ধ্যার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে আশনীবেগের জয় হইল; বিদ্যাধর রাজ্য—লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিষ্কিন্ধ্যা, অন্ধ্রক ও সুকেশ রাজ্য হারাইয়া পাতাল লঙ্কার অশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মধু পর্ব্বতের উপর একটী ছোট নগর স্থাপন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা স্বীয় পুত্র ঋক্ষজ ও সূর্য্যজকে তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পাতাল লঙ্কাতে সুকেশের মালী, সুমালী ও মালবন্ত নামে তিন পুত্র হইয়াছিল; তাহারা আশনীবেগের পৌত্র (সহস্রার পুত্র) ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন এবং ইন্দ্রের রাজধানী দখল করিতে গিয়া পুনরায় পরাজিত হইয়া পাতাল লঙ্কাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন।

পাতাল লঙ্কায় বাস কালে সুমালী-পৌত্র (রত্নশ্রবার পুত্র)

রাবণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাবণ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পিতামহের রাজ্য অধিকার করিলেন এবং কিষ্কিন্ধ্যা জয় করিয়া ঋক্ষজ ও সূর্য্যজকে তাঁহাদের পিতৃরাজ্যে বসাইলেন। সূর্য্যজের মৃত্যুরপর তাহার পুত্র বালী ও সুগ্রীব রাজা হইলেন। রাবণ, বালী ও সুগ্রীবের ভগিনীকে বিবাহ করিতে চাহিলে বালী সম্মতি দিতে পারিলেন না, তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন; সুগ্রীব রাবণের নিকট ভগিনী সম্প্রদান করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

একবার সুগ্রীবের সহিত তাহার স্ত্রী সুতারার মনোবাদ হয়; সুগ্রীব রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; ইত্যবসরে এক মায়াধারী সুগ্রীব আসিয়া সিংহাসন ও সুতারাকে অধিকার করিয়া বসে; কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। সুগ্রীব নিরুপায় হইয়া হনুবর দেশের রাজা পবন পুত্র হনুমানের সহিত মিলিত হইয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় কোশল দেশের সূর্য্যবংশীয় রাজা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় অপহৃতা পত্নী সীতার অনুসন্ধান করিতে করিতে বনে আসিয়াছিলেন। হনুমানের চেষ্টায় রামের সহিত সুগ্রীবের মিত্রতা স্থাপিত হয়। রাম সুগ্রীবকে চিহ্নিত রাখিবার জন্য তাহার গলায় এক মালা গাঁথিয়া দেন এবং এইরূপে মালাহীন মায়াধারী সুগ্রীবকে নিহত করেন। সুগ্রীব বিপদ-মুক্ত হইয়া সীতা অন্বেষণে চারিদিকে চর নিযুক্ত করে।

সুগ্রীবের চরেরা জটায়ুর নিকট হইতে অবগত হয় যে সীতাকে রাবণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; জটায়ু প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া সীতাকে রাখিতে পারে নাই, পরন্তু আহত হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া সুগ্রীব হনুমানকে দূত রূপে নিযুক্ত করিল; কেন না, হনুমান রাবণের আত্মীয়; এতদ্ব্যতীত তিনি মহাপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ, ও বাগ্মী। রাবণ

হয়ত বা তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। রাবণ কিন্তু হনুমানের সম্মান রক্ষা করিলেন না। তখন হনুমান রামের অভিজ্ঞান সীতাকে দিয়া, সীতার অভিজ্ঞান আনিয়া রামকে দিলেন। যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। সুগ্রীবের চেষ্টায় দ্রাবিড় দেশের রাজারা সসৈন্য রামের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

দ্রাবিড় সৈন্যদিগকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে লঙ্কায় যাইতে পথে সমুদ্র শাসিত বেলান্ধপুর, সুষেন শাসিত সুবেলাচল, হংসদ্বীপের রাজা দ্বিপবদনের রাজ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

এই যুদ্ধের ফল মূল রামায়ণের মতই হইয়াছিল।

ইহাই দ্রাবিড় রামায়ণের মূল বিবরণ।

জৈনাচার্য্য রবিসেন রচিত জৈন রামায়ণের গল্পটীও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। তাহাও উদ্ধৃত হইল।

জৈন মতে তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব হইতে ইক্ষ্বাকু বংশের উৎপত্তি। এই বংশের অনরণ্য রাজার পুত্র দশরথের কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সুপ্রভা নামে তিন পত্নী ছিল। একদিন নারদমুনি রাজা দশরথ ও রাজা জনককে জানাইলেন যে লঙ্কার রাবণ জ্যোতির্ব্বিদের সাহায্যে গণনা করিয়া অবগত হইয়াছেন, আপনাদের উভয়ের পুত্র ও কন্যা তাঁহার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ আপনাদিগের শিরচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প; আপনারা আত্মরক্ষা করুন।

জৈন রামায়ণ।

নারদের কথা শুনিয়া দশরথ ও জনক অজ্ঞাত বাসে চলিলেন। এদিকে, তাঁহারা পীড়িত বলিয়া রাজ্যে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহাদের স্ব স্ব শয্যায় দুইটী কুশ পুত্তলিকা রাখিয়া দেওয়া হইল। বিভীষণের প্রেরিত চর, গোপনে এই কুশ

পুত্তলিকাদ্বয়কেই হত্যা করিয়া গেল। রাবণের ভীতি দূর হইল।

দশরথ অজ্ঞাতবাসে থাকা কালে কৌতুকমঙ্গল নগরের রাজা সুমতীর কন্যা কেকয়ীকে স্বয়ম্বর সভায় গ্রহণ করিলেন। কেকয়ী মহাভারতের সুভদ্রার ন্যায় সুকৌশলে রথ পরিচালন করিয়া অন্যান্য রাজাদিগের হাত হইতে দশরথকে নিরাপদে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিলে দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কেকয়ী বলিলেন—"বর সময়ে লইব, এখন নয়।"

অতঃপত দশরথের চারি পত্নীর গর্ভে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এবং জনক পত্নী বিদেহার গর্ভে সীতা জন্ম গ্রহণ করিলেন। রামের সহিত সীতার বিবাহ হইল।

এইবার দশরথ সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে ভরতও পিতার সহিত যাইবে স্থির করিল। পতি-পুত্র হারাইবার আশঙ্কায় কেকয়ী এইবার পতির নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—"ভরতকে রাজা করা হউক।"

বর প্রদত্ত হইল। ভরত রাজা হইল দেখিয়া রাম বনে চলিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ রামের অনুসরণ করিলেন।

রাম-লক্ষ্মণের দেশত্যাগে তাহাদের মাতৃদ্বয় দিবারাত্রি অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই নিরানন্দ কেকয়ীর নিকট মঙ্গলজনক বলিয়া বোধ হইল না। তিনি ভরতকে লইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন।

কেকয়ী রামকে বক্ষে ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন, অনেক ক্রটী স্বীকার করিলেন, কিন্তু রাম কিছুতেই ফিরিলেন না।

রাম-লক্ষ্মণ-সীতা দণ্ডকপর্ব্বতের সন্নিকটে অবস্থান কালে রামের হস্তে তপস্যা-নিরত শম্বুকের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হয়। এই ঘটনা লইয়া

শম্বুকের পিতা খরদূষণের সহিত ও মাতুল রাবণের সহিত রামের বিবাদ আরম্ভ হয়।

ইহার পর রাবণ সীতা হরণ করেন ও সীতাকে ফুল্লগিরির উপর অশোকমালিনী বাপিকার নিকট, অশোক বৃক্ষের নীচে রাখিবার ব্যবস্থা করেন।

কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের স্ত্রী সুতারার সহিত সাহসপতি নামক এক বিদ্যাধরের আসক্তি ছিল। একদিন সাহসপতি সুগ্রীবের বেশে সুতারার নিকট অবস্থান কালে সুগ্রীব আসিয়া উপস্থিত হইলে, কে সুগ্রীব—এই লইয়া বিষম বিবাদ আরম্ভ হইল। সুগ্রীব তখন নিরুপায় হইয়া পত্নী-হারা রামের শরণাপন্ন হইল; রাম সাহসপতিকে বধ করিয়া সুগ্রীবের উপকার করিলেন। কৃতজ্ঞ সুগ্রীব স্বীয় জামাতা হনুমানকে সীতার অন্বেষণে পাঠাইয়া রামের ঋণ পরিশোধ করিলেন।

হনুমান অশোক বনে যাইয়া সীতাকে দেখিয়া আসিল, আসিবার সময় পদাঘাতে লঙ্কার শোভা-সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া আসিল।

যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। বিভীষণ ভ্রাতাকর্তৃক অবমানীত হইয়া রামের পক্ষে স-সৈন্য যোগদান করিলেন।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান দ্রোণমেঘ রাজার কন্যা বিশল্যার স্নানের জল ঔষধরূপে আনিতে গেলে বিশল্যা স্বয়ংই আসিয়া লক্ষ্মণকে আরোগ্য করিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণের বাণে রাবণ হত হইলেন।

লঙ্কায়ই রামের রাজ্যাভিষেক হইল। এইস্থানে রাম আরো কতকগুলি বিবাহ করিলেন; তারপর বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাম লক্ষ্মণকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার অভিষেক করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণ অস্বীকার করেন; সুতরাং রামই

রাজা হন। ভরত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। শত্রুঘ্ন মথুরা জয় করিয়া মথুরার রাজা হন।

ইহার পর সীতার বনবাস। এই বনবাসের কারণ উত্তরকাণ্ডের মত হইলেও গল্পাংশে একখানার সহিত অন্যখানার ঐক্য নাই।

জৈন-রামায়ণে সীতার বনবাসের ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের বর্ণনা এইরূপ—

সীতার অপবাদ শুনিয়া রাম কৃতান্তবক্ত্র নামক সেনাপতিকে ডাকিয়া সীতাকে সিংহবনে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। সিংহবন হইতে পুণ্ডরীক পুরাধিপতি বজ্রজঙ্ঘ সীতাকে ভগিনী সম্বোধনে স্নেহ ও প্রীতির সহিত লইয়া গিয়া নিজ অন্তঃপুরে সসম্মানে রক্ষা করেন। পুণ্ডরীকপুরে সীতার অনঙ্গলবন ও মদনাঙ্কুশ নামে দুই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে।

কুমারদ্বয় নারদের চক্রান্তে অযোধ্যাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে সীতা নিষেধ করেন এবং শেষ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। শুনিয়া কুমারদ্বয় বলিল—"যে আমাদের নিরপরাধিনী মাতাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারে, তাঁহাকে তাহার প্রতিশোধ দিতেই হইবে।"

নারদ সীতাকে বলিলেন—"কোন চিন্তা নাই মা, আমি শেষ রক্ষা করিব।"

পিতা পুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সীতা ও নারদ বিমানে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। রাম-লক্ষ্মণের পরাজয় আসন্ন দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন; চক্র ফিরিয়া আসিল। অবস্থা বুঝিয়া নারদ ভূতলে অবতরণ করিয়া বালকদ্বয়ের সহিত রাম লক্ষ্মণের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

ইহার পর সীতা অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া অযোধ্যায় গৃহীত হইলেন। অতঃপর লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রাম উন্মত্ত হইয়া সতীদেহ-স্কন্ধে-মহাদেবের ন্যায় দেশেদেশে ঘুরিলেন।

শেষ রামচন্দ্র মাঙ্গি তুর্কী পর্ব্বতে (কোটী জিলায়) মুক্তি লাভ করিলেন।

এই জৈন রামায়ণ—জৈন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জৈন "পদ্মপুরাণ" নামেও প্রসিদ্ধ। অনেকে বলেন—এই গ্রন্থ অষ্টম বিক্রম সম্বতে রচিত হইয়াছিল।

রামচরিত সম্বন্ধে আর একখানা গ্রন্থ আছে; তাহার নাম 'পউম চরিঅং'। পাউম চরিঅং অপভ্রংশ ভাষায় রচিত। জৈন শাস্ত্রমতে রামের নাম—পদ্ম। পদ্মের কথা—এই অর্থে "পদ্মপুরাণ" অথবা অপভ্রংশ ভাষায় "পউম চরিঅং"।

এইরূপ আরো দুই এক খানা জৈন রামায়ণের বিবরণ কোন কোন বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক রামায়ণ গুলির ন্যায় জৈনরামায়ণ গুলিতেও—প্রাদেশিক কবিদিগের স্বাধীন চিন্তার ফলে—একে অন্যে—এইরূপ বহু প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে।

তুলসী দাস বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায়—আর্ষ রামায়ণের সহিত এই প্রাদেশিক রামায়ণ গুলিরও বিস্তর পার্থক্য আছে। বাহুল্য ভয়ে সেই পার্থক্যের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে বিরত থাকা গেল।

আসামী অনন্ত রামায়ণের প্রথমাংশ অধ্যাত্ম রামায়ণের ও শেষ অংশ বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে লিখিত।

প্রাদেশিক রামায়ণ গুলির উদ্ভব কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "The Epic of Rama" গ্রন্থের উপসংহার কথায় (Epilogue) লিখিয়াছেন—দক্ষিণ ভারতেই সর্ব্বাগ্রে রামায়ণ প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল এবং ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে তামিল ভাষায় প্রথম রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের তুলসীদাস, বাঙ্গালার কৃত্তিবাস, ও মারহাট্টার শ্রীধর দাক্ষিণাত্যেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণগুলি প্রচারিত হইয়াছিল।

প্রাদেশিক রামায়ণের প্রচার কাল।

ভারতের বাহিরে রামায়ণ কথার প্রচার।

রামায়ণ-কথা যে কেবল ভারতবর্ষের দেব-ভাষা ও প্রাদেশিক ভাষা সমূহেই আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; প্রাচীন কালে হিন্দুর গতি-বিধি ও উপনিবেশ যে যে স্থানে ছিল, সেই সেই স্থানেই রামায়ণও নীত হইয়াছিল; এবং পরবর্ত্তীকালে সেই সেই দেশের কবি-ভাষায় তাহার প্রচারও হইয়াছিল, এইরূপে যবদ্বীপে, বালীদ্বীপে, লম্বকদ্বীপে, ব্রহ্মদেশে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশে, মূল রামায়ণ-কথা প্রচারিত হইয়াছিল।

যবদ্বীপে বোধ হয় খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ-কথা নীত হয়। যবদ্বীপের রামায়ণের সহিত উত্তরকাণ্ড গ্রথিত নহে।

এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, যবদ্বীপে যে সময় ভারতীয় রামায়ণ-কথা নীত হইয়াছিল, তখন ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত ছিল না। ইহার পরে ভারতীয় রামায়ণে উত্তরকাণ্ড যুক্ত হইয়াছে।

যবদ্বীপের রামায়ণ—'রামকবি'।

বাঙ্গালার কৃত্তিবাসের ন্যায় যবদ্বীপের কবিরাও মূল রামায়ণকে নানা ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া তথাকার কবি-ভাষায় রচনা করিয়া লইয়াছেন।

যবদ্বীপের কবি ভাষায় রচিত রামায়ণের নাম 'রামকবি'। 'রামকবি' চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা রাম গুণক্রং, রামবদ্র বা রামভদ্র, রামতালী এবং রামায়ণ। রামগুণক্রং অংশে আদিকাণ্ডের কথাই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়অংশে রাম বনবাস হইতে রাহবণ (রাবণ) কর্ত্তৃক সীতা হরণ পর্য্যন্ত আছে। তৃতীয়অংশে হনুমানের দৌত্য ও অঙ্গলঙ্কা (স্বর্ণলঙ্কা) গমনের সেতু নির্ম্মাণের কথা পর্য্যন্ত আছে। চতুর্থ বা শেষ অংশে রাম-রাবণের যুদ্ধ, সীতি (সীতা) উদ্ধার ও সকলের নাযুস্তা (অযোধ্যা) প্রত্যাগমন এবং বিবিবণকে (বিভীষণ) লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার বিবরণ আছে।

যবদ্বীপের কবি-ভাষায় "কাণ্ড" নামেও একখানা পুরাণ-গ্রন্থ আছে। তাহাতেও সৃষ্টি প্রকরণ ইত্যাদির বর্ণনার সহিত রামায়ণ, ও মহাভারতের কাহিনীর এবং অন্যান্য পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীর বর্ণনা আছে।

যবদ্বীপের "কাণ্ড"।

যবদ্বীপে উত্তরকাণ্ডও আছে। তাহা পৃথক্ গ্রন্থ।

যবদ্বীপ হইতে যবদ্বীপের হিন্দু অধিবাসীরা যখন বালীদ্বীপে ও লম্বকদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহাদের এই সম্পদটীকেও তাঁহারা অন্যান্য প্রিয় সম্পদের সহিত লইয়া আসিয়াছিলেন।

বালীদ্বীপের রামায়ণও বাল্মীকি প্রণীত বলিয়া পরিচিত; কিন্তু তাহা বালীদ্বীপের কবি-ভাষায় রচিত। এই কবি ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। বালীর রামায়ণ ছয় কাণ্ডে ও ২৫ সর্গে সম্পূর্ণ। এই রামায়ণেও উত্তরকাণ্ড নাই। এখানেও উত্তরকাণ্ড পৃথক্ গ্রন্থরূপে প্রচলিত। উহার বিশেষত্ব এই যে—উহাতে রামের মৃত্যুর পরের— তদ্বংশীয়দিগের বিবরণ ও চরিত্র-কথাই কীর্তিত হইয়াছে। বালী-রামায়ণের ছয় কাণ্ডে সংক্ষেপে মূল রামায়ণের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে এবং শেষে রামের বার্দ্ধক্য অবস্থায় তাঁহার বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বালীদ্বীপের রামায়ণ।

বালীর কবি-ভাষায় রাজা কুসুম রচিত আর একখানা রামায়ণ আছে। সে খানিও উত্তরকাণ্ড হীন। বালীতে সেই রামায়ণেরই এখন প্রচার বেশী।

ব্রহ্মদেশী রামায়ণ-কথা-গ্রন্থের নাম "রামযৎ"। (Ramazat)

রামযতের রাবণ দশগিরি নামে পরিচিত, দশ-গ্রীব নহে। বাল্মীকির রাবণও কিন্তু কৃত্তিবাস বর্ণিত রাবণের ন্যায় দশমুণ্ড বিশ হস্ত ধারী নহে। রাবণের রাজমুকুট দশ শৃঙ্গ সমন্বিত হেতু ব্রহ্মদেশের রামযতে তিনি দশগিরি বলিয়া পরিচিত।

ব্রহ্ম-রামায়ণ "রামযৎ"।

ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জ সমূহে এবং ব্রহ্ম, আসাম, মালয় প্রভৃতি স্থানে দ্রাবিড়-সভ্যতাই বিস্তৃত হইয়াছিল; সেই জন্য মনে হয়, ঐ সকল দেশের রানায়ণী-কথায় দ্রাবিড় প্রভাব বেশী সংক্রামিত হইয়াছিল।

শ্যামদেশে অযোধ্যার আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, সে জন্য শ্যামে মূল বাল্মীকি রামায়ণই প্রচারিত হইয়াছিল। শ্যামের প্রাচীন রামায়ণ এখন আর পাওয়া যায় না। শ্যামের বালী ভাষায় (বোধহয় পালীভাষা) এই রামায়ণ লিখিত ছিল। বালী ভাষাও সংস্কৃত শব্দ-বহুল ভাষা।

শ্যামের 'রামায়ণ।

এগুলি সমস্তই সংস্কৃত মূলক ভাষা, আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার বিস্তৃতির সহিত বিস্তৃত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দু সভ্যতার বিস্তৃতির জন্য ব্যতীত, বিভিন্ন দেশের আগন্তুক জাতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষায়ও রামায়ণী-কথা পৃথিবীর দিকে দিকে নীত হইয়াছিল। যখনই যে জাতীয় লোক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতের এই মনোরম জাতীয় জীবনের চিত্র সম্বলীত কাব্য কথাটীকে অতি যত্নের সহিত লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপে রামায়ণীকথা এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ক্রমে ইয়ুরোপে বিস্তৃত হইয়াছিল।

অনেকের বিশ্বাস হোমারের ইলিয়ড কাব্য রামায়ণের গল্পাংশের

অনুকরণে রচিত। ইহার বিপরীত কথাও জন সমাজে প্রচারিত আছে। বাস্তবিক পক্ষে, হোমার বাল্মীকির অনুকরণে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কি বাল্মীকি হোমারের গল্পাংশ লইয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, না দুজনেই কোন এক উপকরণ আশ্রয় করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এ সকল তর্কের মীমাংসা নাই। তথাপি পৃথক পৃথক সমাজে এইরূপ তর্ক চলিত আছে। তর্কের অবকাশ আছে * বলিয়াই, তাহা থাকিবেও বোধহয় চিরকাল। কোন দুই জাতির যে এক রকম চিন্তা হইতে পারে না; বা কোন দুই দেশের বা একই দেশের, দুই ব্যক্তির যে

ইলিয়ড ও রামায়ণের উপকরণ এক কি না?

* ইলিয়ডের চিন্তা যে ভারত হইতে গৃহীত, তাহা ভাবিয়া দেখিবার জন্য এস্থলে গ্রীসের প্রাচীন কথা একটু উল্লেখ করা গেল। প্রাচীন গ্রীসের কোন ইতিহাস ছিল না। স্ত্রী সমাজে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা ছিল; তাহারা যখন তখন স্বামী হত্যা করিত। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মহামতি লাইকারগাস গ্রীসের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নানা দেশের ভাব ও চিন্তা লইয়া গ্রীসের সমাজ-নীতি নির্দ্ধারণ করেন। লাইকারগাস এই উপলক্ষে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন। লাইকারগাসের সময় ৮৮৪—১১০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ। এই সময় হোমারের ইলিয়ড গ্রীসে প্রচারিত হয় নাই। লাইকারগাসের অভিজ্ঞতার ফলে গ্রীসের ইতিহাস ও সমাজ গঠিত হইয়াছিল। এই সমাজ ও ইতিহাস গঠনের চিন্তার ভিতর যে ভারতের চিন্তা প্রভূত পরিমাণে গৃহীত হইয়াছিল, ইহা বর্ত্তমান জগতের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণও স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপ সম্বন্ধের সূত্র নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন না। আমরা লাইকারগাসের ভারত ভ্রমণই তাহার কারণ বা সূত্র বলিয়া মনে করি। কোন বিরাট কার্য্য যে একটী মাত্র কারণের উপর নির্ভর করে না, তাহাও আমরা অস্বীকার করি না। প্লুটার্ক লাইকারগাসের যে জীবনী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই উক্তির আভাস আছে। হোমার এসিয়া মাইনরের কবি বলিয়া খ্যাত। এসিয়ামাইনরে

গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী—

ময়মনসিংহের বিবরণ	১৲
ময়মনসিংহের ইতিহাস	১৷৷৹
ঢাকার বিবরণ	১৷৷৹
চিত্র (ঐতিহাসিক গল্প)	৷৵৹
সারস্বতকুঞ্জ (সচিত্র) বা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস	৷৷৹
সাময়িক সাহিত্য	৩৲

ময়মনসিংহ সৌরভ প্রেস হইতে

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

পপুলার লাইব্রেরী—ঢাকা।

আশুতোষ লাইব্রেরী—৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

উপন্যাস গ্রন্থাবলী—

সমস্যা	১৷৹
শুভদৃষ্টি	১৲
স্রোতের ফুল	১৷৹
স্নেহের দান (যন্ত্রস্থ)	

রামায়ণের সমাজ

৺কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।
Research House, Mymensigh.

মূল্য চারি টাকা।

ভাব ও কল্পনার সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, বা থাকা অস্বাভাবিক, তাহা নহে। রামায়ণ ও ইলিয়ডের গল্পাংশ অনেকটা একরূপ হইলেও এবং উভয় কাব্যের চরিত্র গুলির অধিকাংশ এক ছাঁচের হইলেও অনেক মনীষী সমালোচক এই দুই মহাকাব্যের কবিদ্বয়কে পরস্পরের নিকট ঋণী মনে করেন না।

গ্রীক চিন্তার সহিত ভারতীয় চিন্তার যে বহু বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা এই গ্রন্থে ও 'রামায়ণের সভ্যতা' নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের বহুস্থলেই প্রদর্শন করিয়াছি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে

দ্রাবিড়ের পনি বণিকদিগের সহিত ভারতীয় চিন্তা আরো পূর্ব্বে গিয়াছিল। হোমার যদি বেদের সরমা ও পনির গল্প হইতে ইলিয়ডের কল্পনা লইবার সুযোগ পাইতে পারেন, তবে রামায়ণের গল্প ভাগও এই উপায়েই পাইয়াছিলেন, কল্পনা করা যাইতে পারে। ইলিয়ডের কবি যদি প্রকৃতই রামায়ণের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তবে এইরূপে অথবা এইরূপ অন্য উপায়ে তাহা তাঁহার গ্রহণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, ইহা চিন্তা করা যায়।

অপর পক্ষে, যাঁহারা রামায়ণকে ইলিয়ডের অনুকরণ মনে করেন, তাঁহাদিগকে—গ্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় কবির যে এইরূপ ভাব ও চিন্তা গ্রহণের সুযোগ হইয়াছিল—ইহা মনে করিয়া আলোচনা করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ বৈদেশিক কোন চিন্তার প্রভাবে নিজ সমাজ চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন—এমন কোন প্রমাণ নাই।

গ্রীক বিজয়ের পর ভারতীয় সমাজে ও চিন্তায় যে পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাব আসিয়াছিল, রামায়ণ-মাহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশে ও পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতিতে তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে; বর্ত্তমান গ্রন্থে ও গ্রন্থান্তরে ("রামায়ণের-সভ্যতা" গ্রন্থে) তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি।

এই বিষয়ে উভয় পক্ষেরই যে যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

স্পষ্টই মনে হইবে, প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের একটা আদান প্রদানের সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াও অধ্যাপক মেক্সমুলার, অধ্যাপক ওয়েবার প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই উভয় কাব্যের মূল চিন্তায় কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন নাই। মেক্সমুলার মনে করেন, বেদের পনি ও সরমার গল্প লইয়া হোমার ইলিয়ড রচনা করিয়াছিলেন। আর ওয়েবার বলেন, দক্ষিণ ভারতের কৃষি প্রবর্ত্তনের রূপক কথা লইয়াই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল।

ইলিয়ড ও রামায়ণের সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে আলোচনার প্রচুর হেতু এবং উপকরণ বর্ত্তমান থাকিলেও আমরা এ স্থলে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

রামায়ণী কথা চীন সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বৌদ্ধ গ্রন্থ "মহাবিভাষার" উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। (১৪০ ও ১৪৭ পৃষ্ঠা)

চীন ভাষায় রামায়ণ-কথা।

এই গ্রন্থখনা কাত্যায়নী পুত্র কৃত "জ্ঞান প্রাস্থান" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের এক খানা বিরাট টীকা গ্রন্থ। এই বিরাট টীকা গ্রন্থ মহাবিভাষায় রামায়ণের গল্পাংশ—সীতা হরণ হইতে সীতা উদ্ধার পর্য্যন্ত আছে। চীন ভাষায় মহাবিভাষা দুই শত খণ্ডে সমাপ্ত; ইহার ৪৬শ খণ্ডে এই রামায়ণী কথা প্রদত্ত হইয়াছে। মহাবিভাষা শকরাজ কণিষ্কের সময় রচিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সহিত চীন ভাষায় অনূদিত হইয়া চীন দেশে নীত হইয়াছিল। অতঃপর চীন পরিব্রাজক য়ুয়েনসঙ্গও এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে শকরাজ কণিষ্ক বুদ্ধের দেহ ত্যাগের ৩০০ বৎসর পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

* The Oldest Record of the Ramayana in a Chinese Budhist Writing—J. R. A. S. 1907 January.

দশরথ জাতকের গল্পাংশের সহিত মহাবিভাষার গল্পাংশ যুক্ত করিয়া লইলে খৃঃ পূঃ তৃতীয় এবং ৪র্থ শতাব্দীতেও যে বৌদ্ধ সাহিত্যে সম্পূর্ণ রামায়ণ কথা ছিল, তাহা প্রকাশ পায়। এই চিন্তা গ্রাহ্য করিতে গেলে কিন্তু লঙ্কাবতারসূত্রকে অগ্রাহ্য করিতে হয়।

অতঃপর আরবের অভ্যুদয় কালে বোগদাদের রাজা হারুণ-অল-রসিদ নাকি ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের সহিত রামায়ণ-মহাভারতেরও অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় রামায়ণের কয়েক খানা অনুবাদ গ্রন্থ ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহারই কোন কোন খানা বোগদাদ রাজের সেই সাধু প্রচেষ্টার ফল কি না, কে বলিতে পারে ?

পারস্য ভাষায় রামায়ণ।

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবর সাহ রামায়ণের একখানা উৎকৃষ্ট গদ্যানুবাদ সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন। তিনি ঐ কার্য্যে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত তাঁহার সভাপণ্ডিত আবদুল কাদের বদাউনীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বদাউনী যদিও কাফের দ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, এবং এই কার্য্যে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বদাউনী তাঁহার রচিত “মস্তখব-উৎ তাওরিখ” বা “তারিখ-ই-বদাউনী” গ্রন্থে ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, তিনি চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে ৬৫ অক্ষর সমন্বিত (?) পঁচিশ হাজার শ্লোকের অনুবাদ শেষ করিয়াছিলেন। ৯৯৯ হিজিরা অব্দের জমদ-অল-আওয়াল মাসে তাঁহার অনুবাদ শেষ হইয়াছিল।[১] এই অনুবাদের একখানা বিচিত্র কারুকার্য্য

১ Elliot's History of India. Vol V. Page 539. Tarikh-i-Badauni.

সম্পন্ন অনুলিপি ২০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে আমেরিকার ওয়াসিংটন লাই-ব্রেরীতে সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। [২]

আকবর বাদসাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণে রামায়ণের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তিনি করাইয়াছিলেন তুলসী দাসের হিন্দি রামায়ণের অনুবাদ। তাঁহার সময়ের দুইখানা অনুবাদের কথা অবগত হওয়া যায়। একখানা করিয়াছিলেন—জাহাঙ্গীর বাদসাহের জনৈক আমীর মুকারব (Muqarrab) খাঁর কর্ম্মচারী পানিপথ নিবাসী মুল্লা সাদুল্লামসী, [৩] অপর খানা করিয়াছিলেন—দিল্লীর কায়স্থ পণ্ডিত গিরিধর দাস। উভয় খানাই পদ্যানুবাদ। এই উভয় গ্রন্থেরই পাণ্ডু-লিপি, বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। [৪] গিরিধর দাস তাঁহার গ্রন্থখানা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১০৩৬ হিজিরা অব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল।

আলমগীরের রাজত্ব কালে—১১০৫ হিজিরায় শ্রীরামের পুত্র চন্দ্রমন (চন্দ্রমোহন (?)) বেদিল নামক জনৈক কবি পদ্যে ও গদ্যে দুই ভাগে রামায়ণ অনুবাদ করেন। তাঁহার পদ্যানুবাদ রামায়ণ "নর্গিস্তান" বা "নর্গির বাগান" নামে পরিচিত। এই রামায়ণের আধুনিক লক্ষ্ণৌ

---

২ Smith's History of Fine Arts in India & Ceylon, Page 456.

৩ বৃটীশ মিউজিয়ামের কেটেলগে ও পাটনার খোদাবক্স লাইব্রেরীর কেটেলগে এই গ্রন্থের অনুবাদকের নামের স্থলে হাকিম রুকনুদ্দীন মাসুদ লিখিত হইয়াছে। Vide "Persian Ramayanas". Calcutta Review, March, 1924.

৪ Catalogue of Persian Mss. in the British Museum. Vol. 1, Page 56 b.

সংস্করণে ইহাকে মির্জ্জা আবতুল কাদের বিদিল অনূদিত রামায়ণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।[৫]

১১৬৮ হিজিরা অব্দের ৫ শাবন (১৮১২ সম্বত) লালপুর নিবাসী গোপালের পৌত্র, সুবন্তের পুত্র অমনাথ (অমরনাথ (?)) একখানা রামায়ণের বিরাট পদ্যানুবাদ সমাপ্ত করেন। তাহার অনুবাদের বিবরণে প্রকাশ, তিনি দিল্লী নগরে আলীআমজদের চাকুরীতে থাকিয়া তাঁহার সাহায্যে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনী রহিমন্নেছার সাহায্যে এই বিরাট কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। পাটনা খোদাবক্স লাইব্রেরীতে এই রামায়ণের একখণ্ড পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

রামায়ণের তুইখানা পারস্য অনুবাদের প্রতিলিপি বিলাতের ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীতেও আছে। একখানা আনন্দ খাঁ কর্ত্তৃক বাল্মীকির পদ্যানুবাদ বলিয়া পরিচিত; আনন্দ খাঁর রামায়ণে শেষ কাণ্ড নাই। অপর খানা গদ্যানুবাদ; তাহাতে অনুবাদকের নাম নাই।[৬]

আর একখানা পারস্য পদ্যানুবাদের সন্ধান Sir William Ouseleyর সংগ্রহ তালিকার (Catalogue) ভিতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রামায়ণেরও অনুবাদক কবির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।[৭]

ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত মিউনিচ লাইব্রেরীতেও একখানা রামায়ণের পারস্য অনুবাদ রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থে অনুবাদকের নাম নাই। গ্রন্থ খানা পদ্যে অনূদিত।[৮]

---

৫ Calcutta Review, March. 1924.

৬ Catalogue of Persian Mss. in the India Office Library. Page 1099.

৭ Sir William Ouseley's Catalogue (Entry No. 74)

৮ Calcutta Review, March, 1924.

বিলাতের বৃটীশ মিউজিয়ামে তুলসী দাসের রামায়ণের একখানা পারস্য অনুবাদও রক্ষিত আছে। এই অনুবাদের সহিত রাম সীতার পৃথক জীবন চরিত লিখিত আছে। গ্রন্থখানা সুবৃহৎ। এই গ্রন্থের অনুবাদকের নাম দেবীদাস কায়েস্থ। [১]

এইরূপে পারস্য ভাষার সাহায্যেও রামায়ণ-কথা জগতের দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

ইয়ুরোপীয় ভাষায় রামায়ণ।

ইংরেজ অধিকারের পর ইয়ুরোপীয়দিগের দৃষ্টিও ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের দিকে নিপতিত হয়। ফলে শ্রীরামপুরের মিসনারী কেরী ও মার্স্‌ম্যান ১৮০৬ ও ১৮১০ সালে বঙ্গদেশীয় সংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ড ও অযোধ্যাকাণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮২৯ অব্দে ভন শ্লিগেল (Augustus William Von Schlegal) কাশী-সংস্করণ রামায়ণের বালকাণ্ডের সম্পূর্ণ ও অযোধ্যাকাণ্ডের কতক অংশের মূল সহ লাটিন অনুবাদ প্রচার করেন।

১৮৪০ অব্দে ইটালি দেশবাসী সিগনর গেরেসিও বঙ্গীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ রামায়ণ মূল সংস্কৃত সহ ইটালীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। গেরেসিও সার্ডেনিয়ার রাজা চার্লস্ আলবার্টের সাহায্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৪০ অব্দে তিনি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ১৮৬৭ অব্দে তাঁহার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। (মতান্তরে ১৮৪০—-১৮৬০) তাঁহার রামায়ণের ন্যায় উৎকৃষ্ট সংস্করণ এপর্য্যন্ত আর প্রচারিত হয় নাই।

গেরেসিওর রামায়ণ অবলম্বন করিয়া হিপোলাইট ফচি (M. Hippolyte Fouche) ফরাসী ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ প্রচার করেন।

---

১ "Persian Rramayanas" C. R. March, 1924.

এই সময় বিলাতের Westminster Review (Vol. L.) পত্র রামায়ণ সম্বন্ধে একটী মূল্যবান প্রবন্ধ প্রচার করিয়া ইয়ুরোপীয় দিগের দৃষ্টি এই কাব্যের প্রতি আকর্ষণ করেন এবং ভারতীয় সিভি-লিয়ান কাষ্ট সাহেব (R. N. Cast) কলিকাতা রিভিউ (No. 45) পত্রিকায় রামায়ণের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই আলোচনাদ্বয়ের ফলে ইয়ুরোপের বহু মনীষী ব্যক্তির মনে রামায়ণ আলোচনার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠে।

কাশী কুইন্স কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিৎ সাহেব (Ralph T. H. Greffith M. A.) কাশী-সংস্করণ রামায়ণের সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেন। মনিয়র উইলিয়ম "Indian Epic Poetry" লিখিয়া রামায়ণ ও মহাভারাতের বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। স্পিয়ার পত্নী (Mrs, Speir) "Life in Ancient India" গ্রন্থ রচনা করেন। ফরাসী লেখক Mlle Clarisse Bader—"La Femme dans L' Inde Antique" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবি গুরু বাল্মীকির যশ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

দেশীয়দিগের মধ্যে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "The Epic of Rama, Prince of India" নাম দিয়া মূল রামায়ণের মাঝে মাঝে হইতে ইয়ুরোপীয়দিগের রামায়ণ পাঠের সুবিধার জন্য ২০০০ হাজার শ্লোকের এক ইংরেজী পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (১৯০০) স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র রায় এবং স্বর্গীয় মন্মথনাথ দত্তও রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে রামায়ণ কথার আলোচনা বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে আরও অনেকে করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মের "Indian Epic Poetry" ব্যতীত তাঁহার "Indian Wisdom", Oman সাহেবের

"Great Indian Epics," ডোনাল্ড মেকেঞ্জির "Indian Myth & Legend," জনৈক ইংরেজ মহিলার "Iliad of the East" প্রভৃতি ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য।

টালবয়েড হুইলারও একখানা রামায়ণের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ রামায়ণ তাঁহার প্রণীত ভারত ইতিহাসের (History of India) একটি খণ্ড মাত্র। এই রামায়ণ খণ্ড দুইভাগে বিভক্ত; প্রথম অংশে রামায়ণী কথা ও দ্বিতীয় অংশে রামায়ণের আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের আকার বৃহৎ; কিন্তু দুঃখের বিষয় হুইলার সাহেব শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার মনের ঈর্ষাপ্রসূত কলুষ-ভাব আলোচনার কথায় কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

হুইলার সাহেবের রামায়ণ কথার অনুসরণ করিয়া খৃষ্টানদিগের ভারতীয় সাহিত্য প্রচার সমিতি (The Christian Literature Society for India) ইংরেজী ভাষায় একখানা ক্ষুদ্র রামায়ণ প্রচার করিয়াছিলেন।

গ্রিফিত সাহেব "Scenes from Ramayana" নামে দত্ত সাহেবের "Epic of Ram..." এর অনুকরণেও একখানা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের কোন কোন দৃশ্য বাল্মীকির রামায়ণ হইতে গ্রহণ না করিয়া তিনি কালিদাসের "রঘুবংশ" হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন জাতির সাহিত্যের ভিতর দিয়া রামায়ণ ও রাম-কথা জগতের সুধী সমাজে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণের সমাজ

দ্বিতীয় অংশ

(সমাজ আলোচনা)

প্রথম অধ্যায়।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা।

বর্ত্তমান সময় ইতিহাস রচনার যে রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগে কেন, ঐতিহাসিক যুগেও হিন্দু ভারতে তেমন করিয়া ইতিহাস রচনার ধারা প্রচলিত ছিল না।

ইতিহাসের সংজ্ঞা।

প্রাচীন ঋষিরা ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাস প্রচক্ষতে॥"

যে গ্রন্থে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ সহ (রাজাদিগের) পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বিবৃত হয়, তাহাকে ইতিহাস বলে।

রামায়ণ এই সংজ্ঞা অনুসারে ইতিহাসশ্রেণী ভুক্ত হইবার অধিকারী নহে; কেন না, তাহাতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের উপদেশ থাকিলেও যে রাজাদিগের কথা উহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের বৃত্তান্ত তাহাতে নাই।

রামায়ণ ইতিহাস নহে।

রামায়ণে রাজা দশরথের পিতৃ-পিতামহের অর্থাৎ ইক্ষ্বাকুবংশের প্রাচীন কথা না থাকাতেই ঋষিদিগের মতে রামায়ণ ইতিহাস পদবী লাভ করিতে পারে নাই।

রামায়ণের নিজ উক্তিতেই রামায়ণ একখানা আখ্যান গ্রন্থ। যথা—

"মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্।" ৩।১।৫

আখ্যানও ইতিহাস। আখ্যানভাগের উপরও দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব বিদ্যমান থাকে; এবং সেই দেশ-কালের প্রভাব-চিহ্ন দ্বারা কেবল যে আখ্যান, তাহা নহে, কাব্য-মহাকাব্য, ধর্ম্ম-দর্শন, নাটক-উপন্যাস, জ্যোতিষ-গণিত প্রভৃতির ভিতর হইতেও সমসাময়িক যুগের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি যুগধর্ম্মের আভাস অল্প-বিস্তর অবগত হওয়া যাইতে পারে। সুতরাং রামায়ণ আখ্যান, বা কাব্য, বা ইপিক্, বা ধর্ম্মগ্রন্থ—যাহাই হউক না কেন, তাহার ভিতর যে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব বিদ্যমান আছে—যুগধর্ম্মের ছাপ আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ফরাসী সমালোচক সাঁবুফ এইরূপ ভাবের আলোচনা করিতে যাইয়াই বলিয়াছেন—"কাব্য-সাহিত্য কেবলি কল্পনার লীলা খেলা নহে, তাহা জাতীয় জীবনের সুন্দর চিত্রপট।" ভারতগৌরব স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামায়ণ-মহাভারতকে প্রথম জীবনে কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াও শেষ জীবনে ঠিক এইরূপ কথাই অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উক্তিদ্বয় পরে উদ্ধৃত করা গেল।

রামায়ণ আখ্যান।

আমরা রামায়ণকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষোপদেশসমন্বিত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া ভক্তিভরে পূজা করি, জগতের শ্রেষ্ঠ মহাকবির উচ্চ আদর্শ-সৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া গৌরব অনুভব করি, এবং আর্য্য ভারতের প্রাগ্ঐতিহাসিক যুগের সমাজ জীবনের এক খানা নির্ম্মল ঐতিহাসিক চিত্রপট বলিয়া— ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নাই—এই প্রচলিত কলঙ্কজনক উক্তির

রামায়ণ যুগ-ধর্ম্মের ইতিহাস।

সগর্ব্বে প্রতিবাদ করি। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় সুপ্রাচীন এবং অমূল্য সম্পদ যে দেশের আছে—সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস নাই—এ কথা স্বীকার করা যায় না; স্বীকার করিবার হেতু নাই। এই দুই খানা মহাকাব্য ভারতের দুইটী সুপ্রাচীন যুগের যুগ-ধর্ম্মের প্রভাব রঞ্জিত কাহিনীই ব্যক্ত করিতেছে।

অলীক ও অনৈতিহাসিক বর্ণনা সর্ব্বদাই ত্যাজ্য।

সত্য বটে, রামায়ণে ও মহাভারতে এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা স্পষ্ট অলীক, অসম্ভব ও অনৈতিহাসিক। পৃথিবীর সকল প্রাচীন সভ্য দেশের প্রাচীন কাহিনীতেই এরূপ ক্রুটী আছে। তেমন সকলকথা উন্নত সভ্য দেশ ও জাতির ইতিহাসে থাকিলেই যে তাহা দূষণীয় নহে, তাহা বলা হইতেছে না, তেমন সকল অলীক, অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক বর্ণনা যে স্থলেই থাকুক না কেন, ইতিহাসের আলোচনায় তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। অলীক ও অনৈতিহাসিক কথার সংমিশ্রণে লিখিত লিবির রোমের ইতিহাস, হিরোডোটাসের গ্রীসের ও মিসরের ইতিহাস, সোঁইকুওচুঁর চীনের ইতিহাস প্রভৃতি যদি ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে না কেন?

কবির কাব্য ইতিহাস নহে।

কেহ কেহ কবির কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের মত—কবিরা সর্ব্বদাই একটা উচ্চ আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা করেন; ফলে সেই চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা বাস্তব জগৎ হইতে ক্রমে দূরে সরিতে সরিতে অনেক খানি কল্পনার রাজ্যে চলিয়া যান, তখন তাঁহাদের সৃষ্টকাব্য কেবল কল্পনারই জিনিস হইয়া থাকে।

এইরূপ উক্তি যে একেবারেই ভিত্তিহীন, তাহা বলিবার উপায়

নাই। কবিরা আদর্শ সৃষ্টি করিতে যাইয়া বাস্তবকে ভুলিয়া যান, সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অতিক্রম করেন, অনেক স্থলেই তাঁহাদের বিষয় বর্ণনা অত্যুক্তি দোষে কলুষিত হইয়া পড়ে, তাঁহাদের ভাব প্রবণতা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাদের মনে তৃপ্তি দান করিয়া থাকে। এই অভিযোগগুলির একটী কথাও মিথ্যা নহে। কবিদিগের ইহা স্বাভাবিক ক্রটী। কবিদিগের এই স্বভাব-সিদ্ধ ক্রটী ঐতিহাসিকের আলোচনার বিষয় হইবে না। তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় ও আলোচনার বিষয় হইবে, কবি-কল্পনার মূল উপাদান। ঐতিহাসিক দেখিবেন, কবির কল্পনার মূলে কি যুগ-ধর্ম্মের লক্ষণ আছে? অযোধ্যার উত্থান-বাটিকার বর্ণনা অস্বাভাবিক, অলীক বা অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত কি না, ঐতিহাসিক তাহা লক্ষ্য করিবেন না; ঐতিহাসিক দেখিবেন—উত্থানের মাঝে মাঝে যে সকল ধাতু মূর্ত্তির উল্লেখ ও বসিবার বেদীর উল্লেখ কবির বর্ণনায় আছে, সেই কবি-বর্ণনায় উল্লেখিত বিষয়গুলির যথার্থ জ্ঞান কবির ছিল কি না? অথবা যে সমাজের কথা কবি তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমাজ সেই বিষয় গুলির সহিত পরিচিত ছিল কি না? গজদন্তে অযোধ্যার উত্থান-বেদীকাসমূহ রচিত হউক বা না হউক, সেরূপ উল্লেখ যদি কবি করিয়া থাকেন, তবে ঐতিহাসিকের ভাবিবার বিষয় হইবে—গজদন্তকে মানুষ সৌখীন প্রয়োজনে কত কাল পূর্ব্ব হইতে আনয়ন করিয়াছিল? লঙ্কার অট্টালিকা ও প্রাচীরের বর্ণনায় স্বর্ণের বাহুল্য আজকালের হিসাবে অতিশয়োক্তি সন্দেহ নাই—কিন্তু ঐতিহাসিক দেখিবেন—অট্টালিকা, প্রাচীর প্রভৃতি শব্দদ্বারা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক যাহা বুঝিত বা এই বিংশ শতাব্দীর লোক যাহা বুঝে,

ঐতিহাসিকের বিচার্য্য বিষয়।

রামায়ণের কবি ও সমাজ সেইরূপই বুঝিত কি না? যদি সেই সুপ্রাচীন যুগের কবি ও সমাজ সেই দুটী কথায়—আজ কাল অট্টালিকা ও প্রাচীর শব্দে আমরা যাহা বুঝি—তাহাই বুঝিত, তবে ঐতিহাসিক চিন্তা করিবেন—এই জিনিস দুইটী ভারতীয় সমাজে কত প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত। আর যদি অট্টালিকা ও প্রাচীর শব্দ দ্বারা সেই সুপ্রাচীন যুগে অন্য কোন পদার্থ বুঝাইত, তবে সেই পদার্থ কি? * লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার গিরি-কন্দর-শোভিত বিচিত্র অন্তঃপুরে যাইয়া বানর কামিনীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন—এস্থলে বানরী সঙ্গীত গাইতে পারিত কি না ঐতিহাসিক তাহা লইয়া ভাবিতে বসিলে তদ্বারা অনুমাত্রও সুফল প্রসূত হইবে না। ঐতিহাসিকের চিন্তা সুফল আনয়ন করিবে—গুহা চিত্রাবলীর প্রাচীনতা নির্ণয় বিষয়ক গবেষণায়। তিনি দেখিবেন বৌদ্ধযুগের যে সকল গুহা-শিল্প বর্ত্তমান

---

* প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বর্ণ বলিতে বর্ত্তমান সময়ের স্বর্ণ ধাতুটীকে বুঝাইত না এবং প্রাচীর ও অট্টালিকা দ্বারা যথাক্রমে ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ ও দেওয়ালকে বুঝাইত না—কোন কোন পাশ্চাত্য কুট তর্কবাদীরা আজকাল এইরূপ কথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তি (১) হনুমানের লেজের অগ্নিতে স্বর্ণ-লঙ্কা ভস্মে পরিণত হইবার পরও লঙ্কাকাণ্ডের বর্ণনায় মহর্ষি স্বর্ণ-লঙ্কার পূর্ব্বরূপ বর্ণনা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; ইহাতেই নাকি তাঁহাদের হৃদ্‌বোধ হইয়াছে, হয় কবি স্বর্ণ ও অগ্নির সম্বন্ধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন; নাহয় অগ্নিতে দগ্ধ হইলে যাহা রূপান্তরিত হইত না, এমন কোন ধাতুই সে কালে স্বর্ণ বলিয়া পরিচিত ছিল। ইত্যাদি।

(২) ইষ্টক ও প্রস্তর যে তখন প্রচলিত ছিল না—সে সম্বন্ধে টালবয়েড্ হুইলারের মত আমরা "রামায়ণের সভ্যতা" গ্রন্থের ভাস্কর শিল্প শীর্ষক প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। হুইলার সাহেব তাঁহার রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছেন—অযোধ্যার রাজধানীর চারিদিকে বাঁশের বেড়া ছিল, এবং তাহাই প্রাচীর বলিয়া কথিত হইত।

জগতকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শিল্প-চিন্তার উৎস কোথায়?

কবি কল্পনার এই উপাদান গুলির বিষয়ই হইবে ঐতিহাসিকের প্রকৃত লক্ষ্যের বিষয়। কবির কাব্য ইতিহাস নহে সত্য, কিন্তু কাব্যের উপাদানে ঐতিহাসিকের ভাবিবার বিষয় আছে যথেষ্ট।

অট্টালিকা যদি কোন কবির জ্ঞানের বিষয় হয়, তবে তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটিয়সী কল্পনার বলে তিনি তাহা ভূমিতে স্বর্ণ দ্বারা অথবা আকাশে প্রস্তর দ্বারা গড়িয়া তুলিতে পারেন। এরূপ স্থলে অবশ্যই অট্টালিকার উপাদানগুলির সহিত কবির পরিচয় থাকা দরকার। সঙ্গীত-শাস্ত্রটী সমাজে পরিচিত থাকিলে, সে সমাজের কবি বানরী কেন রাসভীকেও সুকণ্ঠী ও সঙ্গীত-কলা-নিপুণা বলিয়া পরিচিতা করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। কবির যে এইরূপ অঘটন সংগঠনের অধিকার আছে, ঐতিহাসিকের সে কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামায়ণ মহাকাব্যের আলোচনায় তাঁহার "The Epic of Rama" ... গ্রন্থের উপসংহারভাগে এইরূপ চিন্তা করিয়াই বলিয়াছেন—

"Ramayana gives a true picture of Hindu faith and religious life as Dante's "Divine Comedy" gives us a picture of the faith and belief of the middle ages in Europe. Our own ideals in the present day may not be the ideals of the 10th century before Christ or the fourteenth century after Christ; but mankind will not willingly let die those great crea-

tions of the past which shadow forth the ideals and beliefs of interesting periods in the progress of human civilisation."

অর্থ—মহাকবি দান্তের "ডিভাইন কমিডি" যেমন ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করে, রামায়ণও তেমনি আমাদিগকে হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসের নিখুঁত চিত্র প্রদান করিয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান আদর্শ ও খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীর অথবা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আদর্শ এক নাও হইতে পারে, কিন্তু সুদূর অতীতের কবি-কল্পনার যে মহতী সৃষ্টি মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতির রমণীয় যুগের আদর্শ ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ছায়া-পাত করে, তাহা মানব-সমাজ কখনই স্বেচ্ছায় ধ্বংস হইতে দিতে চাহিবে না।

কবির বর্ণনা হইতে এইরূপে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া কাব্যের যুগ-নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং তাহাই যেন এইরূপ আলোচনার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ও—সমীচীন উপায়।

কবি সকল সময়ই তাঁহার সমসাময়িক চিত্র অঙ্কিত করেন না।

কিন্তু কবিরা কি কেবল নিজ নিজ সমসাময়িক সমাজ-চিত্রই স্ব স্ব কাব্যে অঙ্কিত করিয়া থাকেন? অনেক স্থলেই তো তেমন দেখা যায় না। অনেক কবি তো তাঁহার নিজ নিজ সময় অপেক্ষা বহু প্রাচীন কালের চিত্র ও প্রবাদে প্রচলিত প্রাচীন সমাজের চিত্র এবং বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন কালের সমাজ-রীতির একত্র সমাবেশ করিয়া বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। সে সকল সমস্যা এত জটিল যে যুগের আলোচনায়ও তাঁহার শেষ মীমাংসা হইবে কি না সন্দেহ। এরূপ সমস্যার সৃষ্টি মহাভারতকার যত বেশী করিয়াছেন তত আর কেহ করেন নাই।

রামায়ণের সমাজ পূর্ব্বের কি মহাভারতের সমাজ পূর্ব্বের, এই জটীল প্রশ্নের সৃষ্টির কারণও সেই সমস্যার মধ্যেই নিহিত, তাহা বলাই বাহুল্য। এরূপ সমস্যা রামায়ণে যে দুই একটা আছে, তাহার আলোচনা আমরা এই গ্রন্থে করিয়াছি; মহাভারতেরও এইরূপ দুই একটা সমস্যার বিচার ও উল্লেখ বিবাহ ব্যাপারাদির আলোচনায় করা হইয়াছে। এস্থলে এই দুই খানা কাব্যের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বিচার করিলে সে বিচার ফল সর্ব্বজন গ্রাহ্য হইবে না, মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক—ঐতিহাসিক যুগের এইরূপ একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

কবি ভবভূতি ঐতিহাসিক যুগের কবি। এই যুগের সমাজ ধর্ম্মের ইতিহাস প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় সমস্যাপূর্ণ নহে। অথচ এই কবি তাঁহার "উত্তর রাম চরিতে" ও "মহাবীর চরিতে" এমনি চিত্র প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন, যে তাহা ঐতিহাসিক সমাজে বিষম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার চিত্রগুলির মধ্যে একটী—তিনি তঁহার উভয় গ্রন্থেই-অতিথি সৎকারে গো-মাংসের উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি ভবভূতির অঙ্কিত চিত্রে যুগ-সমস্যা।

এই সমস্যা যে কোন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মনেও বহু প্রশ্নের অবতারণা করাইয়া দিতে পারে, এবং দিয়াছে। সে প্রশ্ন গুলির দুই একটী এইরূপঃ—

(ক) কবি ভবভূতির যুগে এই নিয়ম (গোমাংস ভোজন ব্যবস্থা) হিন্দু ভারতে প্রচলিত ছিল কিনা?

(খ) রাম, বাল্মীকি ও বসিষ্ঠ যে যুগে ছিলেন—অর্থাৎ কবি ভবভূতি যে যুগের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—সেই যুগে এই রূপ রীতি ছিল কি না?

(গ) যদি রামায়ণের কবি বাল্মীকির যুগের এইরূপ চিত্র হয়, তবে—বাল্মীকির রামায়ণে এই রীতির উল্লেখ নাই কেন?

(ঘ) ভবভূতি কি সূত্রযুগের সমাজ রীতির আদর্শ রাম-চরিত অঙ্কনে গ্রহণ করিয়াছিলেন?

(গ) না, বৌদ্ধ ধর্ম্মের সমর্থন করিতে যাইয়া হিন্দুর গ্লানি ঘোষণা করিবার জন্যই প্রবাদ কথার উপর এইরূপ একটা চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিলেন?

কবি ভবভূতির এই চিত্রটী এইরূপ নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। রামায়ণের বর্ণনায়ও এইরূপ বিবিধ সমস্যা সৃষ্টির অবকাশ আছে। এইরূপ সমস্যার মীমাংসা সহজ না হইলেও, ইহার কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যে নিরর্থক, তাহা নহে।

ভারতের ইতিহাস নাই একথা অলীক।

ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই—এই কথাটী অধুনিক ইয়ুরোপের নবীন জাতি সমূহের নূতন ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর তুলনায় বিচার করিয়া বলিলে সমীচীন হইবে না; জগতের প্রাচীন জাতি-সমূহের পুরাতন সংগ্রহাবলীর তুলনায় বিচার করিয়া বলিতে হইবে। সেরূপ তুলনা করিয়া বিচার করিলে—ভারতের ইতিহাস নাই—একথা স্বীকার করা যায় না।

কতকগুলি রাজার নাম, ঘটনার সন-তারিখ, বা যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাস নহে। তেমন উপকরণ সম্বলিত গ্রন্থ ইতিহাস হইলে, অথবা ঋষি কথিত সংজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্ত-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষোপদেশপূর্ণ গ্রন্থগুলি ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভের যোগ্য হইলে, ভারতের বিপুল পুরাণ গ্রন্থাবলীকেই সেই মর্য্যাদা দান করা যাইতে পারে।

পুরাণগুলিতে যে ঐতিহাসিক উপাদান নাই, তাহা বলা যাইতেছে না। পুরাণগুলিতেও প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক উপাদান সঞ্চিত আছে। থাকিলেও পুরাণ গ্রন্থগুলি—ব্রাহ্মণ, সূত্র, স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন সমাজ বিধানগুলির ন্যায় কোন নির্দ্দিষ্ট যুগের যুগ-ধর্ম্মের বাণী প্রচার করে

না। আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সংগৃহীত ইতিহাসের সহিত তুলনায় ও বিচারে হিরেডোটাস, জেনেথো ও সোইকুঁইচুঁর ইতিহাসের যে মূল্য—আমাদের পুরাণ গ্রন্থগুলিরও সেই মূল্য। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থগুলি কিন্তু সে শ্রেণীর নহে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের আলোচনায়ও ব্রাহ্মণ এবং সূত্রের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ফলতঃও সমাজের রীতিনীতির ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। এই হিসাবে ভারতের ইতিহাস নাই—একথা স্বীকার করা যায় না। বরং ভারতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সমাজের রীতি-নীতির ও সমাজ-ধর্ম্মের ইতিহাস (বেদ, ব্রাহ্মণ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে) যত অধিক আছে, অন্য কোন প্রাচীন দেশের বা প্রাচীন জাতির কোন কিছুতেই তত অধিক নাই।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনা উপলক্ষেই বলিয়াছেন—

"The two together (Ramayana & Mohabharata) give us a true and graphic p cture of ancient Indian life and civilisation ; and no nation on earth has preserved a more faithful picture of its glorious past." "The Epic of Rama &c"

অর্থ—রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানা মহাকাব্য আমাদিগকে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সমাজ জীবনের যেরূপ সত্য ও বিস্তৃত চিত্র প্রদান করে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই তাহাদের অতীত গৌরবময় জাতীয় জীবনের এইরূপ বিশ্বাস যোগ্য কোন চিত্র রাখিয়া যায় নাই।

সত্যবটে, পুরাণগুলির ন্যায় কাব্যগুলিতেও অনেক অলীক, অস্বা-

ভাবিক ও অনৈতিহাসিক উক্তি আছে এবং সে গুলি কোন দেশ বা জাতির প্রকৃত ইতিহাস নহে; তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি সেকালের কাব গুলির বর্ণিত উক্তির সহিত বেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্র—এই তিন যুগের সমাজ সাহিত্যে কথিত তিনটী বিভিন্ন সমাজ-রীতির ও যুগ-ধর্ম্মের তুলনা করিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে সেই কাব্যগুলি হইতেও সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতির ও যুগধর্ম্মের ইতিহাস উদ্ধার করা যাইতে পারে। এবং এই পন্থাই কাব্য হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সঙ্কলনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

কাব্য হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সঙ্কলনের উপায়।

কবি ভবভূতি যে সময়ের ও যে সমাজের যুগ-ধর্ম্মের পরিচয় তাঁহার উত্তররাম চরিতের অতিথি সৎকার উপলক্ষে প্রদান করিয়াছেন, ভবভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী, পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক যুগ-সাহিত্যের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া উত্তর-রাম চরিতে বর্ণিত সেই সমাজের সময় নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরা মহাকবি বাল্মীকির সময় ও সমাজ নির্দ্দেশে এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপ যুগ-সাহিত্যে বর্ণিত যুগ-ধর্ম্মের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইবে, তাহাই যে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য এবং অবিসংবাদী মীমাংসা হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। প্রণালীটী ঐতিহাসিক-তত্ত্ব নির্ণয়ের একটী বিশিষ্ট পন্থা—এই মাত্রই বলা যাইতে পারে।

মীমাংসা অবিসংবাদী না হইবার এবং আলোচনায় একে অন্যের মধ্যে মতভেদ হইবার প্রধান কারণ—আলোচকদিগের বিচার বুদ্ধির পার্থক্য। যে সমালোচক যেরূপ বিচার বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা সেই পন্থায় অগ্রসর হইবে।

ঐতিহাসিক আলোচনা বা সমালোচনা নিরপেক্ষ হইতে পারে; কিন্তু সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ হইতে পারে না—তেমন হওয়া অস্বাভাবিক। সিদ্ধান্তে নিরপেক্ষতা রক্ষিত না হইবার পক্ষে সাধারণতঃই তুইটী প্রতিবন্ধক থাকে।

প্রথম নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে নিজ কল্পিত সিদ্ধান্ত প্রমাণের চেষ্টা; দ্বিতীয় নিজ বিচার বুদ্ধির সমর্থন। প্রথমোক্ত প্রণালী—অর্থাৎ নিজের সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য প্রমাণ সংগ্রহের প্রণালী—অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। ইহা দ্বারা অনেক অপসিদ্ধান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; তাহার ফলে প্রকৃত তত্ত্বের আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার নাম অবরোহ প্রণালী।

সিদ্ধান্ত নির্ণয় প্রণালীর দোষ-গুণ।

দ্বিতীয় প্রণালীতে নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু তাহাই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা—ইহা "আরোহ" প্রণালী। এই প্রণালীতে অকপট বিচার বুদ্ধির প্রভাবে সদযুক্তির আশ্রয়ে, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা যায়।

রামায়ণের আলোচনা দ্বারাই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। রামায়ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যুগের এবং পুরাণ যুগের—উভয় যুগেরই বিস্তর নিদর্শন রহিয়াছে। রামায়ণ পাঠ করিয়া যদি কেহ অকপট ভাবে বিশ্বাস করেন—রামায়ণ পৌরণিক যুগের রচনা—এবং এই বিশ্বাসে তিনি যুক্তি মার্গের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেই সরল বিশ্বাসে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা, তাঁহার পাক্ষপাত চেষ্টা হইলেও উত্তম চেষ্টা। আবার যিনি রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ যুগের নিদর্শন সমুহ পাইয়া সেই সমুদয়ের সমর্থনে—সদযুক্তির আশ্রয়ে কোন সিদ্ধান্তে

আরোহ প্রণালী।

উপনীত হন, তাহা প্রথমোক্ত আলোচনার বিরোধী হইলেও—ঠিক তেমনি প্রসংশিত চেষ্টা। এই অকপট আলোচনার ফল পরস্পর বিরোধী হইলেও উভয়ই আরোহ প্রাণালীর বিচার। এরূপ বিচারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন এ স্থলে অনাবশ্যক। অবরোহ প্রণালীরই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অবরোহ প্রণালীর দৃষ্টান্ত—হুইলারের রামায়ণ আলোচনা।

ঐতিহাসিক হুইলারের রামায়ণ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগুলি অবরোহ প্রণালীর বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের ধারা এইরূপ। হুইলার সাহেবের বিশ্বাস হিন্দুরা গো-মাংস ভোজী ছিলেন। এই ধ্রুব বিশ্বাস, লইয়াই হুইলার রাময়ণের সমাজ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথচ রামায়ণে কোন স্থানেই গো হত্যার কথা বা গো মাংসের উল্লেখ নাই। এখন উপায়? উপায় "গো" শব্দের উল্লেখ রামায়ণের বহু স্থানে আছে। হুইলার যে স্থানেই "গো" শব্দের উল্লেখ দেখিয়াছেন, সে স্থলেই তাহার অদ্ভুত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা দশরথ পুত্র বিবাহের প্রাক্কালে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিয়া গো-দান করিয়াছিলেন; সীতা গঙ্গাকে মদ্য ও গো দান সঙ্কল্প করিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের 'গো-দানকে' হুইলার "খাদ্যের উদ্দেশ্যে দান" কল্পনা করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা "রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম" প্রসঙ্গে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা করিয়াছি। অবরোহ প্রণালীর আলোচনায় এইরূপ কু-তর্কের উদ্ভব হয় এবং অপসিদ্ধান্তই নির্ণিত হইয়া থাকে; প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ের কোন চেষ্টা বা সাহায্য হয় না।

ঐতিহাসিকের পক্ষে আরোহ প্রণালীই উৎকৃষ্ট, সুতরাং অবলম্বনীয়। এই প্রণালীতে তত্ত্ব সঙ্কলনের চেষ্টাতেই যে কোন সত্যে উপনীত

হওয়া যাইবে, সে কথাও সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে না।

ঐতিহাসিকের আলোচনা—দার্শনিকের দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনার ন্যায় যুক্তির বলে সত্যের সন্ধান দিতে পারে, ইতিহাস-প্রিয় পাঠকের মনে শান্তি দিতে পারে, নূতন তত্ত্ব প্রদান করিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সত্যে পঁহুছাইতে পারে কি না সন্দেহ। সত্যে পঁহুছাইতে না পারিলেও ঐতিহাসিকের যুক্তির ও তত্ত্বানুসন্ধানের যথেষ্ট মূল্য আছে।

এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল।

অধ্যাপক ওয়েবার মনে করেন—আর্য্যদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয় ও তথায় কৃষি বিস্তারের রূপক কল্পনাই কবি বাল্মীকির রামায়ণ কল্পনার মূল উপাদান। ওয়েবারের এই মতে অনেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিত ব্যক্তি সায় দিয়াছেন ও দিতেছেন। এই মতেরই সমর্থন করিয়া ভারত গৌরব ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার History of Civilization in Ancient India" গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের শেষ মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"The Ramayana then, like the Mohabharata is utterly valueless as a narrative of historical events and incidents. As in the Mohabharata, so in the Ramayana the heroes are myths pure & simple."

ভারতের গৌরব বলিয়া যাঁহাকে সমগ্র ভারতবাসী শ্রদ্ধার অঞ্জলী দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই, মাতৃভূমির ইতিহাস আলোচনায় যাঁহার নাম সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়, এই প্রবন্ধালোচনায় যাঁহার উক্তি পরম গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাদৃশ মহাপ্রাজ্ঞ এবং সম্মানিত ব্যক্তিও যে কাব্যদ্বয়কে এক তুড়িতে "Myth pure and simple" বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই—প্রত্যক্ষদর্শী

ব্যক্তির সাক্ষ্যপ্রমাণ ব্যতীত আর কোন বিশিষ্ট উপায়ে সেই দুই কাব্যের বর্ণিত কাহিনীকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে? এ বিষয়ের সমর্থনে যুক্তি পূর্ণ প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে; লিখিয়াছেনও বহু মনীসী ব্যক্তি; কিন্তু তদ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে কি? রমেশ বাবুই প্রথম জীবনে যে মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, শেষ জীবনে তাহা ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন কি? যে ঘটনার বিশ্বাস যোগ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ অভাব, সরল ভাবে সে ঘটনাকে কেহ সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে চাহিলে, বাদ প্রতিবাদের সাহায্যে তাহাকে সেই বিষয়ের সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত করানর চেষ্টা বৃথা।

প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের কোন বিরোধিয় বিষয়ের মীমাংসাতো অসম্ভবই, বর্ত্তমানের ঘটনাও যে সময় সময় বিষম সমস্যা পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায় বিগত যুদ্ধের প্রাত্যহিক সংবাদ গুলি সংবাদ পত্র পাঠককে তাহা বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছে। স্যার ওয়ালটার র‍্যালের পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলন সম্বন্ধীয় সুপরিচিত গল্পটীও তাহার আর একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত। *

কোন বিরোধ না থাকিলেই যে কোন ঘটনাকে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত

* কথিত আছে সার ওয়াল্টার যখন প্রথম পৃথিবীর ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময় এক দিন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি জানালা দিয়া প্রকাণ্ড জনতা দেখিয়া ক্রমে তিনটী ভৃত্যকে ব্যাপার জানিয়া আসিতে পাঠাইলেন। তাঁহার সেই তিন ভৃত্য ক্রমে আসিয়া তিনটী বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ প্রদান করিল (অর্থাৎ ব্যাপারটী কেহই গিয়া দেখিতে পারে নাই, লোক মুখে যে ব্যক্তি যাহা শুনিয়াছে—সে আসিয়া তাহাই বলিয়াছিল।) প্রকাশ্য দিবা-লোকে তাঁহার নিজ গৃহের সম্মুখে ঘটিত ব্যাপারেরই এইরূপ বিরোধী বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সার ওয়াল্টার ইতিহাস রচনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার লিখিত পৃষ্ঠাগুলি নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

করিতে হইবে, তাহাও সমীচীন ব্যবস্থা নহে; কেন না বিরোধহীন বহু অসত্য ঘটনার বর্ণনাও যে ইতিহাস আপনার বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া সমাজের শ্রদ্ধাই লাভ করিতেছে—এরূপ দৃষ্টান্তও জগতের ইতিহাসে বিরল নহে।

যাহা হউক ইতিহাস প্রকৃত সত্য নির্ণয়ে সমর্থ হউক বা না হউক—তাহার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা যে সত্যের সন্ধান দিতে পারে, ইতিহাস পাঠকের মনে শান্তি ও সন্তনা দিতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অসত্য মতও উপযুক্ত যুক্তির প্রভাবে সমাজের শ্রদ্ধার সামগ্রী হইতে পারে।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, গ্রন্থান্তরে তাহার আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে—রামায়ণ কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেই আলোচনা করা গেল। এবং কি উপায়ে কাব্য হইতে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে ও এই গ্রন্থে সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করা গেল।

ঐতিহাসিক নিজকে কাব্য প্রভাব ও ধর্ম্ম প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রাখিয়া কাব্য হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ চয়ন করিবেন।

আলোচনার আভাস।

পর্ব্বতের পক্ষ ছিল কি না, বানরী সঙ্গীত গাইতে পারিত কি না, শিলা জলে ভাসিত কি না—এইসকল বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত হইয়া ঐতিহাসিক যদি কেবল ধর্ম্মভীরুতা ও ভাব প্রবণতার প্রভাবে বিনা বিচারে তাহা সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন, এই যুক্তির যুগে যে তাহার এই ঘোষণা অতি অশ্রদ্ধার সহিত অবহেলিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

রামায়ণের কবি একটা জাতির বা দেশের বা সমাজের ইতিহাস লিখিবেন মনস্থ করিয়া রামায়ণ রচনা করেন নাই। তেমন উদ্দেশ্যে রচিত কবি

কহ্লন মিশ্রের রাজতরঙ্গিনীতেও অলীক এবং অস্বাভাবিক বর্ণনার অভাব নাই। কবির লেখনী মুখে সেরূপ বর্ণনা অবশ্যম্ভাবী। বাল্মীকি, কবির সেই নিরঙ্কুশ আসনে বসিয়া কল্পনার দিব্য-দৃষ্টিতে কাব্য লিখিয়াছিলেন, একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া লইয়াই আমরা বলিতেছি, রামায়ণ কাব্য হইলেও তাহা ইতিহাস; সেই কাব্যের প্রতি কথায়-যুগ-ধর্ম্মের আভাস বিদ্যমান রহিয়াছে। বাল্মীকি যে সমাজ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার কল্পনা-মুখে সেই সমাজেরই জ্বলন্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার কাব্যে বা গীতে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ও শেষ বয়সে রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে এইরূপ কথাই অতি গর্ব্বের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"The Ramayana embodies the domestic & religious life of ancient India with all its tenderness & sweetness, its endurance and devotion. The one picture without the other were incomplete; and we should know but little of the ancient Hindus if we did not comprehend their inner life and faith as well as their political life & their warlike virtues." (The Epic of Rama, Prince of India.)

কবি বাল্মীকির সময়ের সমাজ-ধর্ম্ম ও যুগ-ধর্ম্মের চিহ্ন কিরূপ ভাবে তদীয় চিন্তার আশ্রয়ে রামায়ণের গর্ভে নিহিত আছে, এই গ্রন্থের এই দ্বিতীয় অংশে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা কি প্রণালীতে প্রাচীন যুগ-সাহিত্যে বর্ণিত সমাজ-ধর্ম্মের সহিত তুলনায় বিচার করিয়া কাব্যের বর্ণনাকে ইতিহাসের মর্য্যাদা দান করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে তাহাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলাম মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রামায়ণের সমাজ-ধর্ম্ম।

মানব সমাজবদ্ধ হইয়া যে নৈতিক বিধির উপর সেই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে, তাহাই তাহার সমাজ-ধর্ম্ম। ঐ নৈতিক বিধিই ব্যষ্টি ভাবে ব্যক্তিকে এবং সমষ্টি ভাবে সমাজকে রক্ষা করিয়া থাকে; সুতরাং সমাজ পরিচালনের যে ব্যবস্থা তাহাই সমাজ-ধর্ম্ম। এই সামাজিক ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই সমাজ আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়;—সেই সমাজ নীতির হিসাবে কত উন্নত বা কত অবনত, তাহা অপর বাহিরের সমাজ বুঝিতে পারে; অনাগত ভবিষ্যতের সমাজও বর্ত্তমান এবং অতীতের তুলনার আলোচনায় অবগত হইতে পারে।

সমাজ-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বৈবাহিক সম্বন্ধ। বৈবাহিক পদ্ধতি বা যৌন-সম্বন্ধ-রীতি যে জাতির যত উন্নত, জগতে সে জাতির সমাজ-ধর্ম্মের ভিত্তি তত সুদৃঢ় এবং ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ তত উচ্চ।

সমাজ স্থাপনের সঙ্গেসঙ্গেই সমাজ-ধর্ম্ম উন্নত পর্য্যায়ে আরব্ধ হয় নাই। উন্নতি ক্রমবিকাশেরই ফল। ক্রম বিকাশের ফলে মানব সমাজ যে চিরদিন উন্নতির পথেই ধাবিত হইতে থাকে, তাহাও আবার অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উন্নতির পর অবনতি, আবার অবনতির পর উন্নতি; এই রীতিই সমাজ-গতির পদ্ধতি। জাতির উন্নতি ও অবনতির সহিত সমাজ-গতি অলঙ্ঘ্য ভাবে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য সমাজ কিরূপ নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল, বেদে তাহার সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত না থাকিলেও, তাহাতে তাহার আভাস আছে।

বৈদিক যুগের পরেই ব্রাহ্মণ যুগ। ব্রাহ্মণ যুগের "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ গুলির নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, তখন বেদের ইঙ্গিত সমূহই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। এই যুগে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। এই যুগে যে সমস্ত গীত ও বিধান রচিত হইয়াছিল, তাহা বেদমন্ত্র সমূহের ন্যায় মুখে মুখেই রচিত হইয়াছিল। গীতগুলি যুগের পর যুগ জন-গণের স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া তাহার সামান্য অংশ সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে; ব্রাহ্মণগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।[১] রামায়ণ সেই গীত রচনারই রক্ষিত অংশ মাত্র। ব্রাহ্মণ যুগের ভারতীয় সমাজ-ধর্ম্মের চিত্র রামায়ণে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রামায়ণের বর্ণনার ভিতর আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা থাকিলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে তাহা হইতে তৎকালের প্রকৃত সমাজ-ধর্ম্মের অবস্থা অবগত হওয়া যাইতে পারে।

রামায়ণ-সমাজের পর আর্য্য সমাজের সমাজ ধর্ম্মে কোন্ কোন্ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারতে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণের আভাসও তাহাতে রহিয়াছে।

রামায়ণের যুগে আর্য্য ভারতে যে সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সে সমাজে স্পষ্ট বিশেষ কোন আবিলতা দৃষ্ট হয় না। বৈদিক সমাজের ভিতর যে আদিম বিশৃঙ্খল ভাবের আভাস পাওয়া যায়, এই সমাজের দেহ হইতে তাহা তখনও যেন একেবারে মুছিয়া যায় নাই; সমাজ নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিলে যেমন বাহিরে বেশ উজ্জ্বল দেখায়, অথচ তাহার অভ্যন্তরে প্রাচীন

১ ব্রাহ্মণযুগে তিন্ন বেদের মাত্র তিন খানা ব্রাহ্মণ ছিল। বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্রে ১।১।১।৪ দ্রষ্টব্য।

আপস্তম্ব বলেন—"সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণগুলি নাই।" ... আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১।৪।১২।১০ দ্রষ্টব্য।

শিকর-বদ্ধ কুপ্রথাগুলি লুপ্ত ভাবে গুপ্ত থাকে, ঠিক এইরূপ ভাবে এই সমাজের চিত্রটী পাঠকের নিকট রামায়ণে উদ্ভাবিত হইবে।

কি সামাজিক শৃঙ্খলা, কি আচার ব্যবহার, কি বিবাহ পদ্ধতি, কি রীতি-নীতি—সমস্ত বিষয়েই যেন রামায়ণের সমাজ সদ্য প্রবর্ত্তিত সরল সমাজ বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত একটী আদর্শ অথচ অসম্পূর্ণ সমাজ। ইহার উপর যে কবির লেখনী-প্রভাব নাই—ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কাব্যের অতিশয় উক্তি ও আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টার ভিতর হইতে প্রকৃত সমাজ-তত্ত্ব সংগ্রহের যে উপায় আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, রামায়ণের সমাজ আলোচনায় আমরা সেই উপায়, যতদুর সম্ভব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

রামায়ণের প্রধান সামাজিক ক্রিয়া—সীতার বিবাহ। এই বিবাহের অনাবিল চিত্রটী রামায়ণের সমাজকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বিবাহের চিত্রটী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রদত্ত হইবে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে সমসাময়িক সমাজ-ধর্ম্মের অনুমোদিত সাধারণ অনুষ্ঠান গুলির কথায়ই আলোচনা করা যাইতেছে।

শুল্ক বা পণ প্রথা।

বিবাহে শুল্কের উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। সীতাকে পাত্রস্থ করার সম্বন্ধে রাজা জনক নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন—

"বীর্য্য শুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা" ১৫।১।৬৬

অর্থ—আমি আমার এই অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্য-শুল্কা করিয়া রাখিয়াছি; অর্থাৎ যিনি নিজ বীর্য্য দেখাইয়া এই ধনুতে জ্যা রোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনিই কন্যা লাভ করিবেন।

ইহাও একটী পণ। এই পণের নাম ধনুর্ভঙ্গ-পণ। রাজা দশরথকে কৈকেয়ীর পাণি গ্রহণ করিতে অন্য প্রকারের আর একটী পণে আবদ্ধ

হইতে হইয়াছিল। সে পণ ছিল—রাজ্য শুল্ক। (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৭। ৩) সুতরাং পণ প্রথাটী সামাজিক হিসাবে খুব প্রাচীন। কালে কালে পণের যে প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা সূত্র-গ্রন্থগুলি হইতে অবগত হওয়া যায়।

সূত্রযুগের ব্যবস্থা, মতভেদ।

কোন কোন সূত্রগ্রন্থে অবগত হওয়া যায়—পণ প্রথাটী বৈদিক কালেও প্রচলিত ছিল। কোন কোন সূত্রকার আবার ইহা বেদ-বিরুদ্ধ-প্রথা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বসিষ্ঠ-ধর্ম্ম-সূত্রকার [২] প্রথমোক্ত মতের সমর্থক; বৌধায়ণ-ধর্ম্ম-সূত্রকার দ্বিতীয় মত প্রচার করিয়াছেন। [৩] বসিষ্ঠ ছয় প্রকার বিবাহ প্রথার মধ্যে পণ দ্বারা কন্যা গ্রহণকে মনুষ্য-রীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৌধায়ন বলিয়াছেন—"অর্থ দ্বারা ক্রীত স্ত্রী ধর্ম্ম পত্নীই নহে। সে দাসী; যজ্ঞে তাহার অধিকার নাই। অন্যান্য সূত্রকারগণ মধ্যপন্থী। আপস্তম্ব ধর্ম্ম-সূত্রকার বরকে কন্যা কর্ত্তার সন্তোষ বিধান করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। [৪] আপস্তম্বও বেদের দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু কোন সূত্রকারই কোন বেদ-মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা সমর্থন করেন নাই। ঋকবেদে সূর্য্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে ঋক-মন্ত্রগুলি আছে, তাহাতে উভয় পক্ষেরই উপঢৌকনের উল্লেখ আছে। [৫] কোন কোন গৃহ্য-সূত্রকার (সাংখ্যায়ণ ও পারস্কর) শুল্কের উল্লেখ করেন নাই; উপঢৌকন বা যৌতুকের উল্লেখ করিয়াছেন। [৬] বর কন্যা কর্ত্তাকে

---

২ বসিষ্ঠ ধর্ম্ম-সূত্র ১। ৩৫, ৩৬
৩ বৌধায়ণ ধর্ম্মসূত্র ১। ১১। ২১। ২
৪ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২। ৬। ১৩। ১২
৫ ঋক্‌বেদ ১০। ৮৫। ৩১ (বরপক্ষের উপঢৌকনের উল্লেখ)
ঋকবেদ ১০। ৮৫। ১৩ (কন্যার পিতামাতা প্রদত্ত উপঢৌকনের উল্লেখ।)
৬ সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ১। ১০। ১৬; পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১। ৮। ১৮

একশত গাভী ও এক খানা রথ যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিবে। যৌতুকের এই প্রকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে বোধায়ন ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-সূত্রকারও গৃহ্যসূত্রকারগণের মধ্যে সাংখ্যায়ন ও পারস্কর এক মতাবলম্বী।

মহাভারতে কন্যাপণ।

মহাভারতেও কন্যাপণ প্রথার দৃষ্টান্ত আছে। মাদ্রীর ভ্রাতা শৈল্যের আচরণে তাহা অবগত হওয়া যায়। অবশ্য মহাভারতে শৈল্যের মুখে এই প্রথাকে নিন্দিত প্রথা বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে।[৭] এসম্বন্ধে স্মৃতিকারগণের মতও ঐক্যসম্পন্ন নহে।

স্মৃতির মত।

মনু কন্যাপণে আপত্তি করেন নাই বটে[৮] কিন্তু আপস্তম্ব স্মৃতি[৯] ও অত্রি স্মৃতি[১০] ঐ প্রথাকে প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অত্রি বোধায়নের ন্যায় শুল্ক-ক্রীতা স্ত্রীকে ধর্ম্ম পত্নী বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

বিভিন্ন সমাজে বেদ-মন্ত্রের অর্থ গ্রহণে মত-বৈষম্যতাই যে এইরূপ মত ভেদের কারণ ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মনে হয়, কন্যার পিতা স্বীয় কন্যাকে কিরূপ স্থলে সম্প্রদান করিবেন—এসম্বন্ধে তাঁহার নিজের মনে একটা সঙ্কল্প থাকা খুব

স্বাভাবিক পণের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

স্বাভাবিক। কন্যাপণের এই সঙ্কল্পই কালে কন্যা-শুল্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন বীর্য্য প্রদর্শনের যুগে শক্তির পরিচয় ছিল পণের একটা প্রকার; সূত্রগ্রন্থসমূহে যে যুগের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে পণ শুত

---

৭ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১১৩ অধ্যায়।

৮ মনুসংহিতা ৯। ৯৩, ৯৭

মনু শূদ্রকে কন্যা বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

৯ আপস্তম্ব স্মৃতি ৯। ২৫

১০ অত্রি সংহিতা ৩৮০ শ্লোক।

সংখ্যক ধেনু ও একটি রথ ধার্য্য হইয়াছিল। মহাভারতে মদ্র-রাজের মুখে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের কথা শুনা যায়। মহাভারতে বীর্য্য শুল্কের পরিচয়ও দ্রৌপদীর বিবাহের ঘটনায় প্রদত্ত হইয়াছে—উহা প্রাচীন রীতিরই অনুসরণের দৃষ্টান্ত। মহাভারতে যে মুদ্রা-পণ বা কন্যা বিক্রয় প্রথার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, রামায়ণে তাহা নাই। স্মৃতিতে এইরূপ ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধেই মতামত প্রদত্ত হইয়াছে। ধেনুর পরিবর্ত্তে যে যুগে সমাজে অর্থই বিনিময়ের উপাদান হইয়াছিল, স্মৃতিতে সেই যুগের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রামায়ণের যুগ-লক্ষণে তেমন উপাদান নাই।

রাম নিজ শক্তির পরীক্ষা দ্বারা জনকের সঙ্কল্প বা পণ পূর্ণ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই যোগ্যতারই নাম ছিল সে কালে—শুল্ক।

স্বয়ম্বর।

রাম-সীতার এই বিবাহ অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিয়া হইয়াছিল। এইরূপ হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণে সীতাকে 'স্বয়ংবরা' বলা হইয়াছে। স্বয়ংবর-বিবাহ-রীতি খুব প্রাচীন নহে। প্রকৃত প্রস্তাবেও বাল্মীকির সীতা স্বয়ংবরা হন নাই ; বরং রামায়ণের একটী স্থানে স্বয়ংবর বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদিকাণ্ডে ৩২ সর্গের একটী বর্ণনায় আছে—বায়ু কুশনাভ কন্যাগণের পাণি প্রার্থনা করিলে কন্যারা বায়ুকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

রামায়ণে স্বয়ংবরের নিন্দা।

"মা ভূৎ স কালো দুর্ম্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্ম্মেণ স্বয়ংবর মুপাস্মহে॥ ২১
পিতাহি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ।
যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ২২।১।৩২

অর্থ—রে দুর্ব্বুদ্ধে জনকই আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা,

তিনি যাঁহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের পতি হইবেন। কাম বশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ংবরা হইবার প্রবৃত্তি যেন কখনও উপস্থিত না হয়।

ইহাতে স্বয়ংবরের নিন্দাই সূচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের চিত্র--যাহা মহাভারতের দ্রৌপদীর বিবাহে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও স্বয়ংবর বিবাহ রীতির দৃষ্টান্ত নহে। সুপ্রাচীন ভারতে পুরুষের পক্ষেও 'পিতৃকৃত পত্নী' ব্যবস্থাই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বেদে অভিভাবক সম্মত বিবাহ।

ঋকবেদে অভিভাবক সম্মত বিবাহের সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তখন পিতা সবস্ত্রা ও সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন;[১১] পিতার স্থলে (পিতার অভাবে) ভ্রাতাও ভগ্নীকে বহু ধনসহ সম্প্রদান করিতেন।[১২] বেদে যৌবন বিবাহ এবং বাল্যবিবাহ উভয় বিবাহেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীনতম সমাজে এইরূপ থাকাই স্বাভাবিক।

সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলে পর, যৌবন বিবাহ সমাজে আপত্তিজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ আমরা পাই—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র সমূহে।

সূত্র গ্রন্থে নগ্নিকা বিবাহ।

ধর্ম্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রকার—গৌতম, বসিষ্ঠ, বোধায়ন, গোভিল, হিরণ্যকেশীন প্রভৃতি সকলেই বালিকা বা 'নগ্নিকা' বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।[১৩]

রামায়ণ রচনারকাল, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র রচনার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী এবং

---

১১ ঋকবেদ ৯। ৪৬। ২ ও ১০। ৩৯। ১৪

১২ ঋকবেদ ১। ১০৯। ২

১৩ গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৮। ২০–২৩; বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭। ৭০; বোধায়ণ ধর্ম্মসূত্র ৪। ১। ১১; গোভিল গৃহ্য সূত্র ৩। ৪। ৬; হিরণ্যকেশীন গৃহ্যসূত্র ১। ৬। ১৯। ২

বৈদিক কালের অনেক পরবর্ত্তী সময়। রামায়ণেও আমরা সীতাকে বালিকা বয়সেই বিবাহিতা হইতে দেখিতেছি। কন্যা, কুমারী বা নগ্নিকা-বালিকাদের বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত থাকে সেই সমাজে সেই নগ্নিকা বালিকাদের স্বইচ্ছায় পাত্র মনোনয়ন করিয়া বিবাহ করিবার যে স্বেচ্ছাচার স্বয়ংবর-বিবাহ-রীতি, তাহা কথনই ব্যবস্থিত থাকিতে পারে না।

বালিকার পক্ষে বর নির্ব্বাচন অস্বাভাবিক।

কিন্তু আমাদের সমাজে স্বয়ংবরের সংস্কার এত বদ্ধমূল, যে দুই একখানা ধর্ম্মসূত্রের ব্যবস্থার দোহাই দিয়াই তাহা সাধারণের মন হইতে উন্মুলিত করিয়া দিবার উপায় নাই।

এইরূপ স্থলে প্রতিকূল ও অনুকূল প্রমাণের উল্লেখ দ্বারা বিষয়টীর আলোচনা প্রয়োজন। এস্থলে তাহাই করা হইল।

ঋকবেদে পুরুষ নির্ব্বাচনের আভাস সূচক একটী ঋক্ আছে। ঐ ঋক্‌টীর প্রথমাংশ নীচ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ সংগ্রহ সম্বন্ধীয়, শেষ অংশ ভদ্র মহিলাদের সম্বন্ধীয় বলিয়া স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন। তাঁহার কৃত শেষ অংশের অনুবাদ এইরূপ—

বেদে নির্ব্বাচনের আভাস ও বিভিন্ন মতের আলোচনা।

যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।" ১৪

ইহা আদিম সমাজের বয়স্কা স্ত্রীলোকের অবাধ যৌন সম্মিলন প্রথার একটী দৃষ্টান্ত। এই ঋক্‌টীর অনুবাদ মূইর সাহেব এইরূপ করিয়াছেন— "Happy is the female who is handsome, she herself loves (or chooses) her friend among the people." এই অনুবাদ প্রদান করিয়া মূইর স্বীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন—"May we not

১৪ ঋকবেদ ১০।২৭।১২

infer from this passage that freedom of choice in the selection of their hnsbands was allowed, some times at-least to women in those times."[১৫]

মুইর সাহেবের অনুবাদের সাহায্য লইলে এই ঋকাংশকে মোটেই ভদ্র সমাজের রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তিনি সুন্দরী স্ত্রীলোকের প্রণয়ী সংগ্রহেরই আভাস দিয়াছেন। ইহা আদিম যুগের Matriarchal সমাজের পুরুষ সংগ্রহ প্রথার ভাব লইয়া অনুদিত। মহাভারতের ১২২ অধ্যায়ে (আদিপর্ব্বে) এই আদিম রীতির আভাস আছে; তাহা এইরূপ —"পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিতা ছিল ; তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বামীদিগের অনিবার্য্যা হইয়া সম্ভোগ সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। যেহেতু ইহাই সেকালের ধর্ম্ম ছিল।"

বোধ হয় সেই রীতিরই আর একটু উন্নত ভাবের আভাস এই ঋকটীতে আছে। ঋক্ মন্ত্রগুলি এক সময়ে বা একযুগে রচিত হয় নাই। বৈদিক-যুগের প্রথম ভাগেও যে আদিম মানব সমাজে (বয়স্কা স্ত্রীলোকের) এইরূপ অবাধ যৌন রীতি প্রচলিত না ছিল, তাহা মনে হয় না।

থাকিলেও এইরূপ স্বেচ্ছাচার পদ্ধতিকে মহাভারতে অঙ্কিত কোন স্বয়ংবরের বা কালিদাস বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের তুল্য স্বয়ংবর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

ঋক্‌বেদের আর একটী ঋক্ হইতে ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য অনুমান করেন, বৈদিকযুগে স্বয়ংবর প্রথা ছিল। ঋক্‌টীর অনুবাদ এইরূপ— "যেরূপ (যজমান যজ্ঞার্থ) কুশ বিস্তার করে, যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণা

১৫ Sanskrit Text. Vol. V.

করিতেছি; তাঁহারা শত্রু সেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথ দ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিয়াছিলেন। ১৬

এই ঋকটীর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়নাচার্য্য অনুমান করেন, বিমদ নামক রাজর্ষি স্বয়ংবরে কন্যালাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাঁহাকে আক্রমণ করে। অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদিগের রথে বিমদের স্ত্রীকে বিমদের গৃহে পঁহুছাইয়া দেন।

রামায়ণে স্বয়ংবর শব্দটী প্রবিষ্ট হইয়াছে, যদিও রামায়ণের কোন কার্য্যেই তাহার প্রমাণ নাই। এস্থলে (বেদে) কিন্তু কার্য্যও নাই, "স্বয়ংবর" শব্দও নাই; সায়ন অনুমান করিতেছেন মাত্র।

যাস্ক সংগৃহীত বেদের নিঘণ্টুতে স্বয়ংবর শব্দ নাই।

বেদের ব্রাহ্মণে স্বয়ংবর কথা নাই; সূত্রগুলিতে পর্য্যন্ত স্বয়ম্বর বিবাহের কথা নাই।

প্রাক্‌বৈদিক যুগে, সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপনের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র যে হীন-ভাব প্রচলিত ছিল। তাহা বৈদিক যুগের সংস্কারে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল। সকল রীতিই যে সংস্কৃত হইয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা নহে। কোন কোন রীতি অপেক্ষাকৃত হীন ভাবেও সমাজে গৃহীত হইয়াছিল; ক্রমে কিন্তু তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

আদিম সমাজের লুপ্ত হীন-ভাব পৈতৃক গুরুতর ব্যাধির ন্যায় বহু পুরুষ পরেও কু সাহচর্য্যের সুযোগে অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

আমাদের মনে হয়, বয়স্থা মেয়েদের নিজের বিচারে পাত্র মনোনয়নের স্বেচ্ছাচার প্রথা, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগেই উঠিয়া গিয়াছিল। রামায়ণের যুগে বা কল্পসূত্রের যুগে তাহা ছিল না। অতঃপর—রামায়ণ

১৬ ঋকবেদ ১।১১৬।১

রচনার বহুকাল পরে, পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য চিন্তার সংশ্রবের ফলে খৃঃ পূঃ তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে বা ইহারও পরবর্ত্তী কোন সময়ে এই ভাব ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং ক্রমে পৌরাণিক অনুশাসনের প্রভাবে সমাজেও সেই প্রথা দুই এক স্থলে অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক যুগে সংযুক্তার স্বয়ম্বর ইহার দৃষ্টান্ত।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ কি না, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। এস্থলে সংক্ষেপে তাহা করা গেল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামায়ণের বহুস্থানে 'স্বয়ম্বর' শব্দটীর উল্লেখ থাকিলেও কাব্যের কোথাও ঐরূপ বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু যে সীতার বিবাহকে রামায়ণে পুনঃ পুনঃ 'স্বয়ম্বর' বিবাহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কোন অংশেই স্বয়ম্বর বিবাহ নহে। সীতা বীর্য্যশুল্কে গৃহীতা হইয়াছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে, রাম স্বীয় বীর্য্য পরীক্ষা দ্বারা জনককে সন্তুষ্ট করিলেও জনক দশরথের অনুমতি ব্যতীত কন্যাদানে স্বীকৃত হন নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই রীতির উল্লেখ ও আলোচনা করা হইল।

রামায়ণে সীতা রামের "পিতৃকৃত দারা" বলিয়া স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে ; যথা—

"প্রিয়া তু সীতা রামস্তদারাঃ পিতৃকৃতা ইতি।" ২৬ | ১ | ৭৭

সীতা রামের পিতৃকৃত পত্নী।

'স্বয়ংবর' কথা যদি বেদে নাই, ব্রাহ্মণে নাই, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্রে নাই, শ্রৌত সূত্রে নাই, তবে এরূপ কথা রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যগুলিতে আসিল কি প্রকারে?

আমাদের মনে হয়, বৈদেশিক ভাবের আদান প্রদানের সংশ্রবে আমরা এই বৈবাহিক রীতিটী প্রাপ্ত হইয়াছি। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর

পর হইতে নানা বিষয়ে গ্রীক সমাজ ও গ্রীক সভ্যতার প্রভাব ভারতে সূচিত হইয়াছিল। এই সময় গ্রীক সমাজের বহু রীতি-প্রথা ভারতীয় চিন্তার ভিতর প্রবেশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল। এই সুযোগে প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্যের স্বয়ংবর ভাবটীও (choice of husbsnd) আসিয়া আমাদের "পুরাণ" সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

স্বয়ংবর—প্রাশ্চাত্য রীতি।

কোন বৈদেশিক প্রাচীন সাহিত্যে কোন প্রথার উল্লেখ থাকিলেই যে সে প্রথা ভারতে থাকিতে পারিবে না, অথবা থাকিলে উহা সন্দেহ জনক বিবেচিত হইবে এবং ভারতকে সেই বৈদেশিক জাতির নিকট ঐ বিষয়ে ঋণী বলিয়া মনে করিতে হইবে, এরূপ মত একদেশদর্শী। বৈদেশিক জাতির প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ প্রাচীন সাহিত্যে যদি কোন বিষয়ের অনুরূপ উল্লেখ থাকে, আমরা তাহার গৌরবের দাবী কোন রূপেই ত্যাগ করিব না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে ধনুর্ভঙ্গ পণ, লক্ষ্য ভেদ পণ প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৈবাহিক পণ-রীতি গুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিচার আলোচনা।

ভারতীয় সুপ্রাচীন সাহিত্যের এইরূপ প্রথা গুলির অনুরূপ প্রথা, গ্রীক দেশের প্রাচীন সাহিত্যেও আছে। যেমন আইডেনিসাস পণ করিয়াছিলেন—যে তাঁহার অমিতবিক্রম কুকুরটীকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে, সেই তাঁহার কন্যা কোরিকে এই বীর্য্যশুল্কে ক্রয় করিতে পারিবে। Ulyssesও এইরূপ একটা বীর্য্যশুল্কের বিনিময়েই পেনি-লোপীকে পত্নীরূপে পাইয়াছিলেন।

এইরূপ দুইটী সুপ্রাচীন ইতিকথায় বা সমাজ-চিন্তায় যদি অনুরূপ ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে তাহাতে সাধারণের আশ্চর্য্যান্বিত

হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও এইরূপ ভাবসামঞ্জস্য অস্বাভাবিক নহে; মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মানব সমাজের অনুরূপ ভাবকে খুব স্বাভাবিক বলিয়াই মনে করেন।

রামায়ণের ধনুর্ভঙ্গ পণ খুব প্রাচীন প্রথারই পরিচায়ক। প্রাচীন গ্রীক চিন্তার ভিতরও অনুরূপ ভাব প্রবিষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, গ্রীকগণ প্রাচীন ভারতীয় প্রথারই অনুকরণ করিয়া তাহা নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সহিত মিলাইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য শস্ত্র-প্রীতি (ধনুর্ভঙ্গ), প্রতীচ্যের বৈশিষ্ট্য পশু-প্রীতি (কুকুর পরাজয়)।

এইরূপ স্থলে এই উভয় জাতির দাবীর বিচার চলিতে পারে।

"স্বয়ম্বর" প্রথা সম্বন্ধীয় আমাদের দাবী কিন্তু তেমন বিচার সহ নহে। আমাদের তেমন কোন প্রাচীন সাহিত্যে এই কুপ্রথাটীর উল্লেখ নাই, যেমন প্রাচীন সাহিত্যে, গ্রীকদের এই প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

গ্রীসের প্রাচীন কাহিনী লেখকেরা প্রাচীন গ্রীক সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারি, টিণ্ডোরাসের (Tindorus) ক্ষেত্রজ কন্যা হেলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর নর্ত্তকী ছিলেন। ইহার নর্ত্তন ভঙ্গি ও রূপ মাধুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া জনৈক যুবক তাহাকে হরণ করে। অতঃপর হেলেনার ভ্রাতা হেলেনাকে উদ্ধার করেন। তখন তাহার রূপের ও গুণের কথা শুনিয়া গ্রীসের রাজা ও রাজপুত্রেরা আসিয়া তাহার পাণি প্রার্থনা করিতে থাকেন। হেলেনার পিতা বিপন্ন হইয়া সমবেত রাজন্যগণকে এই সর্ত্তে সম্মত করেন যে হেলেনা নিজে যাহাকে ইচ্ছা করিয়া বরণ করিবে, তিনিই তাহার স্বামী হইবেন। এই ইচ্ছা-বরণ যিনি গ্রাহ্য না করিয়া বিরুদ্ধাচারী হইবেন, সমবেত রাজগণ হেলেনার স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন।

এইরূপ মীমাংসা হইলে রূপসী হেলেনা তাহার পূর্ব্ব পরিচিত স্পার্টার রাজকুমার মেনিলাসকে পতিত্বে বরণ করেন।

ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই মনে হইবে যে—পূর্ব্বে কোন নায়কের সহিত পরিচয় না থাকিলে, কেবল তাহার উপস্থিত রূপ দেখিয়া বা নাম শুনিয়া যে বিবাহ, তাহা ভারতীয় আর্য্য শাস্ত্রের ও চিন্তার বিরোধী এবং সেই জন্য আদিম মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণেতা মনু অষ্টবিধ আর্য্য-বিবাহ-রীতির ভিতর এই বিজাতীয় স্বয়ংবর-বিবাহকে গণ্য করেন নাই।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র যে যুগে যুগে যুগ-প্রভাব বক্ষে লইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্য সমাজে পাশ্চাত্য স্বয়ংবর প্রথা প্রবেশ করিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণও সমাজ-ব্যবস্থায় এই বিজাতীয় ভাবটিকে আপদ-ধর্ম্মের পর্য্যায়ে লইয়া স্মৃতির ব্যবস্থায়ও ইহার স্থান করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মনু অতঃপর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কন্যা ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে। ইহার পরও পিতামাতা সেই ঋতুমতী কন্যার বিবাহে উদাসীন থাকিলে, কন্যা নিজ পতি বরণ করিয়া লইবে, তাহাতে তাহার পাপ হইবে না। [১৭] গৌতম, বসিষ্ঠ প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিকারগণও তখন মনুর এই ব্যবস্থায় সায় দিয়াছিলেন। [১৮]

এই অবস্থা সমাজে সর্ব্বদাই ঘটিত। বিষ্ণু সংহিতায় এইরূপ কন্যাকে 'বৃষলী' বলা হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতা 'বৃষলীর' পক্ষে এই আপদ ধর্ম্মই গ্রহণীয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। [১৯]

১৭ মনুসংহিতা ৮ | ৯০।

১৮ গৌতম সংহিতা ১৮ অধ্যায়।

১৯ বিষ্ণু সংহিতা ২৪। ৪০, ৪১; বসিষ্ঠ ধর্ম্ম-সূত্রে (১ | ৬৭, ৬৯) এবং বৌধায়ন সূত্রেও (৪ | ১ | ১৪) এই মত গৃহীত হইয়াছে।

বৈদেশিক ভাব ও রীতির প্রভাব যে রক্ষণশীল আর্য্য সমাজের রীতি ও নীতির দৃঢ়তা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা এই গ্রন্থের বহু বিষয়ের আলোচনায়ই লক্ষিত হইবে।

এইরূপ অবস্থায় আমরা যদি স্বয়ংবর রীতিকে গ্রীক 'choice of husband' প্রথার অনুকরণে গৃহীত বৈদেশিক প্রথা বলিয়া সিদ্ধান্ত করি, তাহাতে আমাদের কোন অগৌরবের বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই বিজাতীয় ভাব ভারতীয় পুরাণ গুলিতেই সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হইয়াছিল! তারপর মহাভারতে নানা ভাবে নানা সংস্কারের সহিত গৃহীত হয়। এই সময়ই রামায়ণেও নিতান্ত অর্থ শূন্যভাবে 'স্বয়ম্বর' কথাটী স্থানে স্থানে প্রবেশ করিতে সুযোগ পাইয়াছিল।

ভারতীয় সাহিত্যে স্বয়ম্বর প্রথা।

আমাদের একবন্ধু প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যদি রামায়ণে বা কোন প্রাচীন সাহিত্যে স্বয়ংবর কথা নাই, তবে কালিদাস ইন্দুমতীর স্বয়ংবরের ইতিহাস পাইলেন কোথায় ?

রামায়ণে কেবল দশরথের পুত্রগণের আখ্যানই বিবৃত হইয়াছে; তাহাতে অজের বা তাঁহার স্বয়ংবর সভায় পত্নী লাভের কথা নাই। পুরাণগুলির মধ্যে যে সকল পুরাণে রঘুবংশ, সূর্য্যবংশ অথবা রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে, সেগুলির কোন এক খানিতেও অজের স্ত্রী ইন্দুমতীর নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুরাণ শব্দকোষে মান্ধাতার স্ত্রী ইন্দুমতীর (কোন মতে বিন্দুমতীর) নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন অবস্থায় কালিদাসের সৃষ্টি যে তাঁহার স্ব-কপোল কল্পিত, তাহা মনে করা ব্যতীত উপায় নাই।

সীতার বিবাহ স্বয়ংবর বিবাহ নহে; পূর্ব্বোক্ত কুশনাভের কন্যাগণ সম্বন্ধীয় গল্পটিও প্রক্ষিপ্ত।

স্বয়ংম্বর প্রথা ভারতে প্রচলিত হইলে, ভারতীয় সমাজে তখন যে

বিরোধী দল সৃষ্টি হইয়াছিল, কুশনাভের কন্যাগণের মুখে সেই দলেরই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে—মনে করা এস্থলে অসমীচীন হইবে না।

বিবাহের বয়স।

কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বয়ংবর বিবাহ হইতে পারে না। সীতা কি তবে বিবাহ কালে বালিকা ছিলেন?

রামায়ণে সীতার বিবাহের বয়সের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। রামায়ণের বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্নরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হইবে; রামের বিবাহ-বয়স সম্বন্ধেও এই এক পন্থাই অবলম্বনীয়।

বালকাণ্ডের বিংশ সর্গের দ্বিতীয় শ্লোকে রাজা দশরথের মুখে রামের বয়সের উল্লেখ পাওয়া যায়। আপাততঃ এ বয়স সংখ্যা অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিব। বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞ রক্ষার্থ শক্তিমান বীর-পুরুষ প্রয়োজন; তাই ঋষি বিশ্বামিত্র রামকে সেই যজ্ঞ রক্ষার্থ লইয়া যাইতে আসিয়া রাজা দশরথের নিকট তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন। শুনিয়া অপত্য বৎসল পিতার মন আশঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল; তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—

রামায়ণে রামের বয়স।

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥" ২।১।২০

দশরথ বলিলেন—'আমার রাজীবলোচন রামের বয়স ষোল হয় নাই—ঊনষোড়শ, আমি রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার তাহার শক্তি দেখিতেছি না,—ইত্যাদি।

এস্থলে অবগত হওয়া যাইতেছে, যখন রাম রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমন করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল, ঊন-ষোড়শ—অর্থাৎ ষোল

বৎসর অপেক্ষা ন্যূন। কিন্তু এই উক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কেন না, ইহারও বিরুদ্ধ-উক্তি এই রামায়ণেরই অন্যত্র মারিচের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

আরণ্যকাণ্ডের ৩৮ সর্গে মারিচ রাবণকে দশরথের কথাই পুনরায় বলিতেছেন—

"ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ।
কামন্তু মম তৎ সৈনং ময়াসহ গমিষ্যতি।" ৬।৩।৩৮

এই পরস্পর বিরোধী দুই উক্তির কোনটী ভুল, তাহার আলোচনা পরে করিব। এস্থলে আমরা দশরথের নিজ মুখের উক্তিকেই অকৃত্রিম মনে করিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইলাম।

রাম ও লক্ষ্মণ যে অবশেষে রাজা দশথের সম্মতিক্রমেই বিশ্বামিত্রের সহগামী হইয়াছিলেন, ইহা রামায়ণের স্বীকার্য্য ঘটনা; সুতরাং তাহার উল্লেখ বাহুল্য। রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হন; সেস্থানে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞান্তে তাঁহার সহিত রাজা জনকের ধনু পরিদর্শন জন্য মিথিলায় উপনীত হন। ইহার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং এই সময় রামের বয়স ষোড়শ অতিক্রম করে নাই।

যোগ বাশিষ্ঠে রামের বয়স।

আমাদের এই নির্দ্দেশ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতেছে। যোগবাশিষ্ঠের ৫ম সর্গে বৈরাগ্য প্রকরণে রামের বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি আছে—

অথোনষোড়শে বর্ষে বর্ত্তমানে রঘূদ্বহে।
রামানুযায়িনি তথা লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নেঽপিচ॥ ১

ভরতে সংস্থিতে নিত্যং মাতামহ গৃহে সুখং।
পালয়ত্যবনীং রাজ্ঞি যথাবদখিলামিমাং॥ ২

*   *   *

*   *   *

অর্থাৎ—ছেলেদের ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাজা বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি এই বিষয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন। ইত্যাদি···

যোগবাশিষ্ঠ পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ হইলেও এই গ্রন্থে যে মূল রামায়ণের উক্তিই গৃহীত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যোগবাশিষ্ঠের এই সমর্থন দ্বারা এই দুটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে; ১ম—রামের ১৬ বৎসর অথবা তাহার পূর্ব্বে উনষোড়শ বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল; ২য়—আরণ্যকাণ্ডের মারিচের মুখের উক্তি কৃত্রিম অথবা লিপিকারের ত্রুটী। রামের যে ষোল বৎসর বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, তাহা রামায়ণের অন্যান্য স্থান হইতেও প্রমাণিত হইবে; সে সকল স্থানের উল্লেখ পরে করিব।

রামের ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে বিবাহকালে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন প্রভৃতির বয়স যে তাহা অপেক্ষাও ২ | ১ বৎসরের ন্যূন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহের সময় সীতা-উর্ম্মিলা প্রভৃতির বয়স কত ছিল, এখন তাহা আলোচনার বিষয়। রামায়ণে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই।

সীতার পালক পিতা জনকের মুখেও সে সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ পায় নাই। জনক কেবল বলিয়াছেন—

সীতার বয়স জনকের মুখে।

"ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা॥ ১৪
বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা।
ভূতলাদুত্থিতাং তাস্তু বর্দ্ধমানাং মমাত্মজাম॥ ১৫।১।৬৬

"ব্যবর্দ্ধত" ও "বর্দ্ধমানাং" এই দুইটী বয়স জ্ঞাপক শব্দ মাত্র জনকের মুখে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দ দুটীর প্রথমটীর অর্থ—"ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।" দ্বিতীয়টীর অর্থ—"বৃদ্ধির অবস্থায়।" ইহার অধিক বয়স নির্দ্দেশ সূচক—কোন ইঙ্গিত রাজা জনকের মুখে অবগত হওয়া যায় না।

সীতার বয়স সীতার মুখে।

এস্থলে সীতার বিবাহের বয়সের উল্লেখ না থাকিলেও আরণ্যকাণ্ডের ৪৭ সর্গে ও সুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার নিজ মুখে—সীতার বয়সের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দণ্ডকারণ্যে ছদ্মবেশধারী রাবণকে ব্রাহ্মণ অতিথি বিবেচনা করিয়া সীতা তাহার নিকট আত্ম পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকুণাং নিবেশনে
ভুঞ্জানান্ মানুষান্ ভোগান সর্ব্বকামসমৃদ্ধিনী॥ ৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজা মন্ত্রয়ত প্রভুঃ।
অভিবেচয়িতুং রামং সমেতো রাজমন্ত্রিভিঃ॥ ৫। ৩। ৪৭

অর্থ—বিবাহের পর আমি স্বামীগৃহে সুখ-সুম্ভোগে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করি। অতঃপর ত্রয়োদশ বৎসরে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা রামকে রাজ্য প্রদানের সঙ্কল্প করেন।

এস্থলে বয়সের কোন কথা নাই ঘটে কিন্তু বিবাহের পর কত দিন স্বামীসহ সীতা অযোধ্যায় ছিলেন, তাহার একটা নির্দ্দেশ আছে; এই নির্দ্দেশ দ্বারা রামের বনবাস কালের বয়স অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সীতার এই উক্তিও প্রমাদ শূন্য নহে, সুতরাং তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এই উক্তি কৌশল্যার উক্তির বিরোধী। রামায়ণে এইরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তির অভাবই নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচনের একটী প্রধান উপায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। স্থল বিশেষের অবস্থা বিবেচনায় এইরূপ উক্তি বিশেষ

ভাবে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা এস্থলে ঐ বিরোধী উক্তি গুলির উল্লেখ করিয়া তাহার বিচার করিতে চেষ্টা করিলাম।

রাম বনে গমনে প্রস্তুত হইয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলে, তিনি বলিয়াছিলেন—

কৌশল্যার মুখে রামের বয়স।

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখ পরিক্ষয়ম॥ ৪৫।২।২০

অর্থ—হে পুত্র, তোমার জন্মের পর এই সপ্তদশ বর্ষ আমি আমার দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া কাটাইয়াছি।

কৌশল্যার এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা যায়, রাম সপ্তদশ বর্ষে বনে গমন করিয়াছিলেন।

যদি উনষোড়শ বর্ষে রামের বিবাহ হইয়া থাকে, তবে কৌশল্যার এই উক্তিতে প্রতিপন্ন হইবে যে বিবাহের পর মাত্র এক বৎসর রাম সীতার সহিত অযোধ্যায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে বনে গমন করিয়াছিলেন। আরণ্যকাণ্ডের উপরোদ্ধৃত শ্লোকে কিন্তু সীতা বলিতেছেন, তিনি বিবাহের পর দ্বাদশ 'সমা' (বর্ষ) পতি সহ ইক্ষ্বাকু কুলে বাসের পর ত্রয়োদশ বর্ষে রামের রাজ্যাভিষেকের সঙ্কল্প হয় এবং এই সময় তাঁহারা বনে গমন করেন।

সীতার উক্তি ও কৌশল্যার উক্তিতে বিরোধ।

কৌশল্যার উক্তির বিরোধী এই যে উক্তি, এই উক্তির সমর্থন রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডেরও একস্থলে আছে। আরণ্যকাণ্ডে সীতা অতিথি বেশধারী রাবণকে যাহা বলিয়াছেন, সুন্দরকাণ্ডে প্রায় সেইরূপ কথাই অশোকবনে অবস্থিতা সীতা হনুমানকে বলিয়াছেন; যথা—

সমা দ্বাদশ তত্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিনী॥ ১৭

ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষ্বাকুনন্দনম্।

অভিষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে॥ ১৮। ৫। ৩৩

এই পরস্পর বিরোধী উক্তি দুটীর একটিকে অবশ্যই ভুল বা লিপিকর প্রমাদ অথবা কৃত্রিম বলিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। আরণ্যকাণ্ডের ও সুন্দরকাণ্ডের শ্লোক দ্বয়ের "দ্বাদশ সমা" শব্দের 'সমা'কে যদি 'মাস' * বলিয়া পাঠ করা যায় এবং "ত্রয়োদশ বর্ষ" স্থলে যদি "ত্রয়োদশ মাস" পাঠ গ্রহণ করা যায়, এবং এই ভুলকে লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া মনে করা যায়, তবে মীমাংসার পন্থা বোধ হয় বা সহজ হইতে পারে।

বিরোধের মীমাংসা।

সীতার পরবর্ত্তী উক্তি যেন এই পন্থা আরও একটু সহজ করিয়া দিতেছে। এখানে সীতার উক্তি আরো স্পষ্ট। সীতা ক্রমে অথিতি বেশধারী রাবণের নিকট তাঁহার নিজের ও স্বামীর বয়স বলিতেছেন—

মম ভর্ত্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।

অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥ ১০। ৩। ৪৭

অর্থ—আমার স্বামীর বয়স পঞ্চবিংশ (পঁচিশ) ও আমার বয়স অষ্টাদশ বা আঠার।

সীতার এই উক্তিকে বয়স সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান কাল বাচক উক্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সীতার পাঁচ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। যথা— পঞ্চম বৎসরে বিবাহ + এক বৎসর অযোধ্যায় বাস + বনে

বিবাহ কালে সীতার বয়স।

---

* 'মাস' শব্দ উল্টা 'সমা' হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু 'বর্ষ' শব্দ মাস হওয়া কঠিন। বোধ হয় মাস শব্দই প্রথমে ভুলে 'সমা' হইয়াছিল তৎপর পূর্ব্ব অর্থ রক্ষার জন্য 'মাস' শব্দকে 'বর্ষ' করা হইয়াছে, প্রথমটী ভুল, দ্বিতীয়টী সেই ভুল সমর্থন জন্য ইচ্ছাকৃত ত্রুটী। কিন্তু আধুনিক বৈয়াকরণ ইহাতে সায় দিবেন কি?

গমনের ত্রয়োদশ বর্ষে সীতার নিকট অতিথি বেশে রাবণের আগমন ও এই কথোপকথন। = মোট আঠার বা উনিশ বৎসর।

সীতার এই উক্তিকেও কিন্তু নির্ভুল বলিয়া নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কেন না, এই হিসাবে রামের বয়স সীতার কথিত পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়া যায়। যথা, কৌশল্যার উক্তি অনুসারে সপ্তদশ বর্ষে বনে গমন, অতঃপর ত্রয়োদশ বর্ষ বনে বাস—মোট ত্রিশ বৎসর।

এইস্থলে একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। আরণ্যকাণ্ডে মারিচের মুখে যে 'উনদ্বাদশ' বর্ষের কথা আছে, ঐ উনদ্বাদশ বর্ষই রামের বয়স ছিল—স্বীকার করিয়া যদি ইহার পরবর্ত্তী সময়ের পরিমাণ গণনা করা যায়, তবে কিন্তু সীতার এই বয়স জ্ঞাপক উক্তিতে অসামঞ্জস্য' লক্ষিত হয় না।

আলোচনা ও সামঞ্জস্য।

মারিচ রাবণকে বলিয়াছিল—রামের এগার (উনদ্বাদশ) বৎসর বয়সে রাম বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থ গিয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরেই রামের বিবাহ; বিবাহের পর এক বৎসর অযোধ্যায় বাস; অতঃপর তের বৎসর বনবাস; মোট এই পঁচিশ বৎসর।

মারিচের উক্তির সহিত সীতার উক্তির এইরূপে কোন প্রকারে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়; কিন্তু তাঁহারা বিবাহের পর দ্বাদশ 'সমা' (বৎসর) অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন গণনা করিলে তাহা হয় না। ঐ দ্বাদশ বৎসরেরও প্রবোধ পাওয়া যাইতে পারে, যদি সীতার উক্তি অতীত কাল বাচক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ সীতা রাবণকে বলিতেছেন—আমরা যখন বনে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম তখন আমার স্বামীর বয়স পঁচিশ ও আমার বয়স অষ্টাদশ ছিল।

এইরূপ অর্থ করিলে মারিচের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা সীতার উক্তির দ্বারা হয়। যথা— রামের বিবাহ ১২ + অযোধ্যায় বাস ১২ = মোট ২৪

সীতার বিবাহ ৫ + অযোধ্যায় বাস ১২ = মোট ১৭

বনবাসের কাল (চব্বিশ ও সতরর) এক বৎসর করিয়া অধিক ধরিলে যথা ক্রমে ২৫ ও ১৮ এই বয়স সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ পিতা দশরথ ও মাতা কৌশল্যার উক্তির সহিত কোনরূপেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না।

আমাদের মনে হয়, যে পাণ্ডুলিপিকার মারিচের মুখে 'উনষোড়শ' শব্দটীকে 'উনদ্বাদশ' করিয়াছিলেন, তিনিই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সীতার মুখে বয়স জ্ঞাপক শব্দ দুইটি—"অষ্টাদশ" ও "পঞ্চবিংশ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া অন্যদিকে বিরোধ ঘটাইয়াছেন।

আমাদের এই নির্দ্দেশ সমর্থন জন্য আমরা রামায়ণের আর একখানা সংস্করণের পাঠ, এই স্থলে উদ্ধৃত করিব। ঐ পাঠের আলোচনায় আমাদের সংস্করণের জাল রচনা ধরা যাইতে পারিবে। বঙ্গদেশে বেণীমাধব দের একখানা মূল রামায়ণের সংস্করণ আছে। তাহাতে রাবণের নিকট সীতা যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, ঐ পরিচয় প্রসঙ্গে রাম সীতার বয়সের অঙ্ক দেয় নাই ; পরন্তু অযোধ্যায় দ্বাদশ বর্ষ বাসের স্থলে সংবৎসর বা.সর উল্লেখ আছে। তাহাতে সীতা বলিতেছেন —

"দুহিতা জনক স্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ।
সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রংতে ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ॥
সংবৎসরং চাধ্যুসিতা রাঘবস্য নিবেশনে।
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্ব্বকাম সমৃদ্ধিনী॥
ততঃ সম্বৎসরাদূর্দ্ধং সমমন্যত মে পতিং।
অভিষেচয়িতুং রাজা সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ॥"

প্রচলিত রামায়ণের সংস্করণগুলিতেও এই শ্লোকগুলি আছে; কিন্তু তাহা কাণ্ডান্তরে। সুন্দরকাণ্ডের ৩৩ সর্গে সীতার মুখেই এই কথাগুলি হনুমানের নিকট বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে স্থলেও "সংবৎসরং" স্থলে "সমা দ্বাদশতত্রাহং" ও "সপ্ততসরাদূর্দ্ধং" স্থলে "ততস্ত্রয়োদশে বর্ষে" আছে।

আদিকাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে আছে--বিবাহের পর ভরত ও শত্রুঘ্ন ভরতের মাতুলালয় চলিয়া যায় এবং রাম ও সীতা—

"রামশ্চ সীতয়া সার্দ্ধং বিজহার বহুনৃতুন্।" ২৫।১।৭৭

বহুঋতু অযোধ্যায় অবস্থান করেন। দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত ও শত্রুঘ্নকে লোক পাঠাইয়া অযোধ্যায় আনয়ন করা হয়।

যদি রাম-সীতার বিবাহের পর তাঁহাদের দ্বাদশ বর্ষ কাল অযোধ্যায় থাকা সমর্থন করিতে হয়, তবে ভরতেরও মাতুলালয়ে তত কাল থাকা অনুমোদন করিতে হয়। তাহা কি সম্ভব? কৌশল্যার উক্তি তাহার পরিপন্থি, উপরের শ্লোকের "বহুনৃতুন্" শব্দ দ্বারাও বার বৎসর বুঝাইতেছে না।

বেণীমাধব সংস্করণে কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত রাম সীতার বয়স জ্ঞাপক ১০ম শ্লোকটী নাই। তৎপরিবর্ত্তে আছে—

মম ভর্ত্তা মহাবীর্য্যো গুণবান সত্যবান শুচী।
রামেতি প্রথিতো লোকে সর্ব্ব ভূত হিতে রত॥

এই পাঠই যে অকৃত্রিম তাহাও বলা যায় না। প্রচলিত সংস্করণ গুলির মধ্যে রাম-সীতার বয়সের যে গোলমাল রহিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান জন্য বেণীমাধব সংস্করণের আদর্শ পুস্তকে অথবা বেণীমাধব সংস্করণেই সংশোধন ছলে এইরূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

আর এক কথা এই—উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলি অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিলে সীতার ৫ কি ৬ বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। ইহার পর এক বৎসর অযোধ্যায় থাকিয়া ৭ম বর্ষে বনে

গমন গণনা করিতে হয়। এইরূপ বালিকাকে বনে লইয়া যাওয়ার সমর্থন বোধ হয় কেহ করিবেন না। এইরূপ বয়সের বালিকার পক্ষে বনে গমনের ব্যবস্থা হইলে, সেইরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জন-গণের মুখে বা আত্মীয় পরিজনের মুখে যেরূপ আপত্তি জনক কথা ও মন্তব্য সেই সময় বাহির হওয়া প্রয়োজন, রামায়ণের বন-গমন বাপারে সে সম্বন্ধে সেরূপ কথা একেবারেই কিছু নাই।

এইরূপ অবস্থায় এই পরস্পর বিরোধী উক্তিগুলিকে ত্যাগ করিয়া বিচার করিলে কোন নূতন পন্থা পাওয়া যাইতে পারে কি না, এইবার আমরা তাহাই দেখিব।

মহাকবি সীতাকে বাস্তবিকই একটী পুতুল সদৃশ করিয়া আনিয়া বিবাহ সভায় স্থাপন করিয়াছেন। ভবভূতির মহাবীর চরিতের সীতা এস্থলে যেমন চঞ্চলা-চপলা, এ সীতা তেমন নহে। সমগ্র আদিকাণ্ডে সীতা প্রায় অদৃশ্যা—বিবাহ স্থলে তিনি নামে মাত্র পরিচিতা। এই নামে মাত্র পরিচিতা সীতার সহিতই রামের বিবাহ হইয়া গেল; সীতা রামের সহিত অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। এই স্থলে এইরূপেই কেবল নামের দ্বারা পাঠকের সহিত সীতার সাক্ষাৎ হইল। অথচ এইরূপ একটী মূক বালিকার সহিত একটী মূক কিশোরের বিবাহকেই রামায়ণে স্বয়ংবর বিবাহ বলিয়া অভিহিত করা হইল। এস্থলে একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে আদিকাণ্ডের কোন স্থলেই সীতার মুখে কবিএকটী কথাও বাহির করান নাই।

মহাকবির অঙ্কিত সীতা-চিত্র।

অযোধ্যাকাণ্ডের ২১শ সর্গে আমরা প্রথম সীতার মুখে কথা শুনিতে পাই। অতঃপর ৩০শ সর্গে দেখিতে পাই, সীতা চপলা-মুখরা। রাম একাকী বনে গমনকরিতেছেন শুনিয়া সীতা রামকে ভর্ৎসনা-বাক্যে বলিতেছেন—

"স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি॥" ৮।২।৩০

রাম তুমি শৈলূষের ন্যায় এই সতী কুমারী * ভার্য্যাকে এতদিন সঙ্গে রাখিয়া নিজেই পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে চাও?"

সীতার এই উক্তিতে সীতার মুখেই সীতাকে কুমারী বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কুমারী শব্দ রামায়ণের দুই স্থানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ বয়স বাচক; দ্বিতীয় অর্থ—অবস্থা বাচক।

এই শ্লোকের 'কুমারী' শব্দ—বয়স বাচক। অন্যত্র—

নারাজকে জনপদে তৃষ্ণানানি সমাগতাঃ।
সায়াহ্নে ক্রীড়িতং যান্তি কুমার্য্যো হেম ভূষিতাঃ॥ ২৭।২।৬৭

এস্থলে "কুমারী" (কুমার্য্যো) শব্দে অল্প বয়স্কা অবিবাহিতা বালিকা মাত্রকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে এই "কুমারী"—অবস্থা বাচক। এই শ্লোকের অর্থ—অরাজক রাজ্যে কুমারী কন্যারা (অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকারা) স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে পারে না।

---

* "কৌমারীং" শব্দটাকে না না ব্যক্তি নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কুমারী: শব্দ ষ্ণ প্রত্যয় করিয়া "কৌমারী অবস্থায় গৃহীত"; এইঅর্থ করিয়াছেন; কেহ বা "অন্য পূর্ব্বা নহে জানিয়া"—অর্থ করিয়াছেন। কেহ বা কুমারী সীতারই একটী নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এস্থলে শ্লোকটীর কথায় কথায় অন্বয় করিয়া দেখাইয়া দিলাম—

হে রাম ত্বং স্বয়ং শৈলূষইব চিরং অধ্যুষিতাং সতীং কৌমারীং ভার্য্যাং মাং তু পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।—এখন পাঠক কৌমারীং শব্দের অর্থ বিচার করুন।

কুমারী শব্দের অন্য একরূপ ব্যবহার ঋক্ বেদে দেখতে পাওয়া যায়। সেস্থলে অর্থ—ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক কুমার সহ বর্ত্তমান ইতি কুমারী। ৮।৩১।৮ ঋক দ্রষ্টব্য। ঋক্‌বেদে এই শব্দটী পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত।

অবিবাহিতা কন্যা মাত্রকেই কুমারী বলা হয়; কিন্তু সীতা যে নিজকে কুমারী বলিতেছেন, তাহা অবিবাহিতা অর্থে নহে; বয়সে কুমারী।

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা"... ইত্যাদি স্মৃতির বিধান অনুসারে দশম বর্ষই "কন্যকা" বা "নগ্নিকা" কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কন্যা শব্দই যে "কুমারী", নগ্নিকা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে, তাহা কোষকারেরাও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অবশ্য এই নির্দ্দেশ রামায়ণ-যুগের বহু পরকালবর্ত্তী স্মৃতির ও অভিধানের নির্দ্দেশ।

যাহা হউক। সীতার এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা অপেক্ষা আরো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

সীতা অন্যত্র এক স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। স্থানটী এইরূপ;—রাবণ বধের পর রাম জনকীকে সন্দেহ করিয়া পরিত্যাগ করিলে সীতা বাষ্পাকুল লোচনে রামকে বলিয়াছিলেন—

মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্॥ ১৫
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ।
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বং তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্। ১৬। ৬। ১১৮

অর্থ—আপনি আমার চরিত্র সম্বন্ধে সমুচিত সম্মাননা করিলেন না; বাল্যকালে আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন— তাহাও আপনি দেখিলেন না; আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি ও শীলতা তাহাও আপনি বিবেচনা করিলেন না।

সীতার এই উক্তিও কোন পরবর্ত্তী কবির কারিকরি প্রসূত কি না, জানি না। আপাততঃ এই উক্তিকে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তি—'কুমারী ভার্য্যা' (উক্তির) সমর্থক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যদি তাহা সমর্থন যোগ্য হয়, তবে সীতার নয় দশ বৎসরে

অর্থাৎ বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সীতার যদি এই বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার বয়োঃ কনিষ্ঠা ভগিনী উর্ম্মিলা-মাণ্ডবী প্রভৃতির বিবাহ যে আরো অল্প বয়সে হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। * সীতাকে ও তাঁহার ভগিনীদিগকে বিবাহ কালে কবি যে ভাবে অন্তরালে রাখিয়াছেন, তাহাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থক। লক্ষ্মণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের সহিত কোথাও আমরা তাঁহাদের স্ত্রীদের সম্মিলন দেখিতে পাই না। বোধ হয় নিতান্ত বালিকা বলিয়াই বিবাহের পর তাঁহারা সকলেই পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন; ভরত এবং শত্রুঘ্নও বোধ হয় সেই জন্য পত্নী বিরহিত অবস্থায়ই মাতুল গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

রামায়ণে বাল্য বিবাহের আভাস থাকিলেও যৌবন বিবাহ যে তখন হইত না, এমন মনে হয় না। রামায়ণে কিন্তু যৌবন বিবাহের উল্লেখ নাই।

যৌবন বিবাহ ছিল কি না।

পক্ষান্তরে জনকের ধনুর্ভঙ্গ পণ যদি আরো দশ বৎসর মধ্যে পূর্ণ না হইত, তবে তিনি কি উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহার কোন ইঙ্গিতও রামায়ণে নাই। এইরূপ পণ, যে সমাজে প্রচলিত থাকে, সে সমাজ কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া চলিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

এই স্থলে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সমাজের অবস্থা সামান্য ভাবে আলোচনা করিলে, আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সমীচীনতা ও

---

(১) লক্ষ্মণের স্ত্রী উর্ম্মিলা যে বয়সে সীতার ছোট, তাহা রাজা জনকের উক্তি—"দ্বিতীয়ামূর্ম্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি নসংশয়ঃ।" (২২।১।৭১) হইতেই বুঝা যাইতে পারে। মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি যে তাঁহাদের চেয়েও বয়সে ছোট ছিল, উহাদের সম্প্রদানের পরে ইহাদের সম্প্রদান ব্যবস্থ হইতেই বোধ হয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

অসমীচীনতার দিকে লক্ষ্য করিবার পক্ষে পাঠকগণের সুবিধা হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক ও পরবর্ত্তী সূত্র যুগের কথা

নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাহা করিলাম।

বেদে যৌবন বিবাহ ও বাল্য বিবাহ উভয় বিবাহেরই আভাস আছে। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে সমাজ বন্ধন খুব শিথিল ছিল; ক্রমে ধীরে ধীরে সমাজ ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। রামায়ণের যুগে আসিয়া আমরা প্রতি বিষয়েই সমাজ ধর্ম্মের দোষ গুণ পরীক্ষা করিয়া একটা বিধি অনুসরণের অবস্থা দেখিতে পাই। এই অবস্থা বা ব্যবস্থায় সে যুগে বাল্যবিবাহই সমাজ-ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সেজন্যই রামের ষোড়শ বর্ষে ও সীতার বাল্যকালে এবং সীতার ভগিনীগণের আরো অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

উপনিষদ-যুগে ও সূত্র-যুগে এই অস্পষ্ট অবস্থা আরো একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন পুরুষের পক্ষে অন্যূন চব্বিশ বৎসর ও কন্যার পক্ষে "নগ্নিকা" বিবাহ-বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা বোধ হয় ক্রম-আলোচনারই ফল।

উপনিষদ দ্বিজাতির জন্য সমাবর্ত্তনের পর স্ত্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন; সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে নহে। সূত্রকারগণ এই ব্যবস্থারই অনুমোদন করিয়াছেন। উপনিষদ স্ত্রীর বয়সের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দেন নাই; সূত্রকারগণ তাহা দিয়াছেন। গোভিল,[১] হিরণ্যকেশিন,[২] বসিষ্ঠ,[৩] গৌতম,[৪] বৌধায়ন[৫] প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্রকারগণ সকলেই 'নগ্নিকা' বা 'বালিকা'

১ গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩। ৪। ৬

২ হিরণ্যকেশীন গৃহ্যসূত্র ১। ৬। ১৯। ২

৩ বশিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭। ৭০

৪ গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৮। ২১

৫ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ৪। ১ ১১

বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, এবং অবিবাহিতা কন্যার রজো দর্শনকে দোষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইহার পর স্মৃতিসমূহে সূত্রগুলির মতই পরিগৃহীত হইয়াছিল। ষোল বৎসরে পুরুষের বিবাহ স্মৃতিতেও গৃহীত হয় নাই। সুতরাং ঐ রীতিকে প্রাচীনতম অসংস্কৃত রীতিরই একটা নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

বিধবার অবস্থা।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার প্রথা কিরূপ ছিল, তাহা রামায়ণ হইতে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায় না। রামায়ণে অযোধ্যার রাজ পরিবারের বিধবাগণের আচার ব্যবহার বা বৈধব্য চিহ্ন সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। ভরত পিতার মৃত্যুর পর মাতুলালয় হইতে আসিয়া স্বীয় জননী কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়াও পিতৃ-বিয়োগের কোন আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিবার পূর্ব্বে পত্নীর বৈধব্য চিহ্ন গ্রহণের প্রথা এখন নাই; বোধ হয় তখনও ছিল না। ভরত আসিয়া পিতার মৃত দেহ দাহ করিলে পর বোধ হয় বৈধব্য রীতি ও নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সে চিহ্ন বা সে রীতি যে কিরূপ ছিল, তাহার কোন আভাস রামায়ণে নাই।

বিধবার বৈধব্য চিহ্ন।

রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক যুগেও যে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই থাকিতে হইত, তেমন কোন নির্দ্দেশ, বা বাণী বৈদিক রচনায় আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না; কোন বিশিষ্ট নিয়মই যে বিধবাকে অবলম্বন করিতে হইত না, এমনতর নির্দ্দেশও অবশ্য বেদ সংহিতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋক্ বেদের একটী ঋকে, উপমাচ্ছলে বিধবার শয়ন কালে দেবর সম্ভাষণের

বৈদিক যুগের কথা।

উল্লেখ আছে।[১] অন্য একটী ঋকে নারীকে বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি সংগ্রহ করিতে ও উত্তম উত্তম রত্নাদি ধারণ করিয়া সংসার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।[২] কিন্তু ঋক্‌বেদের কোথাও বৈধব্যাচরণের কোন রীতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় অথবা রামায়ণে বিধবার রীতি নিয়মের কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ না থাকিলেও বৈদিক সূত্রগ্রন্থ সমূহে বিধবার জীবন যাত্রার স্পষ্ট বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে।

সূত্র যুগে বৈধব্যাচরণ কাল।

ঋকবেদীয় বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রে[৩] বিধবার বৈধব্য আচরণের সম্বন্ধে যে বিধান আছে, তাহা এইরূপ:— স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিধবা পত্নী ছয় মাস ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে ও ধর্ম্ম সঙ্গত নীতি নিয়ম[৪] প্রতিপালন করিবে; লবন ও দূষিত খাদ্য[৫] গ্রহণ করিবে না। ছয় মাস গত হইলে স্নাত-শুদ্ধ হইয়া প্রেতের ষান্মাষিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবে; অতঃপর নিঃসন্তান হইলে গুরুজনের নির্দ্দেশ অনুসারে মৃত পতির জন্য সন্তান উৎপাদন করিবে।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় সমাজের ধর্ম্মসূত্রকার বৌধায়ন বলিতেছেন[৬]: বিধবা এক বৎসর পর্য্যন্ত মধু, মাংস, মদ্য ও লবন আহার করিবে না এবং

---

১ ঋক্‌বেদ ১০।৪০।২ ২ ঋক্ ১০।১৮।৭

৩ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৫৫, ৫৬

৪ 'ধর্ম্ম সঙ্গত নীতি-নিয়ম' অর্থে কি বুঝায় ধর্ম্মসূত্রে তাহা নাই। বসিষ্ঠ ধর্ম্ম সূত্রের টীকাকার কৃষ্ণ পণ্ডিত—এক বেলা আহার কে নীতি-নিয়ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫ দূষিত খাদ্য অর্থে টীকাকারেরা পলাণ্ডু প্রভৃতি অভক্ষ্যবস্তু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৬ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ২।২।৪।৭,৯

এইরূপ নিষ্ঠার সহিত ভূমি শয্যায় শয়ন করিবে; ইহার পরে—অপুত্রক হইলে—গুরুজনের নির্দ্দেশ অনুসারে দেবরের দ্বারা একটী মাত্র পুত্র সন্তান উৎপাদন করিবে।

মৌদগল্য ঋষি বসিষ্ঠের বিধানে সায় দিয়া, ছয় মাস বৈধব্য ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; এসম্বন্ধে বৌধায়নের সহিত বসিষ্ঠ ও মৌদগল্যের বিধানের ঐক্যতা দৃষ্ট হইতেছে না। বৌধায়ন যে মৌদগল্যের বিধান আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সূত্রেই উল্লেখ আছে। [৭]

সূত্রযুগের দুইটী প্রধান সমাজের চলিত রীতির কথাই আমরা এ স্থলে উল্লেখ করিলাম। বসিষ্ঠ ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা বিধবাকে [৮] ও বৌধায়ন অপুত্রক বিধবাকে নিয়োগ ক্রমে অপত্যলাভের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অপত্যবতী বর্ষিয়সী বিধবার জীবনযাত্রা কিরূপ ধারায় পরিচালিত করিতে হইবে, তাহার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা কোন সূত্রকারই প্রদান করেন নাই।

সূত্র যুগের পর স্মৃতির যুগ। স্মৃতি সমূহে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের বিধানই স্পষ্ট ব্যবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি সমূহে বিধবা

স্মৃতির ব্যবস্থা—
বিধবার ব্রহ্মচর্য্য।

নারীর ব্রহ্মচর্য্যের নির্দ্দেশ থাকিলেও নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে নিয়োগ ক্রমে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন ব্যবস্থাও অনেক স্মৃতিকার [৯] দিয়াছেন।

সূত্রযুগ ও স্মৃতিযুগের দুইটী সমাজ বিধির স্পষ্ট উল্লেখ এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গেল। এই দুই বিরুদ্ধ ভাব

৭ বৌধায়ন ধর্ম্ম-সূত্র ২।২।৪৮

৮ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৫৬—৫৯; বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ২।২।৪।৯

৯ মনু সংহিতা ৫।১৫৭—১৫৮; পরাশর সংহিতা ৪।২৭—২৮; ব্যাস সংহিতা ২।৫৩; বিষ্ণু সংহিতা ২৫শ অধ্যায়;

হইতে এই দুইটী যুগের দূরত্ব অনুমান করা যাইতে পারে; আমরা তাহা গ্রন্থান্তরে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বাল বিধবার পক্ষে ও নিঃসন্তান বিধবার পক্ষে গুরুজনের উপদেশে নিয়োগ ক্রমে অপত্য উৎপাদনের ব্যবস্থা বিধান করিয়াও কোন ধর্ম্ম-সূত্রকার বা স্মৃতিকার এক রমণীর একাধিক বার বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই। বৈদিক কাল হইতে স্মৃতি রচনার কাল পর্য্যন্ত আর্য্য রমণীগণের একবার মাত্র বৈবাহিক মন্ত্রে স্বামী গ্রহণ রীতিই অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে।

মন্ত্র-বিবাহ একাধিকবার হইতে পারে না।

বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে যে সকল বেদ মন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে মন্ত্রগুলিকে বিধবা বিবাহের সমর্থক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দুইটী ঋক্‌মন্ত্রের নির্দ্দেশ পূর্ব্বে (২২৪ পৃষ্ঠায়) করা হইয়াছে; আর একটী মন্ত্র এই—

"যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত।
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতি বিন্দেত॥"১০

অর্থ—যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষে দুই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষে বিবাহ করিতে পারে না।

১০ এই মন্ত্রটী বেদ মন্ত্র কি না, আমরা তাহা অবগত নহি। মাধব-পরাশরীয় ভাষ্যে, ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ বিচার গ্রন্থে, প্রসন্নকুমার দানিয়ারীর বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থে এই মন্ত্রকে বেদ মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানেই ইহা কোন্ বেদের মন্ত্র, তাহার নির্দ্দেশ নাই। যাহা হউক, এই মন্ত্রে কোন পক্ষেরই তর্ক স্পষ্ট সমর্থিত হয় না।

এই মন্ত্রে এক সময়ে কোন নারী দুই ভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় বার মন্ত্র বিবাহের যুক্তি সমর্থিত হয় না। কোন বৈদিক সূত্রকারই এই মন্ত্রের সমর্থন করিয়া পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

স্বামীর মৃত্যুতে বা জীবিত কালেই এখনও যেমন দুষ্টা স্ত্রী পর পুরুষের আশ্রয় লইতে পারে, সেকালেও তাহা পারিত; ঐরূপ নারীকে বসিষ্ঠ,[১১] পরাশর[১২] প্রভৃতি ঋষিরা 'পুনর্ভূ', বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুনর্ভূ বা দ্বিতীয় স্বামী সংগ্রহ কারিণী সম্বন্ধে নারদ বচন[১৩] এবং মনুর বচন অনুরূপ।[১৪]

পুনর্ভূ।

মন্ত্র-বিবাহ একবার হইয়া গেলে, সেই কন্যার উপর স্বামী পরিবারের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ও বৈদিক উদ্বাহ-মন্ত্রের নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিয়া মনু এক কন্যার একবারের অধিক মন্ত্র-বিবাহে একেবারেই সম্মতি দেন নাই।[১৫]

বৌধায়ন, বসিষ্ঠ প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মসূত্রকার—বিবাহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু হইলে সে কন্যার পিতৃ প্রভুত্ব হেতু—পুনর্ব্বার

---

১১ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।১৯।২০

১২ অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যায় দীয়তে।
অন্যা অপিন্নভোক্তবং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা। ৫ম অধ্যায় বৃহৎপরাশর।

১৩ নারদ সংহিতা ১২।৪৮

১৪ মনু ১১।১৭৫

১৫ মনু ৫।১৬২ পরাশরের নষ্টে মৃতে … … প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থা বিবাহিতা কন্যার জন্য নহে; অক্ষতপূর্ব্বা কন্যার জন্য। এই বচনটী নারদ বচন; প্রয়োজন অনুসারে পরাশরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং এখন তাহার অপপ্রয়োগ চলিয়াছে।

তাহাকে পত্যন্তরে মন্ত্রপাঠ করিয়া সেই পিতারই দান অধিকার ব্যবস্থা দিয়াছেন।[১৬] স্মৃতিকারেরা এরূপ ব্যবস্থাও দেন নাই।

ধর্ম্মসূত্রে পুনর্ব্বিবাহ ব্যবস্থা।

রামায়ণে কিন্তু আর্য্য সমাজের চিরন্তন প্রচলিত ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রথাটির কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; বিধবা নারীর পত্যন্তর গ্রহণেরও কোন স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয় না।

রামায়ণের আর্য্য সমাজের কোন আলোচনায় এরূপ প্রথার উল্লেখ না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য বানর সমাজে এই প্রথাগুলির অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যার সমাজে বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া দেবরের ভোগ্যা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন প্রথাও এই সমাজের সমাজ-প্রথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বানর সমাজে দেবরের অধিকার ও ক্ষেত্রজপুত্র-প্রথা।

বৈদিক কাল হইতে অপেক্ষাকৃত নবীন স্মৃতির রচনা কাল পর্য্যন্ত দেবরের যে অধিকার সমাজপতি আর্য্য ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন রামায়ণের সমাজে আর্য্য দেবরগণের সেই অধিকার ছিল না—ইহা বিশ্বাস করিতে হইলে রামায়ণের যুগকে অথবা রামায়ণের রচনা কালকে এই সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনারও বহু পরবর্ত্তী যুগে আনিয়া ফেলিতে হয়। আমরা রামায়ণকে বা রামায়ণের যুগকে তেমন অর্ব্বাচীন মনে করি না। রামায়ণের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার আলোচনা করিলে যে কোন অস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারাও আর্য্য সমাজের এই

১৬ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ১।১৬; বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৭৪

বসিষ্ঠ বর্দ্ধিষ্ণী বিধবার স্বেচ্ছায় পতি গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন (১৭।৭৬—৭৮) কিন্তু বিধবার পিতৃকুলে কোন পুরুষ জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত নহে।১৭।৮০

প্রচলিত রীতিটীর অস্তিত্বের আভাস প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, এমন বিশ্বাসও আমাদের নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য সমাজের যে স্পষ্ট আভাস রামায়ণে আছে, তাহার আলোচনা করা যাউক এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আর্য্য সমাজের অবস্থা বিবেচনা করা যাউক।

দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য বানর সমাজে দেবরের অধিকার কিরূপ ছিল, বালী ও সুগ্রীবের পরস্পরের পত্নীর প্রতি পরস্পরের ব্যবহার ও সেই ব্যবহার সম্বন্ধে জন-মত ও রাজ-মত তাহা নির্দ্দেশ করিবে। আমরা এইক্ষণে সে সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া প্রত্যাগমন না করায়, বালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব বালীর মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া নিজের স্ত্রী রুমাকে উদ্ধার করিয়াছিল এবং কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল; বালীর স্ত্রী তারাকেও পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিল। এই ঘটনার বিবরণ বিবৃত করিতে যাইয়া সুগ্রীব রামের নিকট নিঃসঙ্কোচে বলিতেছে :—

সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ গ্রহণ।

"রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।" ৯। ৪। ৪৬

ইহার পর সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে স্ত্রী হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া রামের নিকট তাহার বিচার প্রার্থনা করিতেছে। সুগ্রীব বলিতেছে—"বালী ফিরিয়া আসিয়া আমাকে আমার উত্তরীয় পর্য্যন্ত লইবার অবসর না দিয়া (এক বস্ত্র) নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এবং আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। ২। ৪। ১০

কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ গমন জন্ত বালীর নামে অভিযোগ।

এস্থলে প্রথমে বিচার্য্য—জেষ্ঠভ্রাতা বালীর মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীব যে জ্যেষ্ঠা ভাতৃবধুকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা ন্যায় সঙ্গত কার্য্য হইয়াছিল কি না? দ্বিতীয় বিচার্য্য—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর সম্বন্ধ। সমাজ যাহার প্রশ্রয় দিতে পারে না, এবং দেয় না, এমন অনেক ঘটনা সমাজে ঘটিতে পারে; ঐরূপ ঘটনাকে সমাজের প্রচলিত আচার বলিয়া অভিহিত করা যায় না; করাও সঙ্গত নহে।

বিচার।

বালী ও সুগ্রীবের পরস্পরের স্ত্রীকে লইয়া পরস্পরের বিহার তৎকালীন সমাজের অনুমোদিত ছিল কি না এস্থলে তাহার বিচার প্রয়োজন। প্রথম ঘটনা অর্থাৎ বালীর স্ত্রীকে লইয়া সুগ্রীরের ব্যবহার সম্বন্ধে বালীর পুত্র অঙ্গদ বলিতেছে—

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্ম্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগপ্সিতঃ॥ ৩
কথং স ধর্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্॥ ৪।৪।৫৫

"জ্যেষ্ঠাভ্রাতৃজায়া ধর্ম্মতঃ মাতৃবৎ, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করে, সেই জগুপ্সিত ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? (এইরূপ করিয়া) সুগ্রীব ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।"

অঙ্গদের এই উক্তি হইতে দেখা যায়, বালীর জীবিতকালে তাহার স্ত্রীর সহিত সুগ্রীবের ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত ব্যভিচার বলিয়া বানর-সমাজ কর্ত্তৃকই উক্ত হইতেছে; সুতরাং হইাকে (অনার্য্য) সমাজের প্রচলিত প্রথা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় ঘটনা,—সুগ্রীবের স্ত্রীর সহিত বালীর ব্যবহার। ইহার

সম্বন্ধে জনপদাধিপতিরূপে রাম বালীকে বলিতেছেন,—

ভ্রাতুর্ব্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ১৮

অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।

রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ॥ ১৯। ৪। ১৮

"তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অনুগমন করিতেছ। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ তুল্যা। অতএব,

* * * "কামার্ত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।" ২২। ৪। ১৮

স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে তুমি বধের যোগ্য।

এই স্থানে বক্তা রাম। রাম যাহাকে সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা অনার্য্য সমাজের স্বীকার্য্য নাও হইতে পারে; বিশেষতঃ, রাম এ স্থলে বালি-বধের ছল খুঁজিতেছিলেন; সুতরাং এ স্থলে বালীর কার্য্য অনার্য্যদিগের সমাজবিরুদ্ধ হইয়াছিল কি না, স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুগ্রীবের আচরণকে অঙ্গদ যেরূপ অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল, সেইরূপ (অঙ্গদের ন্যায়) বানর-সমাজের যদি কেহ বালীর এই কার্য্যেকেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিত, তাহা হইলে, তাহা দ্বারা এই কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা যাইত।

তৃতীয়,—বালীর মৃত্যুর পর বিধবা তারাকে সুগ্রীবের স্ত্রীরূপে গ্রহণ। রামায়ণে এই আচরণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই। বিধবা তারার সহিত সুগ্রীবের বিবাহের কোনও কথা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। লঙ্কাকাণ্ডের ২৮ সর্গে শুক রাবণের নিকট সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।

সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৩২

অর্থ—"সুগ্রীব রামের সাহায্যে বালীকে বধ করিয়া মালা, তারা ও শাশ্বত কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।

এ স্থলে "তারা-লাভ" সমাজ ও ধর্ম্ম-সঙ্গত বিধানের অনুমোদিত কি না, তাহা অপ্রকাশ।

বালী মৃত্যুকালে সুগ্রীবকে বলিতেছেন,—"যাই হউক, তুমি অদ্যই এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজ্য, প্রিয় দ্রব্য, বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং নির্ম্মল যশ ত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। * * আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রিয়তম পুত্র অঙ্গদকে তুমি তোমার ঔরষ পুত্রের ন্যায় দেখিও। * * এই তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিপদ-সূচক বিবিধ কার্য্যবিজ্ঞানে সম্যক নিপুণা, ইনি যাহা বলিবেন, যথার্থ ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা করিবে। তারার মত যেন কিছুমাত্র অন্যথা না হয়।"

বালীর এই অন্তিম উক্তি হইতেও কিষ্কিন্ধ্যা-সমাজে জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ায় বিধিসঙ্গত অধিকারের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু রামের নিকট সুগ্রীবের "রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ—" এই নিঃসঙ্কোচ উক্তি ও অঙ্গদের "যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবিতকালে তাহার পত্নীকে গ্রহণ করে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কোথায় ?"—এই দুটি উক্তির প্রমাণে, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তাহার পত্নীতে কনিষ্ঠের অধিকার অনেকটা (কিষ্কিন্ধ্যা) সমাজের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়।

সুগ্রীবের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুগ্রীবকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অবমাননাকারী বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সুগ্রীব বুঝিয়াছিল, এবং বিশ্বাস করিয়াছিল যে, বালি দৈত্য-যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। সুগ্রীব

সংবৎসরকালমধ্যে তাহাকে আগমন করিতে না দেখিয়াই তাহার মৃত্যু অনুমান করিয়া বালীর পরিত্যক্ত রাজ্য ও তারাকে গ্রহণ করিয়াছিল। মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করা তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্মের বহির্ভূত হইলে, সুগ্রীব রাম-সম্ভাষণের প্রথমেই আপনার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিতে সাহস করিত না। সে তাহার কার্য্য সময়োচিত ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়াই ভাবিয়াছিল, তাই নিঃসঙ্কোচে রামের নিকট বলিয়াছিল—

"রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুমযা সহ।"

কিন্তু বালী ও অঙ্গদের মনে অন্যরূপ ধারণা ছিল; তাই তাহারা সুগ্রীবের আচরণ ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিল এবং বালী প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে সুগ্রীবকে এক বস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া কনিষ্ঠের (সুগ্রীবের) পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিল।

সুগ্রীবের তারা গ্রহণ ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য বলিয়া উক্ত হয় নাই। পরন্তু সুগ্রীব যখন রাম প্রসাদে কপিরাজ্য লাভ করিয়া স্ত্রীগণ সম্ভোগে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল, এবং লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই আচরণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার কামিনী-কণ্ঠ-নিনাদিত অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধিমতী তারা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিল—"আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না; সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহেন; বিশেষতঃ

"রাম প্রসাদাৎ কীর্ত্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাংমাঞ্চ পরন্তপ॥" ৫। ৪। ৩৫

রামের প্রসাদেই সুগ্রীব কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর-রাজ্য, নিজের পত্নী রুমা ও আমায় প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

অন্যত্র লক্ষ্মণ তারাকে সুগ্রীব-পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তারা লক্ষ্মণকে প্রবোধ বাক্য বলিলে লক্ষ্মণ তারাকে বলিতেছেন:—

কিময়ং কাম বৃত্তস্তে লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
ভর্ত্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈবমববুধ্যসে॥ ৪৩।৪।৩৩

অর্থ—ভর্ত্তৃ হিতকারিণী তোমার পতি সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছে, তাহা কি তুমি বুঝিতেছ না?

এই আলোচনায় গৃহীত যাবতীয় শ্লোকই যে অকৃত্রিম তাহা বলিবার উপায় নাই; তথাপি মোটামুটী এই সকল বিষয়ের আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে রামায়ণের যুগে দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য সমাজে বিধবা ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের অধিকার ছিল।

ভারতীয় সমাজে দেবরাধিকার যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিই সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে।

বাইবেলে দেবরাধিকার।

এই সনাতন রীতি কেবল ভারতীয় আর্য্য এবং অনার্য্য সমাজেই আবদ্ধ ছিল না, সুপ্রাচীন ইহুদী সমাজেও প্রচলিত ছিল। ১৭ সুতরাং বাল্মীকি যে আর্য্য সমাজের সমাজরীতি কল্পনা কুশলতার বলে অনার্য্য সমাজে আরোপ করিয়াছেন, এস্থলে এরূপ চিন্তারও অবকাশ খুব বেশী নাই। তবে এস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—কনিষ্ঠা ভ্রাতৃ-

---

১৭ Old Testament (আদি পুস্তক ৩৮।৮) পূর্ব্ব ও পশ্চিমের প্রাচীন সমাজ বিধির সাদৃশ্যতা প্রদর্শন জন্য এ স্থলে বাইবেলের দেবর-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পাঠের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করা গেল।

"যিহুদা ওননকে কহিল তুমি আপন ভ্রাতার স্ত্রীর কাছে গমন কর ও তাহার প্রতি দেবরের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া নিজ ভ্রাতার জন্য বংশ উৎপন্ন কর।"

দেবর প্রাচীন পাশ্চাত্য সমাজেও যে "দ্বিতীয় বর" রূপে গণ্য হইত, বাইবেলের এই উক্তি তাহার পরিচায়ক।

বধুর প্রতি জ্যেষ্ঠ দেবরের (অর্থাৎ ভাসুরের) যে ব্যবহারের উল্লেখ উপলক্ষে রামের মুখে এবং জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর প্রতি দেবরের যে ব্যবহারের জন্য অঙ্গদের মুখে ধর্ম্ম নীতির বা স্মৃতির দোহাই প্রদর্শিত হইয়াছে—ঐ দুইটী বিষয়ের মূল নীতি কত প্রাচীন?

দেবর ভাসুর পার্থক্য চিন্তা কত প্রাচীন?

বৈদিকসূত্রে দেবর-ভাসুর।

ভাসুর-ভাদ্রবধুর মধ্যে যে একটা "গর্ব্বিত" সম্পর্ক স্মৃতি[১৮] কারেরা প্রদর্শন করিয়াছেন বৈদিক সূত্র গ্রন্থগুলিতে তেমন গর্ব্বিত ভাব দৃষ্ট হয় না। মনু কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুকে স্নুষা তুল্যা ও জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুকে মাতৃ তুল্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১৯] রামের ও অঙ্গদের উক্তি এই মনু-বচনেরই যেন পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয়। ভাসুর-ভাদ্রবধুর মধ্যে তেমন 'গর্ব্বিত' সম্পর্ক বৈদিক যুগে থাকিলে বসিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্রের ঋষি সে গর্ব্বিত ভাবের মর্য্যাদা নষ্ট করিতেন বলিয়া মনে হয় না। বসিষ্ঠ-ধর্ম্ম সূত্রকার কনিষ্ঠ ভ্রাতার কোন অপরাধের জন্য কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।[২০]

মনু স্মৃতিতে দেবর-ভাসুর।

---

১৮ "স্মৃতি" শব্দটী বৈদিকযুগের কোন গ্রন্থে ব্যবস্থাশাস্ত্র বা সংহিতা অর্থে থাকা আমরা আপত্যজনক বলিয়া মনে করি। ব্যবস্থাশাস্ত্র গুলি বহু পরবর্ত্তী যুগে যখন সংগৃহীত হইয়া শ্লোকাকারে সংহিতা বদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাহা স্মৃতি হইতে সংগৃহীত বলিয়া "স্মৃতি" নামে অভিহিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাশাস্ত্রের "স্মৃতি" সংজ্ঞাটী বৈদিক নহে।

১৯ মনু সংহিতা ৯। ৫৭

২০ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ২০। ৮ ব্যবস্থাটী এইরূপ—কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে দার গ্রহণ করিলে সে প্রায়শ্চিত্তার্হ। এই ত্রুটীর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সে তাহার বিবাহিতা পত্নী অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবশ্য প্রায়শ্চিত্তান্তে কনিষ্ঠের পত্নী কনিষ্ঠকে প্রদান করিবেন।

মহাভারতকারও ভাসুর ভাদ্রবধুর সম্পর্কের গুরুত্ব লক্ষ্যের বিষয় মনে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সত্যবতী যখন ভীষ্মের নিকট ব্যাসের নিয়োগ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন [২১] তখন অম্বিকা ও অম্বালিকা যে সম্বন্ধে তাহার ভাদ্র বধু এবং ব্যাস ভাসুর হেতু শ্বশুর তুল্য গুরু—এ সম্বন্ধে কোন তর্কই উপস্থিত হয় নাই।

মহাভারতে দেবর-ভাসুর।

মনুর স্মৃতিতেই আমরা দেবর (ভাসুর) ভাদ্র-বধুর সম্পর্কের পার্থক্য বিচার বোধ হয় প্রথম লক্ষ্য করিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, মনু দ্বিজাতিবর্ণের পক্ষে নিয়োগ প্রথাও অবৈধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। [২২] এই ব্যবস্থা উল্লেখিত মহাভারতীয় নিয়োগ ব্যবস্থার বিরোধী ব্যবস্থা। এ অবস্থায় মনুর এই ব্যবস্থাকে মহাভারতেরও পরবর্ত্তী ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

জ্যেষ্ঠ দেবর (ভাসুর) ও কনিষ্ঠ দেবরের পার্থক্য সূত্রকারগণ বা মহাভারতকার করেন নাই বলিয়াই যে এই সম্পর্ক দ্বয়ে কোন পার্থক্য ছিল না, এমন চিন্তাও একদেশদর্শী।

রামায়ণে প্রদর্শিত লক্ষ্মণের চরিত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে পরবর্ত্তী যুগে যে ঠাট্টা করিবার রীতি সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, [২৩] রামায়ণে সে রীতি দেখা যায় না; বরং তাহার বিপরীত

২১ মহাভারত আদিপর্ব্ব।

২২ মনু ৯।৬৪ মনুর এই ব্যবস্থা তাঁহারই প্রদত্ত অন্য ব্যবস্থার বিরোধী। বিরোধের কারণ সাময়িক প্রক্ষিপ্ততা।

২৩ কবি ভবভূতির রচনায় এই ভাবটী দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তররাম-চরিতে সীতার প্রতি লক্ষ্মণের ব্যবহার সম্বন্ধেই আমরা এস্থলে ইঙ্গিত করিতেছি।

রীতিই দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতকে গুরুবৎ সম্মান করিত বলিলেও বোধ হয় অতিশয় উক্তি হইবে না। কেননা, লক্ষণ কদাপি সীতার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখে নাই; তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা তাঁহার পদাভিমুখীই থাকিত। অবশ্য কবি এখানে অতিশয় উক্তির সাহায্যে আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহর এই সৃষ্টির ভিতর যে দেশ কালের প্রাভাব নাই, তাহা বলা যায় না।

রামায়ণে ভ্রাতৃ জায়ার প্রতি সম্মান।

রামায়ণেরযুগে নিয়োগ প্রথার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেও দেবর ভ্রাতৃজায়ার ব্যবহারিক সম্মানের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সধবা ভ্রাতৃজায়াকে মাতৃ-তুল্য জ্ঞান করা ও সেই ভ্রাতৃজায়া বিধবা হইলে তাহাকে পত্নীরূপে ব্যবহার করা—যদি একই শাস্ত্রের বিধান হয়, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠান যেমন অসঙ্গত নহে, ঐ প্রথার ব্যভিচার স্থলেও তাহা ব্যভিচার বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। ব্যভিচার ভদ্র-ইতর সকল সমাজেই সমান অশান্তি উৎপাদন করিয়া থাকে। সুগ্রীবকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার পত্নাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর পত্নীরূপে ব্যবহার জ্ঞানকৃত ব্যভিচার; এইরূপ জ্ঞানকৃত ব্যভিচার নীতিশাস্ত্রে দূষণীয়। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধুর প্রতিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবিত থাকা অবস্থায় পত্নীত্বের দাবী ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, সুতরাং ব্যভিচার। তারার প্রতি সুগ্রীবের ব্যবহার যদিও জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে, তথাপি বালী ও অঙ্গদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সুগ্রীব বালীকে ছলে-বলে আবদ্ধ রাখিয়া আসিয়াই বালির রাজ্য ও পত্নী অধিকার করিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় রাম ও অঙ্গদ কাহারও উক্তি অস্বাভাবিক হয় নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা—প্রচলিত সমাজ ধর্ম্মেরই ইঙ্গিত; মনুর স্মৃতিতে সেই ইঙ্গিতই গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মনু 'জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ স্নুষা তুল্যা' ব্যবস্থা দিয়াও পরের শ্লোকেই—"সন্তান সত্ত্বে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পরস্পরের স্ত্রীতে গমন করিলে পতিত হইতে হয়"—এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মনুর এই বচনে "বিধবা" শব্দ নাই, কিন্তু "সন্তান সত্ত্বে" এই ভাবটী আছে। ইহার পরবর্ত্তী ব্যবস্থা—'স্বামী দ্বারা সন্তান না জন্মিলে দেবর বা সপিণ্ড দ্বারা ঈপ্সিত সন্তান লাভ করিবে।'

ক্ষেত্রজ পুত্র—সধবায় ও বিধবায়।

এস্থলে ও "বিধবা" বা এইরূপ ভাব জ্ঞাপক কোন শব্দ না থাকায়, স্বামীর বর্ত্তমানে স্বামী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া (মহাভারতের কুন্তীর ন্যায়) এবং স্বামী অভাবে (মহাভারতের অম্বিকা অম্বালিকার ন্যায়) গুরুগণের নিয়োগ ক্রমে—এই উভয় ব্যবস্থাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; এই ব্যবস্থা বেদ-ব্রাহ্মণ-স্মৃতি এবং মহাভারত গ্রাহ্য বটে।

সমাজ সৃষ্টির আদিম কাল হইতে নবীন স্মৃতির ব্যবস্থা কাল পর্য্যন্ত যদি এই রীতি অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, বিশ্বাস করিতে হয়—এবং এই সঙ্গে রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতাও স্বীকার করিতে হয়, তবে রামায়ণের যুগেও যে আর্য্য সমাজে দেবর-স্বামীত্বের ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রজ-পুত্র উৎপাদনের প্রথা ছিল তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

রামায়ণের একস্থলের একটী ঘটনার বর্ণনা হইতে কাহারও কাহারও মনে এইরূপ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে। এস্থলে বিষয়টীর আলোচনা করা গেল।

মায়া মৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া রাম চলিয়া গেলে সীতা লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যে যাইতে আদেশ করেন। লক্ষ্মণ তখন

সীতাকে মহাবাহু রাম সম্পর্কে কোন চিন্তা করিতে নিবারণ করিলে "ক্রুদ্ধাসংরক্তলোচনা সীতা" লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

রামায়ণে দেবরাধিকারের আভাস।

সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥ ২৪
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ২৫। ৩। ৪৫

অর্থ—রে দুষ্ট চরিত্র. তুই নিশ্চয় আমার লোভে কিম্বা ভরতের নিয়োগ ক্রমে অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকী রামের সঙ্গে—আসিয়াছিস। কিন্তু রে সুমিত্রা পুত্র, তোর কিম্বা ভরতের সেরূপ বাসনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। ···

এই উক্তি সীতা চরিত্রের বিরোধী; এই জন্য অনেকে অনুমান করেন, সেকালে দেবরের স্বামীত্বাধিকার প্রচলিত ছিল; সেই রীতি-চিন্তা হইতেই সীতার মুখে এইরূপ উক্তির উদ্ভব স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যায়।

এ স্থলে প্রতিবাদেরও যুক্তি আছে। প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন এই স্থলে এইরূপ অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ উক্তিরই প্রয়োজন। কবিও সুতরাং সেইরূপ করিয়াছেন। এইরূপ একটা চরিত্র বিরোধী কথা—উপস্থিত না হইলে লক্ষ্মণের মত অনুগত ভ্রাতার ভ্রাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনের কারণ উপস্থিত হয় না; কাব্যেরও গতি রুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়।

বাস্তবিক মহাকবি লক্ষ্মণের চরিত্রে যে উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন সীতার চরিত্রের আদর্শ-উপাদানের চেয়ে তাহা কোন অংশেই ন্যূন নহে, হীন নহে; বরং লক্ষ্মণের চরিত্র অনেক বিষয়ে সমুন্নত ও উচ্চভাব পূর্ণ। লক্ষ্মণকে ভ্রাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইতে হইলে কবিকে

এমনতর কোন সমস্যার সৃষ্টি না করিতে পারিলে, তাহা কদাপি স্বাভাবিক হইবে না; তাই সীতার মুখে কবি এমন ধারার কথা বাহির করাইয়াছেন। ভাষার কথা যাহা হউক, এইরূপ চিন্তা এখানে অস্বাভাবিক নহে, প্রক্ষিপ্তও নহে।

কিন্তু সীতা চরিত্রের উপাদানওতো উপেক্ষার বিষয় নহে! তাই এই অনুমানের অবকাশ আছে যে—সে কালে আর্য্য সমাজেও দেবর স্বামীত্বের রীতি প্রচলিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে এই স্থলে আপস্তম্ব ধর্ম্ম সূত্রের একটী সূত্রের উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—কন্যা যে স্বামী লাভ করিয়া উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়, তাহাতে কেবল স্বামীর সঙ্গেই যে তাহার বিবাহ হয়, তাহা নহে; কন্যা শ্বশুর কুলের সহিতই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই জন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর ভ্রাতাগণও ঐ কন্যাতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারে।[২৪] বসিষ্ঠ-ধর্ম্মসূত্রের একটী বিধানও যেন এই আপস্তম্বসূত্রের সমর্থক। বসিষ্ঠ সূত্র করিয়াছেন—"বিধবা যদি পুত্র কামী হইয়া ভর্ত্তা সংগ্রহের ইচ্ছা করেন, তাহাকে স্বামীর পরিবারেই তাহা করিতে হইবে; স্বামীর পরিবারে একটী পুরুষ জীবিত থাকিলেও তিনি—অন্যত্র ভর্ত্তা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।[২৫]

পূর্ব্বে ও ধর্ম্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলেও পুনরায় করিলাম। আপস্তম্ব সূত্রটী প্রদান করিয়াই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিয়াছেন—এই প্রথা

২৪ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২।১০।২৭।৩

২৫ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭।৮০

২২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকার শেষ পংক্তিতে এই সূত্রটীর উল্লেখে ভুল ক্রমে "পতিকুল" স্থলে "পিতৃকুল" মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান হীন যুগে নাই; পূর্ব্বে যখন সমাজে সত্য নিষ্ঠা ছিল, তখন এই রীতি প্রচলিত ছিল।

আপস্তম্ব যে ঋষিযুগের লোক নহেন, ইহা তাঁহার নিজের উক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে।[২৬] এই সূত্রকারের সময়ই মনু এবং পরাশর-স্মৃতিতেও নূতন বিধান প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এইবার পুনরায় সীতা ও লক্ষ্মণের মনোভাব লক্ষ্য করা যাউক।

লক্ষ্মণ সীতার ঐরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যের উত্তরে সীতাকে লক্ষ্য করিয়া—

"স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্ট স্বভাবেন গুরুবাক্য ব্যবস্থিতম্।"

ইত্যাদি গুরুভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছেন কিন্তু সীতার ঐরূপ চিন্তা যে সমাজ বিগর্হিত বা সনাতন ধর্ম্ম বিগর্হিত—এমন কথা তো কদাপি বলেন নাই।

লক্ষ্মণ সীতাকে ভর্ৎসনা করিয়া যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেও সীতা তাঁহার হৃদয় হইতে সেই দুর্ভাবনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি তখনো বলিতে লাগিলেন—রাম ব্যতিরেকে আমি···আত্ম জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাপি রঘুনন্দন রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ স্পর্শ করিব না।

লক্ষ্মণের চরিত্র ও সীতার চরিত্রের সহিত সীতার উক্তি ও পুনরুক্তি গুলির আলোচনা করিলে এবং সেই আলোচনার সহিত আপস্তম্ব ও বসিষ্ঠ গৃহ্যসূত্রের বিধানদ্বয়ের সম্বন্ধ রাখিয়া বিচার করিলে রামায়ণের যুগে আর্য্য সমাজেও যে দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবধূতে অধিকার ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সঙ্গে মাতৃ তুল্যা জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া সীতার মুখ দর্শন না করার জন্য লক্ষ্মণের যে অতিরিক্ত সতর্কতা—তাহাও লক্ষ্যের বিষয়। আদর্শ-চরিত্র

26 Buhler's Introduction to Apastamba Page XVIII.

লক্ষ্মণ ঐরূপ সমাজ প্রচলিত প্রথার প্রভাবে পাছে, নিজ চিন্তায় কোন প্রকার দুর্ব্বলতা অনুভব করেন, সেই ভয়েই কি সীতার মুখপানে তাকাইতেন না?

দেবরের এই অধিকারকে বা বিধবার সন্তান লাভ আশায় বা লালসা তৃপ্তির আশায় ভর্ত্তান্তর গ্রহণকে, বিধবা বিবাহ বলা যায় না। ঐরূপ ভর্ত্তা সংগ্রহ, মন্ত্র গ্রহণে সম্পাদিত হইত না; মন্ত্র ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না। বেদ, ব্রাহ্মণ বা সূত্র—কোন শ্রুতিই ঐরূপ সংগ্রহকে বিবাহ বলেন নাই। মহাভারতের সমাজে নানা বিষয়েই স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়; ঐ সমাজেও প্রয়োজনাধীনতা—অর্থাৎ পুত্রহীনা নারীর পুত্র লাভ ব্যাপারের জন্য—ব্যতীত, অন্য কোন কারণে স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামী ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ না করিবারই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

মহাভারতে আছে—

ন চাপ্য ধর্ম্মঃকল্যাণ বহুপত্নীকতানৃণাম্।

স্ত্রীনাম ধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে॥৩৬। ১। ১৫৮

অর্থ—পুরুষের বহুপত্নীকতায় দোষ নাই, কিন্তু স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য পুরুষ আশ্রয় করিলে মহা অধর্ম্ম হয়।

রামায়ণে বিধবার মন্ত্র বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। লঙ্কার রাক্ষস সমাজেও কবি বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস রাণী মন্দোদরীকে বিভীষণের পত্নী করিয়াছেন; মন্দোদরী সম্বন্ধে বাল্মীকি তেমন ব্যবস্থা করেন নাই। বিধবা সূর্পণখা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ব্যভিচারিণী ছিল। এ শ্রেণীর লোক সকল কালেই সকল সমাজে ছিল এবং আছে।[২৭] ঋক বেদের যে ঋকটীর উল্লেখ ২২৪

বিধবা বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে নাই।

২৭ ঋক্‌বেদ ২।২৯।১ ও শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।২০ দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠার ২ নং পাদটীকায় করা হইয়াছে, তাহা সংযমহীনা নারীর প্রতি উক্ত হইয়াছে কি না, কে বলিতে পারে?

অপরাধ প্রকাশের পর দণ্ড-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

সমাজে অপরাধের প্রকাশ না হইলে দণ্ড বিধিতে নিষেধ বিধান প্রবিষ্ট হইতে পারে না। মনুসংহিতায়[২৮] বিধবার পুনর্ব্বিবাহের পুনঃ পুনঃ নিষেধ বিধান থাকায়, মনে হইতেছে যে এই স্মৃতির বিধান ব্যবস্থিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত ঋক্ মন্ত্রটীরই (১০।১৮।৭) কদর্থ ব্যাখ্যাত হইয়া সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি হইবার কারণ ঘটিয়াছিল এবং তাহাই স্মৃতি-সংহিতা গুলিতে এইরূপ নিষেধ-বিধান প্রবর্ত্তনের কারণ হইয়াছিল। এই সময়ই বিধবা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ উল্লেখের সহিত বিধবাগণের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের নিয়মও কল্পিত হইয়াছিল। বেদ মন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে গৃহীত হইবার দৃষ্টান্ত, অথবা অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত—ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সূত্র গ্রন্থাদিতে বিরল নহে। আমরা "সূত্রযুগের সমাজ" গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। এই গ্রন্থেরও ২।১ স্থলে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

অবরোধ প্রথা

উন্মুক্ততাই সৃষ্টির আদিম ভাব। আদিম মানব সমাজে উলঙ্গভাব লজ্জার বিষয় ছিল না। জ্ঞানের ও বয়সের বৃদ্ধির সহিত মানব শিশুর মনে যেরূপ উন্নতভাব উদিত হয়, মানব সমাজেও সেইরূপে ধীরে ধীরে উন্নতির ভাব আসিয়াছিল। মানব প্রথমে বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তারপর তাহার উত্তরীয়ের প্রয়োজন হয়, ক্রমে সে অবগুণ্ঠন প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিয়াছিল। এইরূপে সমাজের বৃদ্ধি ও

২৮ মনুসংহিতা ৮।২২৬ ও ৫।১৬২;

উন্নতির সহিত মানবের রুচি ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। লজ্জা ও সম্ভ্রম, শুচিতা ও পবিত্রতা সমাজের উচ্চ নৈতিক আবরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অবগুণ্ঠন সমাজ-ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

ঋকবেদে অবগুণ্ঠন।

রামায়ণে অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথার উল্লেখ নানা স্থানেই আছে। তখন যুবতী বধূদিগের স্বাধীনভাবে বিচরণের প্রথা ছিল না; অল্প-বয়স্কা কুমারী কন্যাগণই ভৃত্যদিগের সহিত ভ্রমণে বাহির হইতে পারিত। রামায়ণে বর্ণিত এই প্রথা যে প্রাচীন, তাহার আভাস ঋক সংহিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋকবেদে অবরোধ ভাব প্রকাশক কোন কথার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু অবগুণ্ঠন যে বধূদিগের লজ্জা-রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং তাঁহারা যে সর্ব্বদাই বস্ত্রে সংবৃত থাকিতেন, তাহার উল্লেখ ঋক্‌বেদের স্থানে স্থানে আছে।[১] রামায়ণের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়—শুদ্ধান্তঃপুর নামে একটা বিশিষ্ট কক্ষ (আঙ্গিনা) মহিলাদিগের জন্য পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুরুষের পক্ষে সেই শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করা একেবারে নিষিদ্ধ।

রামায়ণে অবগুণ্ঠন প্রথা—অযোধ্যায়।

অযোধ্যার শুদ্ধান্তঃপুরে রাজা দশরথের অতি বিশ্বস্ত পারিষদ বলিয়া একমাত্র সুমন্ত্রের প্রবেশাধিকার ছিল।[২] রাম-লক্ষ্মণেরও সংবাদ না পাঠাইয়া তথায় প্রবেশের অধিকার ছিল না। লক্ষ্মণ নিজ সমাজের এই রীতি অনুসারেই কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করেন নাই।[৩] হনুমান গভীর নিশায় গুপ্তভাবে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ

১ ঋক্‌বেদ ৮।১৭।৭; ৮।২৬।১৩

২ অযোধ্যাকাণ্ড ১৪ সর্গ।

৩ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩৩ সর্গ।

করিয়া এইরূপ কথা ভাবিয়াই অন্তরের অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিল [৪]।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক আঙ্গিনার ব্যবস্থা থাকিলেই যে তাহা অবরোধের সমর্থন করিবে, তেমন চিন্তা সমীচীন নহে। ঐ ব্যবস্থার প্রতি তাহার সমসাময়িক সমাজ কিরূপ চক্ষে দৃষ্টি করিত ও চিন্তা করিত, তাহার উপরই বিচার নির্ভর করিবে।

অযোধ্যার সমাজ অবরোধ প্রথাকে কিরূপ ভাবে লক্ষ্য করিতেন, সীতার বনে গমন উপলক্ষে নাগরিকগণের উক্তি তাহার পরিচয় প্রদান করিবে।

সীতা যখন বনবাসে যাইতে উদ্যতা হইয়া রামের সহিত পদব্রজে রাজপথে বাহির হইয়া রাজভবনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন নাগরিকগণ আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বলিতেছিলেন—

যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥ ৮। ২। ৩৩

অর্থ—হায়, পূর্ব্বে আকশগামী প্রাণীরাও যে সীতাদেবীকে দেখিতে পাইত না, অদ্য রাজপথ স্থিত মানবেরাও তাঁহাকে দেখিতেছে।

এই উক্তির ভিতর অতিশয়উক্তি-দোষ থাকিলেও ইহা হইতে তৎকালীন সমাজের আদর্শ ও রুচির পরিচয় এবং অবরোধ প্রথা বিদ্যমানতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অন্যত্র—রাবণবধের পর বিভীষণ সীতাকে রাম সমক্ষে শিবিকা সংযোগে আনয়ন করিলে, রাম বলিলেন—

'সীতাকে আমার নিকট (পদব্রজে) আসিতে বল।'

বিভীষণ রামের কথা শুনিয়া সত্বর উপস্থিত জনতাকে অপসারিত করিয়াদিতে আদেশ করিলেন, তখন বেত্রধারী কঞ্চুকিগণ চারিদিক

---

৪ সুন্দরকাণ্ড।

হইতে পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাম বিভীষণকে বলিলেন—"বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর,[৫] যজ্ঞ, ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দোষণীয় নহে। জানকীর এখন বিপদ উপস্থিত।"

অবরোধ প্রথা—লঙ্কায়।

রাবণ বধের পর রাবণের মৃত দেহের উপর পতিত হইয়া রাজ্ঞী মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন—"আমি আজ অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি এবং পদব্রজে এই স্থানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার অপরা পত্নীগণেরও লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত। ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না কেন?"[৬]

কিষ্কিন্ধ্যার কথা।

কিষ্কিন্ধ্যায়ও অন্তঃপুর ছিল। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুর বোধহয় অযোধ্যার ন্যায় শুদ্ধান্তঃপুর নহে, কেন না সে অন্তঃপুরে লক্ষ্মণ লজ্জা বশতঃ এবং আর্য্য-নীতি অনুসারে প্রবেশ না করিলেও সুগ্রীবপত্নী তারা স্বচ্ছন্দে আসিয়া লক্ষ্মণের সহিত বাক্যালাপ করিয়া গিয়াছিল।[৭] তারাকে অশিক্ষিতা বানরী (বন্য-নারী) বলিবার উপায় নাই। মহাকবি তাহার মুখেও বেদ মন্ত্র বাহির করাইয়াছেন, তাহাদ্বারাও পতির কল্যাণ কামনায় মন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছেন। বোধহয় বর্ষীয়সী তারা লক্ষ্মণকে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বলিয়াই সঙ্কটস্থলে এরূপ করিয়াছিলেন। দৃঢ় অবরোধাবদ্ধ আধুনিক বঙ্গ পল্লীতেও এরূপ ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে।

---

৫ 'স্বয়ংবর' শব্দটিকে আমরা রামায়ণের রচনায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। (২০৩ পৃষ্ঠা)

৬ লঙ্কাকাণ্ড ১১৬। ২৮ শ্লোক। ৭ লঙ্কাকাণ্ড ১১৩। ৬১—৬২ শ্লোক।

ইহা দ্বারা কোন রীতির অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব—কোন পক্ষেরই বিচার চলিতে পারে না। সীতাও এইরূপ সঙ্কটেই ছদ্মবেশধারী রাবণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আলাপ-পরিচয় করিয়াছিলেন।

মহিলাগণের পৃথক যান বাহন ব্যবস্থা।

অযোধ্যার সমাজে স্ত্রীলোকদিগের শিবিকা বহনের জন্ত পৃথক এক শ্রেণীর লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল। অযোধ্যার এই রীতি মহাকবি লঙ্কাতেও প্রদর্শন করিয়াছেন। বিভীষণ সীতাকে যখন রামের নিকট আনয়ন করেন তখন স্ত্রীলোকদিগের বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা সীতাকে শিবিকায় বহন করাইয়া আনিয়াছিলেন। ৮ সম্ভবতঃ এই সকল বাহক বয়সে প্রবীন অথবা নপুংসক শ্রেণীর ছিল।

দশরথের মৃতদেহ দাহ করিবার সময় পুরমহিলাগণ সেইরূপ বিশেষ ব্যবস্থায়ই শ্মশান ভূমিতে নীত হইয়াছিলেন। এমন কি শ্মশান হইতে যে তাঁহারা সরযুর জলে গিয়া অবগাহন করিয়াছিলেন, তাহাতেও যানারোহণেই গিয়াছিলেন। ৯

স্ত্রীলোকের যানারোহণের ব্যবস্থা থাকিলেই তাহাতে অবরোধের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। বিশেষ ব্যবস্থাই—সেরূপ চিন্তার ভাব স্মরণ করাইয়া দেয়। এস্থলেও সেরূপ বিচার্য্যাধীন ভাবগুলিরই উল্লেখ করা গেল।

মহাভারতের কথা।

রামায়ণীযুগের পরে মহাভারতের সমাজেও অবরোধের আভাস স্পষ্ট আছে, কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত কোন কোন চিত্র অবরোধ-হীনতারও পরিচায়ক। যেমন শকুন্তলার পতি সম্ভাষণে গমন। শকুন্তলা সম্বন্ধীয় আলোচনা "মহাভারতের সমাজ" গ্রন্থে করিতে চেষ্টা করিব।

---

৮ লঙ্কাকাণ্ড ১১৫ সর্গ।

৯ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬ সর্গ।

সমাজে অবরোধ প্রথা বিদ্যমানতার একটী প্রধান কারণ বহুবিবাহ-রীতির অস্তিত্ব। যে সমাজে বহু বিবাহ রীতি বর্ত্তমান আছে, অবরোধ প্রথা সে সমাজে যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। আর একটী কারণ, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের স্বামিত্ব ভাবের উদ্ভব। সুসংস্কৃত সমাজ গঠিত হইয়া স্ত্রী, পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া যখন হইতে গণ্য হইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, পুরুষ নিজের স্বত্ব নিরাপদ রাখিবার জন্য তখন হইতেই বোধহয় সমাজে অবগুণ্ঠন ও অবরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহা আমাদের অনুমান এবং এই অনুমান স্বাভাবিক বলিয়াই আমরা মনে করি। আভিজাত্য-গর্ব্বও যে এই প্রথা প্রবর্ত্তনের একটী কারণ নয়, তাহাও বলা যায় না। যান-বাহনাদির বিশিষ্ট ব্যবস্থা অনেকটা আভিজাত্যেরই নিদর্শন। অবরোধ প্রথা না থাকিলেও যান-বাহনাদিতে বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া গমনাগমন করিবার রীতি থাকিতে পারে; এখনও আছে।[১০]

অবরোধ প্রথা বিদ্যমানতার কারণ।

---

১০ এই প্রবন্ধের এক অংশ ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে "সঞ্জীবনী" ও "Indian Daily News" পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত প্রতিবাদ ও আলোচনা বাহির হয়। প্রবন্ধটী তখন অসম্পূর্ণ ছিল। আলোচনা ও প্রতিবাদের বিষয় ছিল—"প্রাচীন ভারতে বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা কখনই ছিল না।" আমরা এখানে নিরপেক্ষ ভাবে রামায়ণের ভাব উদ্ধৃত করিয়া বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা বিষয়ে আলোচনা করিলাম। পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদের উত্তরে আমাদের বলিবার কিছুই নাই; এই আলোচনা পাঠের পরও যদি কেহ মনে করেন—"বাল্য-বিবাহ সেকালে ছিল না, অবরোধ প্রথাও সেকালে ছিল না"। তাঁহার উত্তরে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। রামায়ণের এই সকল স্থানের আলোচনা করিয়া "Indian Epics" গ্রন্থের গ্রন্থকার Oman সাহেব অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে

"অসূর্য্যম্পশ্যা" শব্দটী রামায়ণে না থাকিলেও ইহার ভাবটী যে রামায়ণের সমাজের সমকালবর্ত্তী তাহা রাজমার্গে সীতাকে দেখিয়া নাগরিকগণের উক্তিতেই স্পষ্ট প্রতিয়মান হইবে। (২৪৫ পৃঃ) এই ভাবটী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কি না, তাহা বিচার করিবার সময় পাঠক সুপ্রাচীন বৈয়াকরণ পানিনির ; নিম্ন লিখিত সূত্রটীর প্রতি একবার লক্ষ্য করিবেন।

"পানিনি" খশ্ প্রত্যয় স্থলে সূত্র করিয়াছেন—

"অসূর্য্য ললাটয়ো র্দৃশিত পোঃ" ৩।২।৩৬

টীকাকার ভট্টোজি দীক্ষিত এই সূত্রের টীকা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

অসূর্য্যমিত্যসমর্থসমানঃ। দৃশিনা নঞঃ সংবন্ধাৎ।

সূর্য্যংন পশ্যন্তীত্যসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারাঃ ললাটন্তপঃ সূর্য্যঃ।

উপনীত হইয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা নীরব রহিলাম। "There can be no doubt whatever, that the seclusion of women was the common practice in Ancient India. Whereever poligamy exists the seclusion of women is a necessity & that poligamy did exist in India ın the time of the Ramayana is abundently evident from what we are told concerning the courts of Dasaratha, Sugriva & Ravana."

Oman সাহেব সেকালের গ্রীক রমণীদিগের সহিত ভারতীয় রমণীগণের তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—The Greeks kept their women a good deal in the back ground but Helen's, position in the court of her husband Menilus or Penelopes in that of Ulysses was far more free than the position of any queen mentioned in the Ramayana."

পানিনি বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। টীকা ও ভাষ্যকারেরা অবশ্য অর্ব্বাচীন।

বহু-বিবাহ।

বহু বিবাহ, আদিম অসংস্কৃত সমাজ-রীতির একটী চিহ্ন। সমাজ যখন অপূর্ণ ছিল, তখন বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রয়োজনীয় রীতি দ্বারা প্রয়োজন সাধিত হইয়া গেলে, তাহা অনাবশ্যক হয়; তখন অনাবশ্যক রীতি সমাজের উপদ্রব বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। বহু বিবাহ দ্বারা যতদিন সমাজে জন বৃদ্ধি প্রয়োজন হইয়াছিল, ততদিন তাহা সমাজে আপত্তির কারণ ছিল না। সমাজ জনবলে বলবান হইলে এবং স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে, বহু স্ত্রী পোষণ পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বিঘ্ন জনক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সমাজ বুঝিয়াছিল, এই প্রথা অর্থ ও শান্তি—উভয় বিষয়েরই পরিপন্থি। ঋক্‌বেদের "সপত্নী পীড়ন" ঋক মন্ত্রগুলি [১] হইতে এই ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা।

সপত্নী পীড়ন মন্ত্রগুলি হইতে বৈদিক সমাজে যে বহু বিবাহ ছিল, এবং তাহা যে পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্টের কারণ ছিল, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। ইহার পর বোধহয় সমাজের সাধারণ স্তর হইতে বহু বিবাহ উঠিয়া যায় এবং তাহা কেবল ধনী পরিবারের পরিবার-স্বামীর বিলাসের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

ঋকবেদে সপত্নী পীড়ন মন্ত্র।

রামায়ণের বর্ণনায় আমরা এই ভাবই লক্ষ্য করিতে পাই। রামায়ণের রাজারা সকলেই বহু পত্নীক। রাজা দশরথের পত্নীর সংখ্যা ছিল

১ ঋক্‌বেদ ১০।১৪৫

সাড়ে তিন শত।[২] মিথিলার রাজা জনকও একাধিক দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।[৩] রাবণ, বালী, সুগ্রীব—ইহারা সকলেই অসংখ্য রমণীগণে বেষ্টিত থাকিতেন।

রামায়ণে বহু বিবাহ।

সপত্নী পীড়নের আভাস রামায়ণেও আছে। রামের বনে গমন কালে কৌশল্যার উক্তিতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৪]

রামায়ণে রাজাদিগের ব্যতীত রাজ পরিবারের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী ছিল, অবগত হওয়া যায় না। অযোধ্যার রাজ পরিবারে রাম-লক্ষ্মণাদির,[৫] লঙ্কার বিভীষণ, ইন্দ্রজিত, কুম্ভকর্ণাদির বা কিষ্কিন্ধ্যার অঙ্গদ প্রভৃতির একাধিক পত্নী গ্রহণের আভাস রামায়ণের কোথাও নাই। এই সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই—বহু বিবাহ যে তখন রাজাদের বিলাস পরিতৃপ্তির জন্যই প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করা হইয়াছে।

সূত্র যুগে এই প্রথার সংকীর্ণতা সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। ইহার

---

২ অযোধ্যাকাণ্ড ৩৪। ১৩—১৪ শ্লোক।

৩ আরণ্যকাণ্ড ১১৮। ৩৩ শ্লোক।

৪ অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।

৫ কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার উক্তিতে আছে—

পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি॥ ১১
হৃষ্টাঃ খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রীয়ঃ।
অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে॥ ১২। ২। ৮

কেহ কেহ এই "স্ত্রীয়ঃ" ও "স্নুষা" শব্দদ্বয় দ্বারা রামের ও ভরতের বহু ভার্য্যার নির্দ্দেশ করেন। তাহা ঠিক নহে। এস্থলে "স্ত্রীয়ঃ" ও "স্নুষা" শব্দ দ্বারা রামের ও ভরতের পুর-নারীগণকেই বুঝায়, তাঁহাদের বহু পত্নী ছিল—বুঝায় না। বিশেষ রাম এক-পত্নী ব্রতাবলম্বী ছিলেন।

আভাস আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—স্ত্রী স্বামী-ধর্ম্মাণুরাগিণী হইলে এবং তাহার পুত্র সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে স্বামী দ্বিতীয় দার গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬

ধর্ম্মসূত্রে নিষেধ বিধি।

ধর্ম্মসূত্রগুলি পূর্ব্বরীতির ব্যভিচার দর্শনেই রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণে বর্ণসঙ্করের উল্লেখ নাই। সামাজ তখনও অপূর্ণ ছিল, তাই আদান প্রদানে বর্ণভেদ ছিল না। তখন রাজারা তিন শ্রেণীর পত্নী রাখিতেন। উত্তমা স্ত্রী মহিষী, মধ্যমা স্ত্রী বাবাতা ও অধমা স্ত্রী পরিবৃত্ত্যা নামে কথিত হইত। রাজা দশরথের এই তিন শ্রেণীরই পত্নী ছিল। ৭ ব্রাহ্মণ ঋষিরা ক্ষত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিতেন। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষত্রিয় রাজা লোমপাদের কন্যা শান্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৮

অনুলোম বিবাহ।

অনুলোম বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও প্রতিলোম বিবাহের উল্লেখ রামায়ণে নাই। বৈদিক যুগে প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল; তখন চাতুর্ব্বর্ণ্য ববস্থা ছিল না বলিয়াই, যযাতি শুক্রকন্যা দেবযানীকে ও রাজা সম্বরণ সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন প্রসঙ্গে মহাভারতে এই প্রতিলোম বিবাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত

৬ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২। ৫। ১১। ১২

৭ আদিকাণ্ড ১৪। ৩৫ শ্লোক। রামায়ণের টীকাকারগণ মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃত্ত্যা শব্দে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের টীকায় ইন্দ্রের বাবাতা স্ত্রীর উল্লেখ প্রসঙ্গে (ঐ: ব্রা: ৩। ১২। ১১ খণ্ড) ঐ শব্দত্রয়ের অর্থ—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—করা হইয়াছে। এই ভেদের মূলে যে সংস্কার র্ত্তমান, তাহা বলাই বাহুল্য।

৮ আদিকাণ্ড ১০ সর্গ।

হইয়াছে। জাতির ভিতর ভেদ-ভাব সৃষ্টি হইলে পর প্রতিলোম ব্যবস্থা তিরোহিত এবং অনুলোম বিবাহ প্রচলিত হয়। তখন সঙ্কর উৎপত্তি ব্যবস্থাও ব্যবস্থিত হয়।[৯] রামায়ণে এই সকল পরবর্ত্তী যুগ-ধর্ম্মের কোন আভাসই দৃষ্ট হয় না।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাজ-ধর্ম্মের আর একটী প্রধান অঙ্গ। মৃতদেহের অগ্নি-সৎকার-প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদে অগ্নি সৎকারের কথা আছে। দশম মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ঋক্‌মন্ত্রগুলি বেদোত্তর যুগে মৃত দাহের সময় পঠিত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।[১]

রাজা দশরথের রাত্রিকালে ঘরের ভিতরই প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় এইরূপ মৃত্যুকে শোচনীয় মৃত্যু বলা হয়। যাহার কেহ নাই, তাহারই এইরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে। স্মৃতিকারগণও[২] এইরূপ মৃত্যু প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্মৃতির অনুশাসনের প্রভাবেই বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাসও দুঃখ করিয়া গাহিয়াছেন—

গৃহে মৃত্যু প্রায়শ্চিত্তার্হ নহে।

যার ঘরে জন্ম লভিলা গদাধরে। ১৫
হেন রাজা মরিয়া রহিল নিজ ঘর॥ ১৬ (৩৯)

---

৯ গৌমত-ধর্ম্ম-সূত্রকার ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বিবাহের সন্তান যবন হয় বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৌঃ ধঃ সূত্র ৪। ২১

বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীতে নিষাদ উৎপত্তির কথা আছে। ১। ৯। ১৭। ৩

১ ঋক্‌বেদ ১০। ১৪। ১৪; ১০। ১৬। ১ (রমেশবাবুর ঋকবেদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

২ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের 'শুদ্ধিতত্ত্বে' বৃহৎযমসংহিতার বিধান ও বিভিন্ন মতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অন্যত্র—চারিপুত্র রাজার একজন নাই ঘরে। ৭
বাশি মড়া হইল রাজা ঘরের ভিতরে॥ ৮ (৪০)
(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

আধুনিক স্মৃতিকারেরা ও স্মৃতির প্রভাবে অনুসাশিত সমাজ সমূহ যে রূপ মৃত্যুকে এখন প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া মনে করেন রামায়ণের যুগে তেমন মৃত্যুকে শোচনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ কোথাও বলিতে দেখা যায় না। তেমন হইলে কৃত্তিবাসের ন্যায়, মহাকবি বাল্মীকিও এ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত করিতেন।

বাশিমড়া দুষ্ট নহে।

'বাশিমড়া' হওয়া যে সেকালে দোষণীয় ছিল, তেমন কোন উল্লেখও রামায়ণে নাই। দশরথের মৃতদেহ ভরতের আগমন অপেক্ষায় তৈল দ্রোণীর ভিতর রক্ষিত হইয়াছিল। মহাভারতের পাণ্ডুর দেহও এই উপায়ে রক্ষিত হইয়াছিল। অথচ কোন গ্রন্থেই এইরূপ পন্থা আপত্তি জনক বলিয়া নিন্দিত হয় নাই; সুতরাং বাশিমড়া হওয়া সেকালে দোষনীয় ছিল না।

স্বর্গ প্রাপ্তি বিশ্বাস।

"বাশিমড়া" হওয়ায় যে কোন রূপ অধোগতি হইত না, দশরথের স্বর্গ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সকলের নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ততাই তাহা বুঝিবার প্রকৃষ্ট হেতু। মৃত ব্যক্তির (আত্মার) স্বর্গ প্রাপ্তির ধারণা যে খুব প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য সমাজের বিশ্বাসের বিষয় ছিল, তাহা ঋকবেদ হইতেও অবগত হওয়া যায়।[৩]

মৃত্যুর পর দশরথের আত্মার স্বর্গলাভ হইয়াছিল।

"স্বর্গস্থশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ।"

৩ ঋকবেদের ৫।১৮।১; ৫।৬৫।৪; ৫।৬৬।৬; ৬।১।৭ প্রভৃতি ঋক্‌মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

তাঁহার মৃতদেহ মাত্র—ভরতের আগমন পর্য্যন্ত—রক্ষিত হইয়াছিল। মৃতদেহ বোধহয় দশ বার দিন রক্ষিত হইয়াছিল।[৪] অতঃপর ভরত আসিয়া তাহা সরযূতীরে যথা নিয়মে লইয়া গিয়া শাস্ত্র সঙ্গত প্রথায় দগ্ধ করিয়াছিলেন।[৫] তৎকালীন সৎকার রীতি-প্রথার কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইল।

রাম স্বজনবৎ জটায়ুর মৃতদেহও আর্য্য সমাজের রীতি অনুসারে জ্বলন্ত চিতায় দাহ করিয়াছিলেন, তাহার প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিয়াছিলেন এবং তর্পণও করিয়াছিলেন।[৬] জটায়ুর শবদাহকে অনার্য্য সমাজের প্রথা বলা যায় না। রাম পিতৃ বন্ধু ও উপকারকের এই পারলৌকিক কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে এবং নিজ বিশ্বাস অনুসারে করিয়াছিলেন। এগুলি রামের কার্য্য, অনার্য্য সমাজের নহে।

কিষ্কিন্ধ্যা সমাজেও অগ্নিসংস্কারের প্রথা দেখা যায়। বানর রাজ বালীর মৃত্যু হইলে, বানরগণ বালীকে বসন ভূষণে ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিয়া নদীতীরে লইয়া চলিল; অগ্রে অগ্রে বানরেরা

৪ অযোধ্যা হইতে যে লোক ভরতকে আনিতে রাজগৃহে প্রেরিত হইয়াছিল, ঐ লোক কতদিনে রাজগৃহে পঁহুছিয়াছিল রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। ঐ লোক রাজগৃহে পঁহুছিলে সেই দিনই ভরত মাতুলালয় ত্যাগ করেন। ভরত যে ৭ দিনে অযোধ্যা পঁহুছিয়াছিলেন, এই টুকুই তাঁহার উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়। তিনি তাঁহার মাতামহ প্রভৃতির কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া মাতার নিকট বলিতেছেন--

"অষ্টমে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্য্যকবেশ্মনঃ।" ৮।২।৭২

সুতরাং রাজার মৃত্যুর পর বার চৌদ্দ দিন পরে মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল—এইরূপ অনুমান করা যায়। একস্থলে দশ দিনের উল্লেখও দৃষ্ট হয়।

৫ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬ সর্গ।

৬ আরণ্যকাণ্ড ৬৮ সর্গ

রক্ত ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। নদী তীরে চিতা প্রস্তুত হইলে অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজল নয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন, এবং শাস্ত্রানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃত দেহ দাহ করিয়া বানরগণ নদীতে তর্পণ করিতে গমন করিলেন।[১]

রামের সহবাসে ও তাহার উপদেশে কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য সমাজে দাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল—ইহা অনুমিত হইতে পারে বটে কিন্তু মহাকবির উদ্দেশ্য তাহা নহে। কিষ্কিন্ধ্যায় শব-শিবিকা পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল। সেই শিবিকার বর্ণনা শিল্প প্রসঙ্গে গ্রন্থান্তরে প্রদত্ত হইয়াছে। শিবিকা প্রসঙ্গটী কবির কল্পনা বাহুল্যের ফল কি না, এস্থলে তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। পাঠক সে বিষয় চিন্তা করিবেন।

এইবার রাক্ষস সমাজের কথা। বিরাধ রাক্ষস রামকে বলিয়াছেন—

"অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ॥ ২১

রাক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ২২। ৩। ৪

তুমি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যাও; মৃত রাক্ষসদিগের সমাধিই সনাতন ধর্ম্ম।

ইহা দণ্ডকারণ্যের অসভ্য রাক্ষস সমাজের কথা। লঙ্কার রাক্ষস সমাজে এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নে রাবণের অগ্নি সংকারের রাক্ষসী ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল।

"রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণের মৃতদেহকে পট্টবসন পরাইয়া শিবিকায় আরোহণ করাইল। সকলে মাল্য-সজ্জিত বিচিত্র পতাকা-শোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণ

১ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ।

গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনন্তর বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন, পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্কব (লোমজ কম্বল) আস্তির্ণ করিয়া দিলে শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বেদী রচনা করিয়া যথা স্থানে বহ্নি স্থাপন করিলেন। অতঃপর রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃত পূর্ণ স্রুব নিক্ষেপ পূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উদূখল এবং অরণি উত্তরারণি ও অন্যান্য দারুপত্র সকল যথাস্থানে রাখিয়া পিতৃমেধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্র ও মহর্ষিগণের বিধানানুসারে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার ঘৃত সংযুক্ত মেদ দ্বারা এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে স্থাপিত করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদগণ গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ বস্ত্রাদিদ্বারা উহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন; অতঃপর বিভীষণ যথাবিধি অগ্নিকার্য্য করিলেন। রাবণের দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্র বসনে বিধি অনুযায়ী সদর্ভ তিলোদকে রাবণের তর্পণ করিলেন।[৮]

রাক্ষস সমাজের এই অগ্নিসৎকার প্রথা অযোধ্যার অগ্নিসৎকার প্রথার অনুরূপ না হইলেও এই বর্ণনাকে অনেকে কবির অলীক বর্ণনা বলিয়া মনে করেন। করিবার কারণ বিরাধ রাক্ষসের উক্তি—"আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যাও … … ।" বিরাধের উক্তির সহিত এই বর্ণনার সামঞ্জস্য না থাকায়—ইহাকে কবির "খেয়াল সৃষ্টি" বলিবার অবকাশ আছে।

মৃতদেহের কবর দেওয়ার উল্লেখও ঋক্‌বেদে আছে।[৯] কবর

৮ লঙ্কাকাণ্ড ১১৩ সর্গ।

৯ ঋক্ বেদ ১০।১৮।১২

প্রথাই বোধহয় মৃত সৎকারের আদিম প্রথা। অগ্নিসংস্কার প্রথা ক্রমে যে আর্য্য সমাজে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখও ঋকৃবেদ হইতেই এই প্রবন্ধের প্রারম্ভভাগে (২৫৩ পৃষ্ঠা) দেখান হইয়াছে। আর্য্য সমাজে যখন অগ্নিসংস্কার প্রথা গৃহীত হইয়াছিল, তখন অনার্য্য সমাজের উচ্চস্তরেও আর্য্য সমাজের অনুকরণে তাহা গৃহীত হইয়াছিল— এইরূপ অনুমানেরও যে এস্থলে অবকাশ নাই—তাহা বলা যাইতে পারে না।

অগ্নি-প্রবেশ বা সতীদাহ-প্রথা।

রামায়ণে সতীর সহমরণের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কৌশল্যা পতি ও পুত্র শোকে আত্মহারা হইয়া একস্থানে বলিয়াছেন—

সহমরণ প্রথা।

"সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম॥" ১২।২।৬৬

অর্থ—আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রত পালনার্থ স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যার মুখে অবগত হওয়া যায়—মৃত পতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ—"পাতিব্রত্য ধর্ম্ম"। তবে তিনি তাহা করিলেন না কেন?

পতির সহিত জীবিত দগ্ধ হওয়া কি পাতিব্রত্য?

পতি, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; পুত্র, মাতার দিকে না চাহিয়া পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন; পুত্রবধূটী পর্য্যন্ত শাশুড়ীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন না; এমন অবস্থায় কৌশল্যার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে কি বাধা ছিল? কৌশল্যা তো সহমৃতা হন নাই? এস্থলে শ্মশানক্ষেত্রে পুরমহিলাগণের কার্য্যকলাপের বর্ণনাটী প্রয়োজন বোধে প্রদত্ত হইল।

রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া যথোপযুক্ত শিবিকা ও

রথাদি আরোহণে (শ্মশান ক্ষেত্রে) নীতা হইলেন। তাঁহারা ঋত্বিক-গণের সহিত শোকাকুল চিত্তে নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন শোকার্ত্তা নারীদিগের রোদন ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। পরে মহিলাগণ রোদন পূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করত সরযূতীরে যাইয়া (পুনরায়) যান হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সেই মহিলাগণ ভরতের সহিত পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ উদক ক্রিয়া সমাধা করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। [১]

সেকালে মৃতপতির সহিত অগ্নিতে প্রবেশ যদি পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বিশ্বসিত থাকিত, তবে এই স্থলে দশরথের বৃদ্ধা পত্নীদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম প্রদর্শনের ও প্রতিপালনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু কোথায়, এখানে তো একজনও তাহা প্রদর্শন করিয়া সেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন না। পাত্র মিত্রগণের মুখেওতো আমরা সে সম্বন্ধে কোন কথা শুনিলাম না। এত দুঃখের চাপ বক্ষে লইয়া কৌশল্যাই বা এখানে নীরব রহিলেন কেন ?

পতি পুত্রহীনা সদ্য বিধবা—আশ্রয় হীনা নারীর পক্ষে এইরূপ অবস্থায় স্বামীর সহিত অগ্নি প্রবেশের উক্তি অস্বাভাবিক নহে। বরং তাহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাকে “পাতিব্রত্য ধর্ম্ম” বলিলে, ইহার উচ্চভাব রক্ষা কল্পে যে আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান দরকার, তাহার উল্লেখ রামায়ণের আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহাকবি অযোধ্যার এই অগণিত পুরস্ত্রী-গুলিকে বিধবা করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি একটীকেও সহমৃতা হইতে দেন নাই কেন? ইহা যদি তৎকালীন সতী-ধর্ম্মের অঙ্গ হইত, নিশ্চয় মহাকবি বাল্মীকি তাহা দেখাইতেন। এই সাড়ে তিন শত

১ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬ সর্গ ১৯—২৩ শ্লোক।

বিধবাকে পতি অনুগামিনী করাইয়া তিনি সমাজ-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন, ইতিহাসেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন।

তখন সহমরণ সমাজ-ধর্ম্মের বা পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল না বলিয়াই রামায়ণে তাহার আভাস নাই। ঋক্‌বেদের নিম্নোদ্ধৃত ঋক্-মন্ত্রটীর ন্যায় নিষেধ-অনুরোধ প্রভৃতিরও কোন অভিনয় রামায়ণে নাই। এই সকল কারণে আমরা কৌশল্যার উক্তির প্রথমাংশটাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি।

সীতার মুখেও এক স্থানে স্বামীর সহিত অনুমৃতা হইবার কথা শুনা যায়। সীতা অশোকবনে রামের মায়ামুণ্ড দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমাকে স্বামীর শরীরের সহিত সংযোজিত করিয়া দেও, আমি স্বামীর অনুগমন করিব।" [২] তারার মুখেও কবি এইরূপ কথা বলাইয়াছেন। বালীর শোকে তারাও বলিয়াছিল—

"হতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্।" ১৩।৪।২১

এই সকল উক্তি অতি স্বাভাবিক। এই উপায়ে যে লোক না মরিয়াছে, তাহাও নয়; তাই বলিয়া এই সকল উক্তিকে সমাজ-অনুমোদিত সহগমন প্রথা বিদ্যমানতার প্রমাণ বলিয়া বলা যাইতে পারে না; অথবা তাহা সমাজে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল—ইহাও বলা যাইতে পারে না।

আশ্রয় হীনা স্ত্রীর স্বামীর সহিত মৃত্যুর ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক। ঋক বেদে এইরূপ ইচ্ছার একটী দৃষ্টান্ত আছে। সেই ঋক্ মন্ত্রটী এইরূপ :—

"হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস! যিনি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন,

২ লঙ্কাকাণ্ড ৩২ সর্গ ৩২ শ্লোক।

সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে।" ৩

ইহা মৃত ব্যক্তির আশ্রয় হীনা বিধবার প্রতি প্রবোধ বাক্য। সতীদাহ প্রথা বৈদিকযুগে প্রচলিত থাকিলে এবং তাহা পাতিব্রত্যের নিদান হইলে, পত্নীকে ফিরাইয়া আনিবার এইরূপ উপদেশ বেদে থাকিত না; অনুগমণেরই উপদেশ থাকিত। মৃত পতির সহিত জীবিতা পত্নীর চিতা-সহগমন যে ধর্ম্মসঙ্গত নহে, এই শ্রুতিটী সুস্পষ্টরূপে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে।

এই ঋকৃটী কোন পতিশোকাতুরা স্ত্রীকে পতির মৃতদেহের আলিঙ্গন হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার স্পষ্ট উপদেশ হইলেও এই উপদেশই ধীরে ধীরে যে শাস্ত্রকারগণকে বৈদিক ভাব হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সূত্রযুগের সাহিত্যে তাহার আভাস আছে। ঋক্ বেদের সূত্রকার আশ্বলায়ন এই ঋক মন্ত্রটীর এমন একটা হাস্যজনক অপপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন যে তিনি স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণের ব্যবস্থা না করিলেও তাঁহার উপদেশ বেদমার্গ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং পরবর্ত্তীশাস্ত্রকারগণের আরও দূরে সরিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বেদোত্তর যুগের শাস্ত্রকারগণ বেদের প্রত্যেকটী মন্ত্রের প্রয়োগ দেখাইতে গিয়া যে কিরূপে বেদমার্গ হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন আশ্বলায়নের এই সূত্রটী তাহার একটী দৃষ্টান্ত। সূত্রটীর বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

গৃহ্যসূত্রে ঋক্-মন্ত্রের অপপ্রয়োগ।

"স্বামীকে শ্মশান চুল্লিতে শয়ান করাইলে তাঁহার পত্নী যাইয়া তাঁহার উত্তর পার্শ্বে শয়ন করিবে। তখন তাহার দেবর, অথবা

৩ ঋকৃবেদ ১০।১৮।৮

স্বামীর শিষ্য, অথবা গৃহের পুরাতন ভৃত্য দশম মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ৮ ও ৯ ঋকদ্বয় পাঠ করিয়া তাহাকে মৃতের শয্যাপার্শ্ব হইতে তুলিয়া লইবে। [৪]

আশ্বলায়নের এইরূপ চিন্তা অন্য কোন সূত্রকারকে প্রবোধ দিতে পারে নাই। বোধহয় সেইজন্য অন্য কোন সূত্রকারই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

সূত্র ও স্মৃতির যুগে বেদমন্ত্রের যে প্রয়োজনানুসারে এইরূপ অপব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত খুব বিরল নহে। শুধু তাহাই নহে, পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারেরা যে বেদমন্ত্রের শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াও নিজ সংস্কার অনুসারে তাহার ব্যাখ্যা কারিয়া লইয়াছেন—এইরূপ দৃষ্টান্তও আধুনিক ধর্ম্ম-ব্যবস্থা-গ্রন্থে বিরল নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋক্ বেদেরই একটা ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করা গেল।

বেদ মন্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা।

ঋক্ বেদের ১০ম সূক্তের ৭ম ঋক্‌টী এইরূপ :—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্নাংরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥

হিন্দু সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যাকেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সায়ন এই ঋক্‌টীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ইমা নারীরিতি। অবিধবাঃ (ধবঃ পতিঃ অবিগতপতিকাঃ জীবদ্‌ভর্ত্তৃকাঃ ইত্যর্থঃ) সুপত্নীঃ (শোভন পতিকাঃ) ইমা নারীঃ (নার্য্যঃ) আঞ্জনেন (সর্ব্বতো অঞ্জন সাধনেন) সর্পিষা (ঘৃতেন আক্ত নেত্রাঃ সত্যঃ) সংবিশন্তু (স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু)। (তথা) অনশ্রবঃ (অশ্রুবর্জ্জিতাঃ অরুদত্যঃ) অনমীবাঃ (অমীবা রোগস্তদ্বর্জ্জিতা মানস দুঃখ বর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ) সুরত্নাঃ (শোভন-

৪ আশ্বলায়ন গৃহসূত্র ৪।২।১৬

ধন সহিতাঃ) :জনয়ঃ (জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ) (তা) অগ্রে (সর্ব্বেষাং প্রথমত এব) যোনিং (গৃহং) আরোহন্তু (আগচ্ছন্তু)॥

সায়ন ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত সরল বঙ্গানুবাদ এইরূপ—এই সধবা সুপত্নীগণ তাঁহাদের নয়নকে অঞ্জনযুক্ত ঘৃতে সিক্ত করুন। (তৎপর) শোক পরিত্যাগ করিয়া—অশ্রুরহিত ও রোগ (মানসিক দুঃখ) ত্যাগ করিয়া (অন্য সকলের) অগ্রে গৃহে গমন করুন।

যজুর্ব্বেদের আরণ্যকে এই মন্ত্রকে মৃতের শান্তিমন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সায়নাচার্য্যের এই ব্যাখ্যায়ও তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতেছে। বৌধায়ন, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সূত্রকারগণ যদিও এই মন্ত্র প্রয়োগে ঠিক একমত হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহাদের কেহই ইহাকে বিধবার চিতারোহণের সমর্থক বেদ ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। শান্তি মন্ত্র বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আধুনিক স্মার্ত্ত ব্যবস্থাপক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কিন্তু এই বেদ মন্ত্রটীকে নিজ ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত করিয়া বিষম অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার "শুদ্ধিতত্ত্ব" গ্রন্থে এই মন্ত্রের শেষ শব্দ "যোনিমগ্রে" স্থলে "যোনিমগ্নে" শব্দ গ্রহণ করিয়া বিধবার মৃত স্বামীর সহিত অগ্নিপ্রবেশের বৈদিক ব্যবস্থা রচনা করিয়া দিয়াছেন।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ঋক্ মন্ত্র পরিবর্ত্তন

এইরূপেই আধুনিক হিন্দু শাস্ত্রে সতীর অগ্নি প্রবেশ বিধান প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহাপণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কি সূত্র অবলম্বনে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছিলেন আধুনিক পণ্ডিত সমাজের নিকট সে সূত্র এখনও অজ্ঞাত। [৬]

৬ আমরা এস্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে দোষী প্রতিপন্ন করিতেছি না বটে, কিন্তু দেশী বিদেশী অনেক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাহা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বর্গীয়

সহমরণ, অনুগমন ও চিতারোহণ এক অর্থ প্রকাশক ব্যবস্থা নহে। এগুলি একটির সহিত আর একটি কিরূপ ভাবে অর্থ সামাঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ক্রমে সমাজ ধর্ম্মের ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহার সামান্য আলোচনা এই স্থানে করা যাইতে পারে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ও ভট্ট মোক্ষমুলারের মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় তাঁহার ঋক্‌বেদের অনুবাদে উপরি উদ্ধৃত ৭ম ঋক্‌টীর টীকায় লিখিয়াছেন—ঋক্‌বেদে সতী দাহের উল্লেখ নাই। আধুনিক কালে এই কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋক্‌বেদ সম্মত—এইটী প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত "আরোহন্তু জনয়ো যোনি অগ্রে" র "অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নে" করিয়া এই ঋকের সতী দাহ সম্বন্ধীয় একটী অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন।"

রমেশ দত্ত ও মোক্ষমুলারের মত।

অধ্যাপক মোক্ষমুলার এই পরিবর্ত্তনের আলোচনায় লিখিয়াছেন :—

This is perhaps the most flagrant instance of what can be done by an unscrupulous priesthood. Here have thousands & thousands of lives been sacrificed, and a fanatical rebellion been threatened on the authority of a passage which was mangled mistranslated & misapplied". Selected Essays Vol. I. p. 335.

দত্ত সাহেব এবং অধ্যাপক মোক্ষমুলার ভট্ট রঘুনন্দনকে ইঙ্গিতে দোষী নির্দ্দেশ করিলেও আমরা রঘুনন্দনকেই সতীদাহ ব্যবস্থার আদি ব্যবস্থাপক বলিতে পারি না। কেন না, কতকগুলি স্মৃতি গ্রন্থেও সতী সহগমন ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। যথা—বিষ্ণু সংহিতা (২৫।১৪), অত্রি সংহিতা (২১০), পরাশর সংহিতা (৪। ২৭-২৮), ব্যাস সংহিতা (২।৫৩), দক্ষ সংহিতা ৪।১৯; সুতরাং বেদ মন্ত্রের ভাব গ্রহণ বৈষম্যই যে এইরূপ বিপর্য্যয় ব্যবস্থা সৃষ্টির কারণ তাহাই আমরা অনুমান করিতেছি। সমাজের

পতিব্রতার লক্ষণ সম্বন্ধীয় একটী শাস্ত্র বচন এইরূপ :—

সহমরণ ধর্ম্মের অঙ্গ কেন?

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

বচনের অর্থ—পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথা বোধ করেন, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, স্থানান্তরে থাকিলে যিনি মলিনা ও দুর্ব্বলা (কৃশা) এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা।

বাস্তবিক যাঁহারা পতি অনুরাগিণী, তাঁহাদের এই লক্ষণগুলি ঘটে। মৃত্যুও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নহে। প্রাচীন সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আজ কালকার দিনেও এমন মৃত্যুর সংবাদ খুব বিরল

সংস্কার অনুসারেই যে বেদ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল তাহা অনেক ঘটনায়ই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ঋকটীরই রমেশ বাবুর ব্যাখ্যা এস্থলে প্রযোজ্য হইতে পারে। রমেশ বাবুর সংস্কার—প্রাচীন ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল; সুতরাং এই ঋকটীকে তিনি বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের একটী পোষক ঋকরূপে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এইরূপ :—

রমেশ দত্তের ব্যাখ্যা।

এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন, এই সকল বধু অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আরণ্যক যে মন্ত্রকে পিতৃমেধ প্রকরণে শান্তি মন্ত্র বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন, সায়নাচার্য্য যাহাকে বিধবা নারীর অঞ্জন গ্রহণের শান্তি মন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুপণ্ডিত দত্ত সাহেব তাহার এ কি অনুবাদ করিলেন! ভট্ট রঘুনন্দনইবা তাহার এ কিরূপ ব্যাখ্যা ও পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন! অবশ্য তাঁহাদের কাহার এইরূপঅনুবাদের ও ব্যাখ্যার বা পরিবর্ত্তনের কি সূত্র বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা বৈষম্যগুলির উল্লেখ করিয়াই এস্থলে নীরব রহিলাম।

নহে। এই "মৃতে ম্রিয়তে" ভাব হইতেই সহমরণ বোধহয় ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়াছে। এই সহমরণ মৃতস্বামীর সহিত জীবিতা পত্নীর অগ্নি প্রবেশ নহে।

মহাভারতে জীবিতা পত্নীর মৃতপতির চিতায় প্রবেশ করিয়া মৃত্যুর কথা নাই। কিন্তু সহমৃতার কথা আছে। পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী—নকুল ও সহদেবের মাতা মাদ্রী পাণ্ডুকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া নিজেও সেই সময়েই স্বইচ্ছায় স্বামীর শরীরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে মহাভারতের বর্ণনাটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মহাভারতে সহমরণ প্রসঙ্গ।

আদিপর্ব্বের ১২৫ অধ্যায়ের শেষ অংশে আছে—"মদ্ররাজ দুহিতা, কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।" (মহাভারত—কালীসিংহ।)

অতঃপর ১২৬ অধ্যায়ে আছে—"মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চবালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতকলেবর লইয়া ... ... হস্তিনা নগরে গমন করিলেন। ... ... এবং বলিলেন ...। সেই মনুজ সপ্তম রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিব্রতা মাদ্রীও পতির লোকান্তর প্রাপ্তি দর্শনে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর এই শব শরীরদ্বয় লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।"

(মহাভারত—কালীপ্রসন্ন সিংহ।)

উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে মাদ্রী যে স্বামীর সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া

প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

মাদ্রীর সহমরণ অগ্নি প্রবেশ নহে।

এইরূপ সহমরণই প্রকৃত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। কিন্তু প্রক্ষিপ্তকারগণ কেবল রামায়ণকেই কলঙ্কিত করেন নাই—বেদ, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত—সকল সাহিত্যকেই কলঙ্কিত করিয়াছেন। মহাভারতের এই ভাবকে মহাভারতের সেই ১২৫শ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেই মাদ্রীর স্বীয় মৃত স্বামীর চিতায় সহগমনের উল্লেখ দ্বারা কলঙ্কিত করা হইয়াছে। মহাভারতের সেই শ্লোকটী এইরূপ—

ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজ-সুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী॥ ১।১২৫

এইরূপ ভ্রষ্ট মতের অনুসরণে পরবর্ত্তী সাহিত্য, সংহিতা, পুরাণ ও কোষ গ্রন্থাদিতে মাদ্রীর চিতারোহণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা মহাভারতের উদ্ধৃত বিস্তৃত গদ্য অংশের বিবরণ হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে।

যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত আধুনিক স্মৃতি সংহিতাগুলির প্রচার কাল হইতে রঘুনন্দনের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন কাল পর্য্যন্ত যে ভারতীয় সমাজের সর্ব্বত্রই সহমরণ ব্যবস্থাকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদনীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল—তাহাও নহে।

মনুর বিরুদ্ধ মত।

প্রাচীন মানব ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু এই ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ঐতিহাসিক যুগের কাব্যকারগণও বিষয়টাকে ধর্ম্ম ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই; বরং রাজকবি বাণভট্ট, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি এইরূপ ভাবে চিতায় অনু-গমনকে দোষণীয় এবং আত্মহত্যার ন্যায় পাপজনক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। বাণভট্টের কাদম্বরীতে মহাশ্বেতার প্রতি

কালিদাস ও বাণভট্টের মত।

চন্দ্রাপীড়ের উক্তিতে এবং কালিদাসের রঘুবংশে অজের প্রতি বসিষ্ঠের উক্তিতে ইহা সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাণভট্ট বহু প্রাচীন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন—ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য।

আমাদের মনে হয়—সহমরণ প্রথা যখন বৈদিক ধর্ম্মের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছিল এবং সেই ভাব রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ গ্রন্থগুলিতে প্রক্ষিপ্তরূপে প্রবেশ করিতেছিল তখন ঐ মতের বিরুদ্ধে যে প্রতিপক্ষ মণ্ডলী সৃষ্ট হইয়াছিল—বাণভট্ট, কালিদাস প্রভৃতির উক্তি সেই প্রতিবাদী দলের উক্তিরই সুস্পষ্ট আভাস।

উত্তরকাণ্ডে সহমরণ।

এই বিপ্লব যুগেই—অর্থাৎ যখন সমাজে বেদমন্ত্রের অপব্যাখ্যা চলিয়াছিল—বোধ হয় রামায়ণেও এই ভাবটী প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। রামায়ণের পরিশিষ্ট উত্তরকাণ্ড এই বিপ্লব যুগের রচনা। উত্তরকাণ্ডে সতীদাহের উল্লেখ আছে; তথায় বেদবতীর মুখে শুনা যায়, তাহার মাতা স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় কোন কোন পুরাণ-উপপুরাণে—

পুরাণে অগ্নি-প্রবেশ কথা।

স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রী দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত থাকিলে সেই বিরহী স্ত্রীর স্বর্গে স্বামীসঙ্গলাভের জন্য—অগ্নিতে আত্মহত্যার ব্যবস্থাও সমীচীন বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছিল।[৭]

বাহুল্য ভয়ে এই আলোচনার এই স্থলেই উপসংহার করিলাম।

অতিথি সৎকার, গোপালন, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিও রামায়ণে সমাজধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্থানান্তরে এগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করা হইল।

---

৭ পদ্মপুরাণে মৃত স্বামীর জন্য পত্নীর আত্মহত্যা করিবারও উপদেশ আছে। ১ম খণ্ড। ৬৫ম অধ্যায় ৬৮—৯৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

সামাজিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মানব সমাজের প্রধান আচরণীয় সমাজ-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করা হইয়াছে; বর্ত্তমান অধ্যায়ে ঐ সকল বিষয়ের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান রীতির সহিত তৎকালীন অন্যান্য সামাজিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌকিক ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের আলোচনা করা গেল।

সামাজিক সাধারণ ক্রিয়া-অনুষ্ঠানের সহিত লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীন ভারতে সর্ব্বত্র অল্প-বিস্তর বিদ্যমান ছিল। ইয়ুরোপের প্রাচীন সমাজ—এমন কি আধুনিক সভ্যতা গর্ব্বিত ইয়ুরোপীয় সমাজও এই লৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। অসভ্য সমাজেতো সর্ব্বত্রই লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ক্রিয়া কাণ্ডের রীতি পদ্ধতিও সেই অনুসারে সংশোধিত ও সংস্কৃত হইতে থাকে।

বৈদিক যুগে যজ্ঞই একমাত্র ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়া ছিল। বিবিধ মন্ত্রের সাহায্যে যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই কর্ম্ম সম্পাদন ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইত। বৈদিক যুগের পর ক্রমে কর্ম্ম জগৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেবল যজ্ঞেই মানুষের মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিত না, লৌকিক অনুষ্ঠানও মনের সান্ত্বনা বিধান জন্য মানুষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছিল। এইরূপে ক্রমে সুশৃঙ্খল সামজিক জীবনে মানুষ বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সহিত যজ্ঞ ব্যতীত আরও অনেক লৌকিক আচার অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিল।

রামায়ণী যুগে কি কি সামাজিক ও লৌকিক অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল এবং সেগুলি কিরূপ রীতি-পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইত—এই অধ্যায়ে তাহাই প্রদর্শিত হইল।

জাত-কর্ম্ম।

শিশুর জন্মকেই সমাজ জীবনের আদি ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। রাম লক্ষ্মণাদি কুমারগণের জন্মই রামায়ণের প্রথম ঘটনা। এই ঘটনাকে অযোধ্যার সমাজ মহাসমারোহে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সমারোহের বিশেষ কারণও ছিল। সে কারণ—বৃদ্ধ রাজা দশরথের অপত্যহীনতা। এই স্বাভাবিক কারণ ব্যতীতও সন্তানের জন্ম পরিবারে আনন্দ ও উৎসব সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেই আনন্দের কারণ—অপত্য, স্বর্গ লাভের নিদান।

আর্য্য সমাজে স্বর্গ ও নরকের বিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল হইতে পোষিত হইয়া আসিতেছিল। পুত্রহীনের নরক ভোগের ত্রাসের আভাস বৈদিক সাহিত্যে খুব স্পষ্ট না থাকিলেও পুত্র পৌত্র যে স্বর্গলোক প্রাপ্তির হেতু, এই বিশ্বাস বৈদিককালে ভারতীয় আর্য্যেরা পোষণ করিতেন। রামায়ণেও এই জন্যই অপত্য-হীন রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়।

পুত্র স্বর্গলাভের হেতু।

রামায়ণের এক স্থলে পুত্র যে নরক হইতে পিতৃলোককে ও পিতাকে ত্রাণ করে এবং সেইজন্য তাহার নাম পুত্র—একটী প্রসিদ্ধ স্মৃতির বচন দ্বারা তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। রামায়ণের শ্লোকটী এইরূপ:—

'পুন্নাম নরক' কল্পনা আধুনিক।

"পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ॥ ১২।২।১০৭

"পুন্নাম নরক" কথা কত প্রাচীন, তাহা বলিবার উপায় নাই।

কোন বৈদিক সাহিত্যে এই নরকের নাম আমরা দেখিতে পাই না। এই শ্লোকটী বিষ্ণুসংহিতায় আছে।[১] রামায়ণকে আমরা যত প্রাচীন মনে করি 'পুন্নাম নরক' কল্পনাকে আমরা তত প্রাচীন বলিবার নিদর্শন পাই না; এই জন্যই শ্লোকটী স্মৃতিকারেরা রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মনে না করিয়া কোন প্রক্ষিপ্তকার স্মৃতির উক্তিই রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছি।

বৈদিক সাহিত্যের মত।

'পুন্নাম নরক ত্রাণের' কথা বৈদিক সাহিত্যে না থাকিলেও পুত্র যে অমরত্ব লাভের উপায়, তাহা ঋকবেদে উক্ত হইয়াছে।[২] এবং এই ভাব ব্রাহ্মণ[৩] ও সূত্র গ্রন্থে বিশ্লেষিত হইয়াছে। বসিষ্ঠ সূত্র করিয়াছেন—যাহার পুত্র নাই, তাহার কোথাও স্থান নাই।[৪] পুত্র ও পৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।[৫] বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুত্রের কর্ত্তব্য ও পুত্র শব্দের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাহা এইরূপ —'পুত্র পিতার কর্ত্তব্য পূরণ দ্বারা পিতাকে ত্রাণ করেন, সেই জন্য সন্তানের পুত্র নাম সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ।[৬]

যাহা হউক, পুত্র দ্বারা যে উত্তম গতি লাভ করা যায়, এই জ্ঞান প্রাচীনতম সমাজেও ছিল; সুতরাং পুত্রের জন্ম পরম আনন্দের বিষয় ছিল।

---

১ বিষ্ণু সংহিতা ১৫। ৪৩ শ্লোক।

২ ঋক্ বেদ ৫। ৪। ১০

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭। ৩। ৯; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১। ৪। ৪৬। ১

৪ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭। ২

৫ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১৭। ৫

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ১। ৫। ১৭
বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্তি 'পুন্নাম নরক' কথার বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।

রামলক্ষ্মণাদির জন্মের দিন অযোধ্যায়ও আনন্দ উৎসব হইয়াছিল। নট, নর্ত্তক ও বাদকগণ নৃত্য গীত বাদ্যে রাজধানী মুখরিত করিয়াছিল। রাজা দশরথ পরমানন্দে মুক্ত হস্তে ব্রাহ্মণ, সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে ধন রত্ন ও গোদান করিয়াছিলেন।

আমোদ আহ্লাদ ও দানাদি ব্যতীত সে দিনের আর কোন অনুষ্ঠানের কথা রামায়ণে প্রকাশ নাই।

আধুনিক কালে উলুধ্বনি দ্বারা যে জাতকের অভিনন্দন করিবার ও পরিবারের আনন্দ ঘোষণা করিবার প্রথা আছে সেকালে তাহা ছিল না। জাত কর্ম্মের অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলির প্রকার এবং রীতির উল্লেখও রামায়ণে নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে [৭] জাতকর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে রামায়ণের যুগে তাহা ছিল বলিয়া প্রকাশ পায় না।

অতঃপর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ দ্বারা ছেলেদিগের নামকরণ করাইয়াছিলেন। নামকরণে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, কি না, তাহার কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই।

নামকরণ।

মহাভারতেও নামকরণের কথা আছে, কিন্তু কোন অনুষ্ঠানের উল্লেখ নাই।[৮] নামকরণের দিনও রাজা দশরথের অনুজ্ঞানুসারে বসিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদদিগকে ভোজন করাইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ রত্নরাজি দান করিলেন। [৯]

উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ রামায়ণে নাই। রামাদির জাত কর্ম্ম সমূহের স্থলে—

তেষাং জন্ম ক্রিয়াদীনি সর্ব্বকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ।

---

৭ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬। ৪। ২৫

৮ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৪ অধ্যায়।

৯ রামায়ণ আদিকাণ্ড ১৮ সর্গ।

এই মাত্র উল্লেখ আছে। এইরূপ উল্লেখ দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের 'উপনয়ন' প্রথার ন্যায় কোন কার্য্যের আভাস পাওয়া যায় না।

উপনয়ন—টীকাকারের ব্যাখ্যা।

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। তিনি আধুনিক সংস্কার অনুসারে রামায়ণের অনেক স্থানের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাম বনে গমন কালে কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখ পরিক্ষয়ম। ৪৫। ২। ২০

এই শ্লোকের "জাতস্য" শব্দের ব্যাখ্যা স্থলে রামানুজ উপনয়ন সংস্কারের আভাস দিয়াছেন। এই আভাস অনুসারে পণ্ডিত পঞ্চানন

অনুবাদকগণের ব্যাখ্যা।

তর্করত্ন সম্পাদিত রামায়ণে এই শ্লোকের অনুবাদ করা হইয়াছে—"তোমার দশম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বৎসর কাটাইয়াছি···।"পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"উপনয়নের পর আজ তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে ···।"

ইঁহারা উভয়েই মহাপণ্ডিত লোক। অথচ তাঁহাদের এই উভয় ব্যাখ্যাই পরস্পর বিরোধী, এমন কি প্রকৃত তত্ত্বেরও বিরোধী।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ রামের বয়স নির্দ্দেশ স্থলে যদিও পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, (২১৩ পৃঃ) তথাপি উপস্থিত বোধসৌকর্য্যার্থে পুনরায় প্রদান করা গেল। এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অতি স্পষ্ট। মাতা কৌশল্যা রামের বনবাস বার্ত্তা শুনিয়া সকল আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া রামকে বলিতেছেন—"তোমার জন্মের পর এই সপ্তদশ বর্ষ কাল আমি আমার দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া আছি।"···

ইহাতে উপনয়নের কোন কথাই নাই। আধুনিক সংস্কার দ্বারা

প্রাচীন গ্রন্থের ভাব গ্রহণ ঐতিহাসিকের চক্ষে এই জন্য নিরাপদ নহে।

বেদে উপনয়ন রীতির উল্লেখ নাই। বেদ রচনা কালের পরে বেদ খুব আদরের ও সম্মানের জিনিস হইয়াছে। তখন সকল গৃহস্থই (গৃহমেধিন্) বেদ কণ্ঠস্থ রাখিয়া তাহা নিত্য পাঠ করিতেন। রামায়ণের যুগেও এই রীতিরই প্রভাব লক্ষিত হয়। রাম বনে গমনের দিন অতি দুঃখে কোন গৃহস্থই বেদ পাঠ করিতে পারেন নাই। (৮৮ পৃষ্ঠা পাদটীকা সহ দ্রষ্টব্য) ক্রমে এই রীতি শিথিল হইয়া আসিতে থাকিলে বেদ-পাঠ-শিক্ষার জন্য মানবককে গুরুর নিকট যাইয়া দীক্ষা লইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই রীতিকেই দীক্ষা বা উপনয়ন সংস্কার বলিয়া অভিহিত করা হইত।

বেদে উল্লেখ অভাব।

রামায়ণে বেদ পাঠের জন্য গুরু গৃহবাসের ব্যবস্থার কোন বিশিষ্ট উল্লেখ নাই।[১০] ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও সূত্র গ্রন্থগুলিতে উপনয়নের উল্লেখ আছে।

---

১০ রামায়ণের টীকাকার—রাবণ গুরুগৃহে পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের একটী প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্লোকটী এই (রাবণকে সুপার্শ্ব বলিতেছেন)—

হন্তুমিচ্ছসি বৈদেহীং ক্রোধাদ্ধর্ম্মমপাস্যচ॥ ৫৯
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্ম্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর॥ ৬০। ৬। ৯৩

ব্রতস্নাত বা স্নাতক শব্দের ভাব খুব প্রাচীন নহে। উপনিষদের পূর্ব্বের কোন বৈদিক সাহিত্যে এই শব্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের আদি রচনায়ও তাহা নাই। থাকিলে আর্য্যসমাজের দশরথ এবং রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিষয়েও তেমন উল্লেখ দেখিতে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারিত। আমাদের মনে হয়, সূত্রগ্রন্থ গুলিতে "সমাবর্ত্তন" ব্যবস্থা বিহিত হইলে সেই সঙ্গেই "স্নাতক", "ব্রতস্নাত" প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই উপনয়ন বা শিক্ষার জন্য দীক্ষা গ্রহণের প্রথম আভাস আমরা পাই। উপনিষদে ইহার বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বেদ পাঠ অভ্যাস করিতে মানবকের যে প্রাথমিক বিশেষ জ্ঞান, দৃষ্টি বা নয়ন (preliminary insight) প্রয়োজন, সেই প্রাথমিক চক্ষুদান বা নয়ন দানের প্রতিশ্রুতিকেই যেন উপনিষদে 'উপ+নয়ন' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। উপনয়নের ব্যাকরণ সঙ্গত অর্থও আছে। তাহা উপ+নী +অনট করিয়া; অর্থ—উপ—সামীপ্য, নী—নেওয়া; যে ক্রিয়া দ্বারা গুরু মানবককে নিজের একান্ত সমীপবর্ত্তী করেন। অর্থাৎ আত্ম সদৃশ করেন। স্মৃতির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ও উপনিষদে উপনয়ণ।

গৃহোক্ত কর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাদ্বালস্যোপনয়নং বিদুঃ॥

অর্থাৎ গৃহোক্ত কর্ম্ম অনুসারে গুরুর সমীপে নীত হওয়া রূপ সংস্কারকে উপনয়ন সংস্কার বলে।[১১]

উপনিষদে যেন কেবল বেদ শিক্ষার জন্যই উপনয়ন ব্যবস্থা ছিল— দেখা যায়।

রামায়ণে এ সকল বিষয়ের কোন আভাসই নাই। মহর্ষি বাল্মীকি অনার্য্যরাজ বালীর স্ত্রী তারার মুখে পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়াছেন।

---

১১ শতপথ ব্রাহ্মণের 'উপনয়ন' শব্দের আলোচনায় অধ্যাপক মেক্স্‌মুলারের গৃহ্যসূত্রের মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

"Upanayana i. e. solemn reception of the pupil by the teacher who is to teach him the Veda.

Sacred Book of the East V. XXX page XVIII.

ব্রাহ্মণ যুগে যিনিই গুরুর সমীপে পাঠার্থী হইয়া উপনীত হইতেন, তিনিই গুরুর জ্ঞান স্পর্শে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেন। এই কথাটী শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি।

"আচার্য্যোগর্ভী ভবতি হস্তমাদায় দক্ষিণম্॥
তৃতীয়স্যাম স জায়তে সাবিত্র্যা সহ ব্রাহ্মণঃ।" ১১। ১২

অর্থ—আচার্য্য (শিক্ষার্থীর) দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া গর্ভবান হন। অতঃপর তৃতীয় দিবসে সে সাবিত্রীর সহিত ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই নির্দ্দেশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ যুগে সকলেই উপনীত হইতে পরিতেন এবং উপনীত হইলেই "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত হইতেন।

উপনিষদে যেন কেবল ব্রাহ্মণকেই উপনয়ন দিবার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের গৌতম সত্যকামকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে এইরূপই বুঝা যায়।[১২]

উপনিষদের আভাস।

অতঃপর ক্রমে উপনয়নে ত্রিবর্ণের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তখন "ব্রাহ্মণ" শব্দের স্থলে "দ্বিজ" শব্দে—উপনীত ব্যক্তিকে বুঝাইত। "দ্বিজ" শব্দটী "স্নাতক" শব্দের মতই অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী। রামায়ণের প্রাচীন স্তরের রচনায় এই শব্দগুলি নাই, সন্দেহজনক রচনায় আছে।

উপনয়ন প্রথা এইরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল। অতঃপর সূত্র ও স্মৃতির যুগে তাহা ত্রিবর্ণের অবশ্য করণীয় হইয়াছিল।

---

১২ ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪।৪।৫ (গৌতম-সত্যকাম সংবাদ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিনা উপনয়নেও উপদেশ প্রার্থীকে শিক্ষাদানের উল্লেখ আছে। ৫।১১।৭

রামায়ণ উপনয়ন প্রভাব কালে রচিত হইলে তাহার উল্লেখ রাম লক্ষ্মণাদির জন্ম-কর্ম্ম ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারের বর্ণনায়—যে স্থলে—

"তেষাং জন্ম কর্ম্মণী"...ইত্যাদি ও

রামায়ণের আলোচনা। "সর্ব্বে বেদবিদঃ শূরাঃসর্ব্বে লোক হিতেরতাঃ॥ ২৫

"সর্ব্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।"

ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে, বালকাণ্ডের সেই ১৮শ সর্গেই তাহার কোন না কোন আভাস আমরা পাইতাম। এইরূপ স্থলে কবি কালিদাস তাহা করিয়াছেন—রঘুবংশে রাম লক্ষ্মণাদির উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ আছে। রামানুজের টীকায়ও সেই যুগপ্রভাবই বিদ্যমান।

উপনয়ন প্রসঙ্গে যজ্ঞসূত্র বা উপবীত গ্রহণ প্রথাও আলোচ্য। রামায়ণে সর্ব্বদা যজ্ঞসূত্র ধারণ প্রথার কোন উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রামায়ণের দুই এক স্থলে যজ্ঞসূত্রের উল্লেখ আছে; স্থানগুলি সন্দেহ জনক। একটী—বাল-কাণ্ডের ৪র্থ সর্গের একাদশ শ্লোক। এই সর্গটী যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (৫১ পৃষ্ঠা)

উপবীত বা যজ্ঞসূত্র।

রামায়ণের যে সকল স্থানে যজ্ঞোপবীতের উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থান সন্দেহজনক হইলেও যজ্ঞোপবীত বা ব্রহ্ম-সূত্র জিনিষটী প্রাচীন। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতায় উপবীতের আছে। ঐ গ্রন্থে তিন জাতির তিন প্রকার সূত্র ছিল এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাহা বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। শুক্ল যজুর বাজসনেয়ী শাখায় শতপথ ব্রাহ্মণে উপবীত ব্যবহারের স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের উক্তি পরে উদ্ধৃত হইল।

যজ্ঞসূত্রের প্রাচীনতা।

তৈত্তিরীয় সংহিতার শ্রুতিটী এইরূপ—

"নিবীতং মনুষ্যাণাং, প্রাচীনাবীতং পিতৃনাম, উপবীতং দেবাণাম।"

তৈঃ সং ২। ৫। ১১। ১

শতপথের ব্যাখ্যা—নিবীত মনুষ্যের, প্রাচীনাবীত পিতৃলোকের এবং উপবীত দেবতাদিগের ধারণীয়।

সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে—নিবীত, প্রাচীনাবীত ও উপবীত।

এই তিন জাতির তিনটী অধিকারের কথা শতপথে একটী আখ্যায়িকা দ্বারা ব্যাখাত হইয়াছে। গল্পটী এই—একদা সমস্ত ভূত জগৎ (দেবগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ) প্রজাপতির নিকট স্ব স্ব জীবন যাত্রার বিধান্ ব্যবস্থার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবগণ উপবীতী হইয়া, পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া এবং মনুষ্যগণ (বসন) প্রাবৃত (সায়ন ব্যাখ্যা নিবীত) হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।[১৩] প্রজাপতির বিচার ফল প্রদান এস্থলে অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই আখ্যানভাগ দ্বারা দেবতাগণ, পিতৃলোকগণ ও মানুষগণের কাহাকে কোনরূপ সূত্র ধারণের অধিকারী করা হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায়।

ইহার পর শতপথ ব্রাহ্মণেই পূর্ব্বোক্ত রীতির অনুসরণ করিয়া দেব কার্য্যে, পিতৃ কার্য্যে ও মানুষ কার্য্যে যথা ক্রমে উপবীত, প্রাচীনাবীত ও নিবীতের ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে।[১৪] কাত্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে ইহার বিশেষ নির্দ্দেশই প্রদত্ত হইয়াছে।[১৫] শতপথের এই ব্যবস্থা

১৩। শতপথ ব্রাহ্মণ ২। ৩। ৪। ১

১৪। শতপথ ব্রাহ্মণ ২। ৫। ২। ১২, ১৮, ২৪, ৩৭, ৪০, ৪৩,...

১৫। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৫। ৮। ২৬

হইতে উপবীত যে সর্ব্বদা গলদেশে ধারণ করিয়া থাকিতে হইত, তাহা প্রকাশ পায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন—প্রাচীন আর্য্যেরা আকাশস্থ কাল পুরুষের বা যজ্ঞ যজ্ঞপুরুষের কোমরবন্ধের অনুকরণে উত্তরীয়, উপবীত বা মেখলা কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং যজ্ঞকালে তাহা ব্যবহার করিতেন; পার্শিরা নাকি সেই নিয়মেই আজও উহা ব্যবহার করে। উপবীত ধারণ রীতি প্রবর্ত্তনের আদি ইতিহাস এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু আমরা কোথাও এইরূপ উল্লেখ পাই নাই।

কাল পুরুষের যজ্ঞসূত্র।

যজ্ঞকালে যাজ্ঞিকদের সূত্র ধারণের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে এবং সূত্রগুলিতে তাহা বিশ্লেষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের এই মত আধুনিক 'আহ্নিকতত্ত্ব' গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। আহ্নিকতত্ত্বের উক্তি অতি স্পষ্ট। তাহা এইরূপ—

আহ্নিকতত্ত্বের উক্তি।

যজ্ঞোপবীতে দ্বে ধার্য্যে শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ কর্ম্মণি।
তৃতীয় মুত্তরীয়ার্থং বস্ত্রালাভেঽতি দিশ্যতে॥

অর্থ—যজ্ঞোপবীত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই কার্য্যের জন্য দুইটী প্রয়োজন… উত্তরীয়ের অভাবেও একটী ব্যবহার্য্য।

দুইটী যজ্ঞ সূত্রের এইরূপ ব্যবস্থা বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা ক্রিয়া কালের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, সর্ব্বদা ব্যবহারের ব্যবস্থা নহে।

সূত্রযুগে কোন কোন সমাজে নিত্য উপবীত ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখনও উপনয়ন কালে উপবীত গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এসম্বন্ধে কোন্ সমাজে কিরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল, সূত্রকারগণের সূত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যাইতে পারে।

সূত্রকারগণের ব্যবস্থা।

গৃহ্য সূত্রকার হিরণ্যকেশিন্—উপনীত ব্যক্তি উপনয়ন কালে কি কি ধারণ করিবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া—সূত্র করিয়াছেন "মানবক দণ্ড, মেখলা ও উত্তরীয় ধারণ করিবে।"[১৬] বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্রও এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন।[১৭]

সাংখ্যায়ন মেখলা স্থলে উত্তরীয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন [১৮] এবং সমাবর্ত্তন কালে (অর্থাৎ বেদ পাঠ জন্য গুরু-গৃহ বাসকাল সমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিবার কালে) ঐ দণ্ড-মেখলা-অজিন ইত্যাদি বরুণ মন্ত্রে জলে বিসর্জ্জন করিয়া আসিতে বলিয়াছেন।[১৯]

গোভিল ব্যবস্থা করিয়াছেন—যজ্ঞ করিতে বসিলে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বসিবে; [২০] যদি তাহা না থাকে, যজ্ঞোপবীত স্বরূপ দড়ি, বস্ত্র অথবা কুশসূত্র গলদেশে লইতে হইবে।[২১] গোভিল বিবাহ বাসরে কন্যাকেও উপবীতী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।[২২]

আপস্তম্ব সূত্র করিয়াছেন—বাম স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া যজ্ঞে বসিতে হইবে।[২৩] ধর্ম্মসূত্রে আপস্তম্ব বলিয়াছেন—প্রত্যেকে দুইটী করিয়া বস্ত্র রাখিবে; যজ্ঞকালে যজ্ঞসূত্র যেরূপে রাখিতে হয়, সেই

১৬ হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র ১।২।৮।১০—১২

১৭ বসিষ্ঠ ধর্ম্ম সূত্র ১১।৫২—৬৬

১৮ সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ২।১৩।৩

১৯ সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ২।১৩।৮

২০ গোভিল গৃহ্যসূত্র ১।১।২

২১ গোভিল গৃঃ সূঃ ১।২।১

২২ গোভিল গৃহ্যসূত্র ২।১৯ গোভিলের টীকাকার আধুনিক সংস্কার বশতঃ টীকায় লিখিয়াছেন—যেহেতু স্ত্রীলোকের যজ্ঞোপবীতে অধিকার নাই, সেই হেতু তিনি নিজ উত্তরীয়ই উপবীতের ন্যায় ধারণ করিবেন।

২৩ আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ১।১।৩

নিয়মে উত্তরীয়বস্ত্র হাতের নীচ দিয়া স্কন্ধে রাখিতে হইবে।[২৪] একবস্ত্র হইলে ঐ বস্ত্র কোমরেই বাঁধিয়া রাখিবে। আপস্তম্ব অন্যত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সর্ব্বদা উত্তরীয় বাম স্কন্ধের উপর দিয়া রাখিবে; উত্তরীয় না থাকিলে সূত্র ধারণ করিবে।[২৫]

সাংখ্যায়ন শ্রৌত-সূত্রে বলেন—

যজ্ঞোপবীতী দেব কর্ম্মানী করোতি।
প্রাচীনাবীতী পিত্রাণী ... ... ইত্যাদি

পারস্কর[২৬] এবং আশ্বলায়নও[২৭] আহ্নিক করিবার সময় উপবীতী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

ইহার পর সংহিতার যুগে উপবীত সর্ব্বদা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্মৃতির এই দৃঢ় ব্যবস্থার কারণ হইয়াছিল, বৌদ্ধ বিপ্লব। বৌদ্ধ বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময়—বেদ পাঠের জন্য নহে, বেদের সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য—উপনয়ন নূতন ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছিল এবং উপবীত ধারণ বাধ্যতামূলক হইয়াছিল। সেই দুর্দ্দিনে সমগ্র বেদ পাঠ বাধ্যতামূলক শিক্ষার মধ্যে গণ্য করিলে তাহা আচরিত হওয়া সুকঠিন হইবে বিবেচনায়ই বোধ হয় সমস্ত বেদ পাঠের নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং চারি বেদের চারিটী মাত্র শ্রুতি ("বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়") সন্ধ্যা মন্ত্র রূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

স্মৃতির ব্যবস্থা ও তাহার কারণ।

২৪ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ১। ২। ৬। ১৮

২৫ আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র ২। ২। ৪। ২১—২২

২৬ পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২। ৪

২৭ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৩। ৭। ৩

এই সময়—শূদ্রক কবির মৃচ্ছকটিক রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী। কেন না, মৃচ্ছকটিকে এই যুগধর্ম্মের প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান; উহাতে উপবীত নিয়ত ব্যবহারের আভাস আছে। ইহাও দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সময়ের কথা।

বিবাহ।

রামায়ণের বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতিটী বেশ সরল। ইহাতে সূত্রযুগের বাহুল্য আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

রামলক্ষ্মণাদির বিবাহ শ্বশুরালয়ে, জনক গৃহে হইয়াছিল। রাজা দশরথ বিবাহের সংবাদ পাইয়া বর যাত্রিক সহ মিথিলায় পঁহুছিলে রাজা জনক তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃকার্য্যাদি সম্পাদন করিতে বলিয়াছিলেন। মিথিলাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন—

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ।

রাম লক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু॥ ২৩।১।৭১

অর্থ—রাম লক্ষ্মণের (কল্যাণার্থ) গোদান ও বিবাহের জন্য পিতৃকার্য্য (আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) সম্পন্ন করুন।

রাজা দশরথ যথাবিধি পিতৃকার্য্য করিয়াছিলেন। এবং পুত্রদিগের কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণদিগকে গোধন ও অন্যান্য প্রকারের ধনাদি দান করিয়াছিলেন।

রাম লক্ষ্মণের বিবাহের সম্বন্ধ রাজা দশরথ নিজে স্থির করেন নাই; অথচ রামায়ণে সীতা—"সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষেই সীতা যে "পিতৃকৃতা পত্নী" পরন্তু 'স্বয়ম্বরা' নহেন—তাহা প্রদর্শন জন্য এস্থলেও দু একটী কথার আলোচনা প্রয়োজন।

বিবাহে কন্যাপক্ষের প্রস্তাব ও পাত্রপক্ষের অনুমোদন।

রাম ধনুর্ভঙ্গ করিলেই জনক নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কন্যা প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। তখন তিনি নিজ হইতেই বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন—"আমি আমার সুতা সীতাকে রামের করে প্রদান করিব। আপনি অনুমতি করিলেই রাজা দশরথকে আমার মন্ত্রিগণ দ্বারা সংবাদ দিয়া এখানে আনয়ন করিতে পারি।"

বিশ্বামিত্র সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে অযোধ্যায় লোক প্রেরিত হয়। সেই লোকের সহিত প্রস্তাবটী ছিল এইরূপ—

'আমি আমার বীর্য্যশুল্কা কন্যাকে প্রতিজ্ঞা পালনার্থ আপনার পুত্রের করে সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন—

প্রতিজ্ঞাং তর্ত্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ১০।১।৬৮

এই প্রস্তাবের সহিত লক্ষ্মণের করে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সম্প্রদানেরও প্রস্তাব ছিল।

রাজা দশরথ এই প্রস্তাব পাইয়া নিজ পাত্র-মিত্রের সহিত বসিয়া প্রস্তাবটীর ভাল-মন্দ বিচার করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তাঁহার পাত্র মিত্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—আপনারা দেখুন, মহাত্মা জনকের সহিত যদি আমাদের যৌন সম্বন্ধ চলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে চলুন শীঘ্রই যাইয়া কার্য্য সম্পাদন করি।

যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ।
পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ॥ ১৭।১।৬৮

কর্ত্তব্য স্থির হইলে রাজা দশরথ পর দিনই রাজকীয় আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের সহিত মিথিলায় যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং বিবাহ পিতার সম্মতিতেই ধার্য্য হইয়াছিল।

বরানুগমন প্রথাটী প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আর্য্য সমাজে

প্রচলিত ছিল। রাজা দশরথ বরযাত্রী লইয়া মিথিলায় গমন করিয়া ছিলেন। মহাভারতেও বরানুগমন রীতির উল্লেখ আছে। কোন কোন সূত্র গ্রন্থে স্ত্রী-বরযাত্রীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; রামায়ণে সেরূপ উল্লেখ নাই।

বরানুগমন।

রামায়ণে বিবাহের পূর্ব্বে উভয় পক্ষেরই বংশাবলী কীর্ত্তন করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে বর পক্ষে কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ সূর্য্যবংশের বংশাবলী ও বংশ গৌরব কীর্ত্তন করেন; তৎপর কন্যা পক্ষে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং মিথিলারাজই স্বীয় পিতৃ পিতামহের নামও বংশ গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।[১] সীতাকে অযোনিজা—অর্থাৎ অজ্ঞাত কুলশীলা বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে প্রতিপালক পিতা জনকের পিতৃপিতামহের নাম ও গৌরব কীর্ত্তনের অনুষ্ঠানটা অনাবশ্যক ও অর্থ হীন হইয়া দাঁড়ায়। সীতা যে অযোনিজা তাহার উল্লেখ রামায়ণের মাঝে মাঝের অতি অনাবশ্যক দুই চারিটী স্থানে দৃষ্ট হয়। ঐ উল্লেখগুলি আদি কবির কল্পনা, না পরবর্ত্তী সংগ্রহকার অথবা প্রক্ষিপ্তকারের কল্পনা, বলিবার উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষেই মিথিলা রাজের এই স্পষ্ট ও সরল ব্যবহার, "অযোনিজা" শব্দটীকে সন্দেহজনক করিয়া তুলিয়াছে।

বংশাবলী ও বংশ গৌরব কীর্ত্তন।

সীতার বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালীটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।—জনকের যজ্ঞাগারে এক বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদীর চারিদিকে গন্ধ, পুষ্প, যবাঙ্কুর যুক্ত বিচিত্র কুম্ভ, শরাব, ধূপ পূর্ণ পাত্র, শঙ্খ যুক্ত শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক, কুশ প্রভৃতি রক্ষিত

বিবাহের অনুষ্ঠান প্রণালী।

১ ঋক্‌বেদের সূত্রকার সাংখ্যায়ন কন্যাকেই বংশাবলী উচ্চারণ করিতে বলেন ইহা সূত্রযুগের রীতি।

হইয়াছিল। অপর বেদী মধ্যে রাজা জনক স্বীয় কন্যাদ্বয়—সীতা ও উর্ম্মিলা সহ, উপবিষ্ট হইয়া পাত্র পক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

রাজা দশরথ পুরোহিত ও পুত্রগণ সহ উপস্থিত হইলে জনকের আদেশে বৈবাহিক কার্য্য আরম্ভ হইল। বর পক্ষের কুল পুরোহিত মহর্ষি বসিষ্ঠ ঐ বেদীর উপর সম প্রমাণ দর্ভ (কুশ) মন্ত্রপূত করিয়া আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন; অতঃপর বিধি অনুসারে বহ্নি স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সীতাকে আনিয়া অগ্নির সম্মুখে রামের অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব॥ ২৬

কন্যা সম্প্রদান। প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ পাণিনা।

পতিব্রতা মহাভাগা চ্ছায়েবানুগতা সদা॥ ২৭। ১। ৭৩

অর্থ—আমার তনয়া এই সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক। তুমি তোমার পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অনুগতা থাকিবেন।

কন্যাদাতা জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বর, কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া তিন বার অগ্নি, বেদী, রাজা জনক ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বৈবাহিক কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

এইরূপ নিয়মে চারি ভ্রাতারই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

এই সহজ, সরল ও আড়ম্বর হীন রীতি, সেই সমাজের প্রাচীনতারই

পরিচয় প্রদান করে। পরবর্ত্তী মহাভারতের সমাজের কোন কোন বিবাহ ব্যাপারে এই রীতিরই ক্রম-বিকাশের ভাব প্রকাশ পাইবে।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ যে কোন মাসে হইয়াছিল, তাহার কোন ইঙ্গিত রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুলসীদাসের প্রাদেশিক রামায়ণে—অগ্রহায়ণ মাসে মঙ্গলবারে রোহিণী নক্ষত্রে সীতার বিবাহ হইয়াছিল—বর্ণিত হইয়াছে।

বিবাহের সময়।

রামায়ণী যুগে বার গণনা প্রচলিত ছিল না; (রামায়ণের সভ্যতা—জ্যোতিষ শাস্ত্র দ্রষ্টব্য) সুতরাং তুলসীদাসের নির্দ্দেশ নিরাপদে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অগ্রহায়ণে বিবাহ হওয়া অসম্ভব নহে। বিবাহ দিবা ভাগে হইয়াছিল, তাহা আদিকাণ্ডের ৭৩ম সর্গের ৮ম শ্লোক—"প্রভাতে পুনরুত্থায়" হইতে ১৪ শ ১৫ শ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তী যুগের সূত্রকারগণও দিবা ভাগেই বিবাহ ব্যবস্থা প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির বিবাহ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিচার করিয়া যেন হয় নাই; বোধ হয় কন্যাদিগের বয়সের বিচারেই হইয়াছে। অগ্রে রামের সহিত সীতার, তৎপর লক্ষ্মণের সহিত উর্ম্মিলার; শেষ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত যথাক্রমে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির বিবাহ হইয়াছিল।[২] বয়সের মর্য্যাদায় বিবাহ হইলে রামের পরেই ভরতের বিবাহ হওয়া উচিত ছিল; কেন না, জন্ম নক্ষত্রের গণনায় ভরত লক্ষ্মণের অগ্রজ। (রামায়ণের সভ্যতা দ্রষ্টব্য)

বিবাহে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিচার।

একস্থানে জনককে লক্ষ্য করিয়া রাজা দশরথ বলিয়াছেন—

প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা ॥ ১৪। ১। ৬৯

অর্থ—প্রতিগ্রহ দাতার আয়ত্ব। দান বিষয়ে দাতার ইচ্ছা অনুসারেই

২ রামায়ণ আদিকাণ্ড ৭৩ম সর্গ ৩০—৩৪ শ্লোক।

কার্য্য হইবে। এখানেও কি সেই রীতিই অনুসৃত হইয়াছিল?

সূত্র [৩] ও স্মৃতিতে [৪] এই অগ্রজ-লঙ্ঘন বিবাহ-ব্যাপারকে প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া নিন্দিত করা হইয়াছে। অথচ রামায়ণে এসম্বন্ধে কোন পক্ষ হইতেই অনুমাত্রও আপত্তির আভাস উত্থিত হয় নাই। সূত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থার প্রতি এইরূপ উদাসীনতা—রামায়ণের সমাজের প্রাচীনতারই পরিচায়ক। রামায়ণী যুগে সূত্র ও স্মৃতির ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিলে এ স্থলে এরূপ অসঙ্গত ও প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে কখনও দেওয়া হইত না।

অগ্রজ-লঙ্ঘন সূত্র ও স্মৃতিতে নিন্দিত।

রামায়ণে বর্ণিত সীতার বিবাহের চিত্র এমন সরল ও মধুর যে এই অনাবিলতার জন্যই এই চিত্রটীকে কেহ কেহ খুব প্রাচীন সামাজিক চিত্র বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—রামায়ণের যুগ যদি বৈদিক যুগের অবসানের ও মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগ হয় তবে এ চিত্র সেই সময়কার চিত্র হইতেই পারে না। কেন না,—প্রাচীন যুগের সমাজ-ধর্ম্ম খুবই আবিলতা-পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মতে মহাভারতের সমাজ তাহার প্রমাণ।

বিবাহ রীতির প্রাচীনতা ও অসমীচীনতা বিচার।

বাস্তবিক পক্ষেই মহাভারতে এমনই কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে যে স্থূল ভাবে চিন্তা করিলে এই রূপ দ্বিধাবোধ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ঋক্ বেদোক্ত 'সুন্দরী রমণীর সহজে পুরুষ লাভের' ঋক্‌টী আলোচনা

৩ বসিষ্ঠ ধর্ম্মসূত্র ১।১৮; ২০।৮—৯ গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১৫।১৮ বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র ২।১।১।৪০; ৪।৭।৭

৪ অত্রিসংহিতা ১০৪; বিষ্ণুসংহিতা ৫৪।১৬; কাত্যায়ন সংহিতা ৬।৩; পরাশর সংহিতা ৪।২১

করিয়া যদি মহাভারতের অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, সুভদ্রা, দ্রৌপদী প্রভৃতির বিবাহের ব্যাপার মনে অঙ্কিত করিয়া লইয়া বিচার করা যায়, তবে সীতার বিবাহ চিত্রকে গৃহ্য-সূত্র-যুগের ব্রাহ্ম অথবা প্রজাপত্য বিবাহ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিবাহ ব্যাপারে এই রূপ অনাবিলতা খুব প্রাচীন নহে—এই এক শ্রেণীর মত। এই মতের ভিতর যেমন যুক্তি আছে, তেমনি অন্ধতাও আছে।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মত—জনক রাজা যখন বিবাহের মন্ত্র ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত নিজেই উচ্চারণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন তখন নাকি ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে রামায়ণ বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ্য শক্তি পতনের পরবর্ত্তী এবং সেই শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী—বিপ্লব মধ্যবর্ত্তী সময়ে লিখিত হইয়াছিল। সীতার বিবাহ চিত্রটীও সুতরাং এই সময়েরই সামাজিক আচরণের একটী চিত্র।

এই দ্বিতীয় মত একদেশদর্শী এবং অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়।

এই উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রামায়ণী সমাজের প্রাচীনতা দেখাইতে হইলে—সমাজে বিবাহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস—আলোচনা দরকার। বাস্তবিক পক্ষেই মহাভারতে এমন কতকগুলি রীতি প্রথার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা সাধারণ বিচারে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অসংস্কৃত সমাজের আচার বলিয়াই মনে হয়; ঐ সকল হীন পদ্ধতির সহিত তুলনায় রামায়ণের এই সীতার বিবাহ অতি সহজেই সুসংস্কৃত পদ্ধতির বিবাহ বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।

ঋক্ বেদে আর্য্য সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সমাজের প্রাথমিক সভ্যতার চিত্র। ইহার পূর্ব্বের ইতিহাস কোন জাতিরই নাই। না থাকিলেও বেদ-বাইবেল-আবেস্তা প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মানব জাতির আদিম অবস্থার অর্থাৎ প্রাক্‌বৈদিক

যুগেরও ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল প্রাচীন ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে আদিম মানব সমাজে কোন দাম্পত্য বিধি ছিল না। স্ত্রী পুরুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় পশু পক্ষীর ন্যায় অবিচারে সঙ্গত হইত।

বিবাহের প্রাচীন ইতিহাস।

এই স্বেচ্ছাচার সঙ্গকে মরগেন, ডেনিকার, ওয়েষ্টারমার্ক, প্রভৃতি [৫] পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Promiscuous-marriage [৬] বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাভারতে প্রাচীন কালের প্রসঙ্গে এই চিত্রের উল্লেখ আছে। [৭]

সঙ্গ বা "সাঙ্গা"

এই স্বেচ্ছাচার সঙ্গ-যুগের পর দ্বিতীয় অবস্থায় রক্ত সম্বন্ধীয় পারিবারিক জন বৃদ্ধি হইতে থাকিলে আদিম সমাজে পারিবারিক বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। তখন ভ্রাতা-ভগিনী-সঙ্গ অথবা ঐ রূপ রক্ত সম্পর্কীত সঙ্গই যৌন মিলনের পক্ষে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই হীন প্রথাটীর যুক্তি তর্কের আভাস ঋক্ বেদের যম যমীর কথোপকথনে [৮] এবং প্রচলিত রীতির আভাস খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শাক্য সমাজে [৯] ও তৎপরবর্ত্তী কালের কোন

পারিবারিক সঙ্গ।

---

৫ Morgan's Ancient Society; Deniker's Races of Man; Westermarck's History of Human Marriage.

৬ "মেরেইজ" অর্থ অধুনিক বিবাহ। আদিম কালের এই অবস্থাকে বিবাহ বলা আমরা সঙ্গত মনে করিলাম না। আমরা এই প্রথাকে 'সঙ্গ' আখ্যা প্রদান করিলাম। সঙ্গ শব্দ (intercourse) হইতেই বোধ হয় 'সাঙ্গা' কথাটীর উদ্ভব হইয়াছে। "সাঙ্গা" বিবাহ নহে—সঙ্গ করা মাত্র।

৭ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

৮ ঋক্ বেদ ১০। ১০ সূক্ত।

৯ দশরথ জাতকের আলোচনা দ্রষ্টব্য। (১৪২—১৪৫ পৃঃ)

কোন ভারতীয় সমাজের[১০] আলোচনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রথার কুফল লক্ষ্য করিয়া আদিম সমাজ—এইরূপ রক্ত-সম্বন্ধ-প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

ইহার পর সঙ্ঘ-সঙ্গ বা Group marriage প্রথা প্রচলিত হয়। এই অবস্থা সমাজের তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় এক স্ত্রী বহু ভর্ত্তা গ্রহণ করিতে পারিত। মহাভারতের কবি আদিম মানব সমাজের এই তৃতীয় অবস্থার দৃষ্টান্তই দ্রৌপদীর বিবাহে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে বেদমন্ত্রটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত (২২৬ পৃঃ) হইয়াছে ঐ মন্ত্র এই রীতির বিরোধী সুতরাং এই রীতি যে প্রাক্ বৈদিক যুগের, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

সঙ্ঘ-সঙ্গ।

আদিম সমাজের চতুর্থ অবস্থায় যুগ্ম-সঙ্গ (Pairing family system) প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথার স্থায়িত্ব স্ত্রী পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। এই অবস্থায় স্ত্রী ইচ্ছা করিলে অন্য পুরুষেরও সঙ্গ করিতে পারিত।

যুগ্ম-সঙ্গ।

মহাভারতের কবি এই অবস্থার কথাই শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে বর্ণন করিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে—শ্বেতকেতুই সমাজের এই হীন ভাব দর্শন করিয়া এই প্রথার সংস্কার করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত চারি অস্থাতেই পরিবারে স্ত্রীর কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত এবং পুত্র কন্যা প্রভৃতি মাতার নামে পরিচিত হইত; ধন সম্পত্তিও স্ত্রীর হইত। এই পরিবারিক প্রথার নাম পণ্ডিতেরা Matriarchate family রাখিয়াছেন, আমরা 'মাতৃবাচ্য পরিবার'—নির্দ্দেশ করিলাম।

মাতৃবাচ্য পরিবার।

১০ মহাবংশের উল্লেখ দ্রষ্টব্য। (১৪৫ পৃঃ পাদটীকা)

এই অবস্থার পরের অবস্থাই ঋক্ বেদে বর্ণিত সুসংস্কৃত অবস্থা। পূর্ব্বে ছিল মাতৃ পরিচয়ে পরিচিত পরিবার, ঋক্ বেদের সমাজ হইল পিতৃ পরিচয়ে পরিচিত Patriarchate family বা "পিতৃবাচ্যা পরিবার।"

পিতৃবাচ্যা পরিবার।

এইরূপে ক্রমে অসভ্যতার উপর সভ্যতা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সংস্কার প্রভাবে সুসংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন সমাজের দূষিত ভাবগুলি সেই সুসংস্কৃত সমাজ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়—তাহা নহে। সমাজের উচ্চস্তর হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইলেও নিম্নস্তরে তাহা লুপ্ত ভাবে আশ্রয় লাভ করিয়া সঞ্চিত থাকে এবং অবসর পাইলেই আপন প্রভাব বিস্তার করিতে প্রয়াস পায়। ইহা সমাজ শরীরের প্রকৃতি সিদ্ধ নিয়ম। "সমাজ ধর্ম্ম" প্রসঙ্গের প্রারম্ভে এই কথারই আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। (১৯৪—১৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সমাজ ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ঋক্‌বেদের বিবাহ সম্বন্ধীয় তিনটী মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মন্ত্র তিনটীর ভাব এইরূপ—

১। পিতা নিজে কন্যা সম্প্রদান করিতেন; পিতার অভাবে কন্যার ভ্রাতাও তাহাকে সম্প্রদান করিতে পারিত। (২০০ পৃষ্ঠা)

২। দেবরকে সন্তান উৎপাদনে নিয়োগ করা যাইত। (২২৩—২২৪ পৃঃ)

৩। তখনকার সমাজে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (২২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

এই ঋক্ কয়টী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইবে যে—(১) বৈদিক যুগেই স্মৃতিতে উক্ত ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহ রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। (২) প্রয়োজনাধীন দেবর দ্বারাও সন্তান উৎপাদন করান হইত। (৩) এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বৈদিক সমাজের বিবাহ রীতির আভাস ঋক্ বেদের ১০ম

মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে সূর্য্যার বিবাহ বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক সমাজের সেই বিবাহ রীতি অপেক্ষা রামায়ণে বর্ণিত বিবাহ রীতি উন্নত; ইহা ক্রমবিকাশের ও ক্রমোন্নতির হিসাবে খুব স্বাভাবিক। বেদে দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের যে রীতির উল্লেখ আছে, রামায়ণে তাহা দৃষ্ট হয় না; মহাভারতে কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয়। বেদে এক স্ত্রীর বহু ভর্ত্তৃত্বের নিষেধ বিধান আছে, রামায়ণে সেরূপ রীতির কোন উল্লেখই নাই, অথচ মহাভারতে তাহা আছে। এইরূপ অবস্থায় সমাজের পূর্ব্বাপর্য্য বিচারে যে মত ভেদ থাকিবে, তাহা খুব বিচিত্র নহে।

বিবাহ রীতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; এস্থলে রামায়ণ ও মহাভারতের কতিপয় সমাজ রীতি সম্বন্ধে সামান্য ভাবে আলোচনা করিয়া প্রথম বিরুদ্ধ মতটীর বিচার করিতে চেষ্টা করা গেল।

সমাজ ক্রমে উন্নতির দিকেই অগ্রসর হয় বটে কিন্তু অবস্থা বিপরীতে সমাজ অবনতির দিকেও যাইতে পারে। উন্নতি যেমন দ্রুত হইতে পারে, অবনতিও দ্রুত হইতে পারে।

মহাভারতে বিভিন্ন বিষয়ে সমাজের যে চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা সমস্তই যে মহাভারতকারের সমসাময়িক যুগের সমাজ চিত্র—তাহা নহে;

মহাভারতের সমাজ আলোচনা।

বহু চিত্রই প্রাচীন কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী লাভের প্রথাটীরই আলোচনা করা যাইতে পারে। ইহা যে প্রাকবৈদিক যুগের আদিম মানব সমাজের একটী রীতি, তাহা "সজ্য-সঙ্গ" বিবাহ রীতি বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। (২৯০ পৃঃ) মহাভারতে দ্রুপদ রাজার আপত্তিতেও তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। দ্রুপদ এই রীতিকে বেদ বিরুদ্ধ রীতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।[১১]

১১ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৯৭ম অধ্যায়।

সুতরাং এই বিবাহ রীতিকে মহাভারতের সমাজরীতি কখনই বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়—দেবর কর্তৃক সন্তান উৎপাদনের কথা। রামায়ণে বর্ণসঙ্করের আভাস নাই। মহাভারতে পৃথিবী (?) নিক্ষত্রিয় হইবার গল্প আছে। পরশুরাম নাকি সাতবার ধরা নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধে যে ক্ষাত্র শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহার বর্ণনাতো মহাভারতের প্রধান বিষয়ই। কোন জাতি পুরুষ শূন্য হইয়া গেলে সেই জাতির শক্তি পূরণ জন্য সমাজে হীন নীতি প্রবর্ত্তন প্রয়োজন মনে হইলে, তাহা প্রবর্ত্তন করা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে। এইরূপ নীতি-বিরুদ্ধ-রীতি প্রবর্ত্তনকে ধর্ম্মশাস্ত্রে "আপদ ধর্ম্ম গ্রহণ" বলা হয়। আমাদের মনে হয়, রামায়ণের সমাজ চলিয়া গেলে এমনই এক সময় আসিয়াছিল যখন দেশের পুরুষ-শক্তি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; তখন সমাজপতিগণ বৈদিক রীতিতে দেবরাদির নিয়োগ দ্বারা এবং ক্রমে তাহারও অভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক দ্বারা সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে এই বৈদিক প্রথাটীর অনুবর্ত্তন ও বর্ণসঙ্কর প্রথার সৃজন —একটা দীর্ঘ যুগের ব্যবধানের পর আর একটা যুগে—দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ আপদ-ধর্ম্ম প্রচলনের বিষয় ভাবিবার সময় পাঠকগণ বিগত ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত ধ্বংসমান জাতি সমূহের জনবৃদ্ধির চেষ্টা ও চিন্তার ধারা একটু আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয়—বিবাহে বীর্য্যশুল্ক ও প্রতিযোগিতা। রামায়ণে বীর্য্যশুল্কের দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত নাই। মহাভারতে উভয়ই বিদ্যমান। রামায়ণের সময় আর্য্য সমাজ ছিল মাত্র দুই তিনটী ক্ষত্রিয় রাজ্যে সীমাবদ্ধ; মহাভারতের সময় ভারতে বহু প্রতিযোগী ক্ষত্রিয় রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের প্রতিযোগিতার পরীক্ষা বীর্য্যে। এই কারণে আমরা দ্রৌপদীর বিবাহে, অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকার

বিবাহে এবং সুভদ্রার বিবাহে প্রতিযোগিতায় সংগ্রাম দেখিতে পাই। এইরূপ ব্যাপার সমাজের ক্রমোন্নতির—সুতরাং পরবর্ত্তিতারই পরিচায়ক।

সীতার বিবাহে আমরা যে বৈদিক সম্প্রদান রীতির অনাবিল চিত্র প্রত্যক্ষ করি মহাভারতে যে সে রীতির চিত্র নাই, তাহা নহে। মহাভারতের উত্তরার বিবাহ চিত্র বৈদিক রীতিরই একটী সুন্দর চিত্র। [১২] এই দুই যুগের এই দুটী বিবাহ রীতির একত্র আলোচনা করিলে কোনটী পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ও কোনটী পরবর্ত্তী যুগের রীতির নিদর্শন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সীতার বিবাহ চিত্র পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। (২৮২—২৮৩ পৃঃ) সীতার বিবাহ যজ্ঞ মুখ্য; বিবাহ প্রাঙ্গন স্ত্রী সমাগম শূন্য। অপরপক্ষে উত্তরার বিবাহে অনুষ্ঠানের অবধিই নাই। কামিনী কুলের সমাগমে সে বিবাহ অঙ্গন উদ্ভাসিত। হোমের ধূপ সেথানে গৌণ, সুতরাং অত্যন্ত বিরল।

সীতা ও উত্তরার বিবাহ রীতি।

ইহার পর সূত্র যুগের বিবাহে দেখিতে পাওয়া যায়—স্ত্রী আচারের অবধিই নাই, সূত্র গ্রন্থগুলিতে স্ত্রীবরযাত্রীর কথাও আছে। বেদমন্ত্রের অর্থ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের এইরূপ অবান্তর ক্রিয়াগুলি বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। "সূত্রযুগের সমাজ" গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

অনুষ্ঠান বাহুল্য বিকাশেরই পরিচায়ক। বিকাশ জাতির স্বাধীন অবস্থায় খুব দ্রুত হয়; বিপ্লব সংঘটিত হইলে অকস্মাৎ হয়। শেষোক্ত স্থলে উন্নতি অবনতি উভয়ই এক ভাবে হয়। পরাধীন সমাজ আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া অবনতির দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। ভারতীয় সমাজে এই তিন

অনুষ্ঠান বাহুল্য ক্রম বিকাশের পরিচায়ক।

১২ মহাভারত বিরাটপর্ব্ব ৭০ম অধ্যায়।

অবস্থারই দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং সমাজে আবিলতা উন্নতি, অবনতি, বিপ্লব—সকল অবস্থায়ই প্রবেশ করিতে পারে। সাধারণত: সমাজদেহে আবিলতা সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গেই প্রবেশ করে; সভ্যতা স্থাপনের সময়ে নহে। সভ্যতা স্থাপন সময়ে যে আবিলতা লুপ্ত ভাবে থাকে, তাহাই ক্রমে অবসর পাইয়া সভ্যতার মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে—ব্যবস্থাকার ঋষিরা অনন্যোপায় হইয়া তখন তাহা সমাজ বিধির অঙ্গীয় করিয়া লইতে বাধ্য হন। মহাভারতে ও পুরাণ সমূহে এই সত্য নানা ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সীতার বিবাহের চিত্রটী অনাবিলতা হেতু বা অনুষ্ঠান বাহুল্যের অভাব হেতুই মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী হইবে—এই যুক্তি সমীচীন নহে।

দ্বিতীয় বিরুদ্ধ মতটী (২৮৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত) ঐতিহাসিক হুইলার সাহেবের। মিথিলা রাজ জনক নিজে বরকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন দেখিয়া হুইলার লিখিয়াছেন "It will be noticed that the Brahmans play little or no part in the cerimony. [১৩]

হুইলার সাহেবের মত আলোচনা।

হুইলারের এইরূপ মন্তব্যের কারণ—তিনি (হুইলার) কৃতনিশ্চিত যে, বাল্মীকি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পূর্ব্বে—অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবের কালে আবির্ভূত হইয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। এবং সেই রামায়ণী যুগে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

হুইলার সাহেব বৈদিক-যুগের কোন গ্রন্থে বর্ণিত কোন বৈবাহিক ক্রিয়ার সহিত তুলনায় বিচার করিয়া এই মন্তব্যে উপনীত হন নাই। তিনি তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামক কোন ব্যক্তির মুখে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের বৈবাহিক অনুষ্ঠানের রীতি-পদ্ধতির কথা

১৩ Ramayana by T. Wheeler.

শুনিয়া বোধহয় এই ক্রটিটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন।[১৪] এই সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশ-কে আমরা আরোহ প্রণালী বা "সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ" রীতি (deductive method) বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। (১৮৯ পৃষ্ঠা) হুইলার যে কোন প্রাচীন গ্রন্থই অনুসন্ধান করিতেন—বেদ, রামায়ণ, মহাভারত,—কোন গ্রন্থেই আধুনিক নিয়মে ব্রতীকে ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতেছেন, এইরূপ প্রথা দেখিতে পাইতেন না। এই প্রথাটী বৌদ্ধবিপ্লবের পরেই ক্রমে সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। পৌরাণিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে—যজ্ঞই ছিল একমাত্র ক্রিয়া—এবং তাহা করিবার অধিকারী ছিলেন—বিশিষ্ট বিশিষ্ট যজ্ঞের জন্য—বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঋত্বিক। ঋত্বিক যজ্ঞ দ্বারা দেবগণকে ও পিতৃগণকে আহ্বান করিলে যজমান আহুতদিগকে সম্মুখে উপস্থিত পাইয়াছেন কল্পনা করিয়া ঋত্বিকগণ সাক্ষী করিয়া তাঁহাদিগের নিকট নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন বা প্রার্থনা নিবেদন করিতেন। এই নিবেদন-বাক্য বা অভিপ্রায় যজমানই ব্যক্ত করিতেন। পিতা বা ভ্রাতার কন্যা-সম্প্রদান করিতে বা পুত্রের স্বর্গীয় পিতার আত্মাকে তর্পণ দ্বারা বা পিণ্ড দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন (শ্রাদ্ধ) করিতে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্বযুগে কর্ম্মীকে পুরোহিতের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া মন্ত্র পাঠ দ্বারা কোন ক্রিয়া করিতে হইত না। যজমান ও ঋত্বিক উভয়ে উভয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেন।[১৫] যজ্ঞকার্য্য ও অন্যান্য করণীয় বৈবাহিক কার্য্য যে ব্রাহ্মণ ঋষিরাই করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরেই বিবৃত রহিয়াছে। ঋষি প্রবর বসিষ্ঠকে জনক বলিতেছেন—

কারয়স্ব ঋষে সর্ব্বামৃষিভিঃ সহধার্ম্মিক ॥১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো॥ ৭৩। ১

---

১৪ Ramayana (Preface)

১৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১। ৭। ১১

অর্থ—ধার্ম্মিক মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক ক্রিয়াসকল নির্ব্বাহ করুন।

বশিষ্ঠও তদনুসারে জনকের কুল পুরোহিত শতানন্দ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে জনক কন্যা দান করিলেন।

পুরোহিত ও ঋত্বিকৃগণ কি কি কার্য্য করিলেন, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই বটে কিন্তু ঋক বেদের সূর্য্যার বিবাহের (১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের) বর কন্যা সম্বন্ধীয় ঋক মন্ত্রগুলির আলোচনায় তাহা অনুমান করা যায়। ঐ মন্ত্র গুলিই পুরোহিত এবং ঋত্বিকগণ উচ্চারণ করিয়া বরকন্যার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং দেবগণের নিকট সুখ সৌভাগ্য যাচ্ঞা করিতেন। সেকালে সকল গৃহস্থই (গৃহমেধিন্) যাগযজ্ঞাভিজ্ঞ ছিলেন সুতরাং তাঁহাদের নিজের করণীয় কার্য্যে প্রতিনিধির প্রয়োজন হইত না, অথবা কি বলিয়া দান করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য উপদেষ্টারও প্রয়োজন হইত না। দশ কর্ম্মান্বিত প্রাজ্ঞ কায়স্থ বা বৈদ্য কর্ম্মীর এখনও মন্ত্র প্রবক্তার প্রয়োজন হয় না। এই রীতিই ছিল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগের রীতি।

অতঃপর বৌদ্ধ বিপ্লবে বৈদিক মন্ত্র প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেলে ক্রিয়া কার্য্যের বিধি ব্যবস্থায় ঘোর বিপর্য্যয় ঘটে; ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেশ হইতে বিদূরিত হয়; বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্বন্ধে দেশে ঘোর অজ্ঞানতা প্রবেশ করে। এ দেশের স্থানে স্থানে এই বেদ বিরুদ্ধ ভাব প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া বিরাজ করিয়াছিল।[১৬] ইহার পর বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিলে নূতন করিয়া পুরোহিতের কর্ত্তব্য

১৬ আদিশূর ও শ্যামলবর্ম্মা কেন কান্যকুব্জ হইতে গৌড়-বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন—এই প্রসঙ্গে পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই তখনকার বিপ্লব বিধ্বস্ত সমাজের অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নির্দ্ধারিত হয়, তখন যজমানকে পুরোহিতের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইত। ইহা যে একটা যুগ-সন্ধি কালের ঘোর অজ্ঞানতার ফল—তাহা বলাই বাহুল্য।

জনকের আচরণ প্রাচীন বৈদিক ও ব্রাহ্মণ যুগেরই সমর্থক। হুইলার মূল রামায়ণ পড়েন নাই। তিনি বর্ত্তমান কালের প্রচলিত প্রথা দ্বারাই সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সমাজের বিচার করিয়াছেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

বিবাহের পরদিন রাজা দশরথ পুত্র, পুত্রবধু ও যৌতুক সামগ্রী লইয়া মিথিলা পরিত্যাগ করিলেন। এ দিকে অযোধ্যায় বর-বধূদিগের অভ্যর্থনা উৎসবের আয়োজন হইল। মহা সমারোহে নাগরিকগণ অযোধ্যার রাজপথগুলিকে জলসেকে ধূলি শূন্য করিল এবং পুষ্প ও ধ্বজাপটে সুসজ্জিত করিল। বর-বধূ রাজধানীতে প্রবেশ করিলে চারি দিক হইতে তুর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। পুরবাসীগণ মঙ্গল দ্রব্য হস্তে লইয়া বর-বধূদিগকে গ্রহণ করিলেন।

বর-বধূ অভ্যর্থনা।

নগর সজ্জা।

সে কালে যে কেবল বর বধূরই এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা হইত, তাহা নহে। সম্মানিত অতিথি, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্যও এইরূপ অনুষ্ঠান হইত। রাজা দশরথের ভ্রাতা রাজা লোমপাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির অভ্যর্থনা উপলক্ষেও অযোধ্যাকে এইরূপ পুষ্প পতাকায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। আধুনিক কালে এইরূপ অভ্যর্থনার অনুষ্ঠানকে পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল মনে করা হয়।

বর ও বধুগণের অভ্যর্থনার পর বধূ-বরণ। নব বধূদিগকে শাশুড়ীগণ মঙ্গল আলাপন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বধূদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া নমস্তদিগকে

বধূ-বরণ।

নমস্কার করাইলেন, এবং দেবায়তন সমূহের পূজা করাইলেন।[১৭]

অভিষেক।

রামায়ণে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় সমাজেরই অভিষেকের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ঋক্‌বেদেও রাজাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার উল্লেখ আছে। ঋক বেদের ঐ সূক্তের নাম "রাজস্তুতি দেবতার" সূক্ত।[১] ঋষিরা এই ঋক্ মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন।

রামায়ণী যুগে আর্য্য সমাজে অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস যজ্ঞের জন্য উপবাস করিবার ব্যবস্থা ছিল। রাম ও সীতা তাহা করিয়াছিলেন।

রামায়ণের উপবাস—অনশন নহে।

স্মৃতির বিধানে উপবাসের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রামায়ণের সেই সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ যুগে যে সে বিধান ছিল না, তাহা এস্থলে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রামায়ণী যুগের সময় নির্ণয়ে 'উপবস্তব্য' বা উপবাসের আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা এস্থলে তাহার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিলাম।

---

১৭ মূলে আছে—"দেবতায়তনান্যাশু সর্ব্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্।" ১৩।১।৭৭ ইহার অনুবাদ বঙ্গবাসীর সংস্করণে করা হইয়াছে—"সমস্ত দেবালয়ে পূজা করিলেন।" হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় করিয়াছেন—"গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম করাইলেন।"

দেবতায়তনান্যাশু—ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, কর্ম্মকারক; ইহার অর্থ দেবতায়তন সমূহকে প্রণাম করা বা পূজা করা।

সাকার গৃহ দেবতার ভাবটা আধুনিক ভাবের সমর্থক বটে, কিন্তু রামায়ণী যুগের ন্যায় প্রাচীন যুগ-ভাবের বিরোধী। "সমাজের দেবতা" প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইল।

১ ঋক্ বেদ ১০।১৭৩ সূক্ত।

অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গে "উপবস্তব্যা" (উপবাস) শব্দটী এইরূপে আছে—রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন স্থির করিয়া তাহাকে বলিলেন—

তস্মাত্ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা।
সহবধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা ॥২৩

"রাম, তোমার এক্ষণ হইতে সংযত চিত্ত হইয়া রাত্রে পত্নীর সহিত উপবাস করিয়া কুশ শয্যায় শয়ন করা বিধেয়।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

অন্যত্র—রাম এই সংবাদ জননী কৌশল্যাকে প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়াসহ।
এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান্ পিতা ॥৩৬।২।৪

"উপাধ্যায়গণ পিতাকে বলিয়াছিলেন অদ্য রামকে সীতার সহিত উপবাস করিয়া রজনী যাপন করিতে হইবে।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

এই অনুবাদ—আধুনিক কালে উপবাস সম্বন্ধে যে সংস্কার প্রচলিত আছে—তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করা হইয়াছে। এই সংস্কার ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থে কথিত উপবাস বিধির বিরোধী।

সাময়িক সংস্কার দ্বারা প্রাচীন রীতি-বিচারের এই জন্যই আমরা পক্ষপাতী নহি।

রামায়ণের সেই সুপ্রাচীন যুগে উপবাস বা উপবাস্তব্য শব্দে অনশন বা অনাহার বুঝাইত না।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উপবাস।

যজমান ও তাহার স্ত্রী—পর দিবস যে যজ্ঞ হইবে—সেই যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া অগ্নির আগারে গিয়া সেই অগ্নির সন্নিহিত হইয়া শয়ন বা অবস্থানকেই উপবাস বা উপবাস্তব্য বুঝাইত। এই উক্তি শতপথ ব্রাহ্মণের।[২]

২ শতপথ ব্রাহ্মণ ১।১।১।১১

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই নির্দ্দেশ স্বীকৃত হইয়াছে।[৩] রামায়ণের উক্তি-দ্বয়ও এই অর্থই প্রকাশ করিতেছে। অনশন থাকিবার কোন আভাস উপর্য্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ে আছে বলিয়া মনে হয় না।

উপবাস সম্বন্ধে সায়নাচার্য্যের মত।

বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য স্মৃতি-প্রভাব কালের লোক হইলেও উপবাস শব্দে তিনি অনশন ব্যাখ্যা করেন নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন—"যাগরূপং ব্রতংনিশ্চিত্য গার্হপত্যাদ্যগ্নি সমীপে যো বাসঃ স উপবাসঃ।"[৪]

উপবাস দিনে আহার ব্যবস্থা।

উপবাস দিনে ভোজন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামায়ণের উক্তি—"তস্মাত্ত্বয়াদ্যপ্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা" প্রভৃতিতে সেই দিবসের কোন কর্ত্তব্যের আভাস নাই, নিশা কালের কর্ত্তব্যের ব্যবস্থাই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উপবাস দিনের দিবাতে যজমানকে পত্নীর সহিত ভোজন করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ; এমন কি ইচ্ছা করিলে দম্পতি যুগল রাত্রিতেও ভোজন করিতে পারিবেন—বলা হইয়াছে।[৫] শতপথ ব্রাহ্মণে হবি ভোজনের কথাও আছে। আপস্তম্ব-শ্রৌত-সূত্রে অধঃশয়ন অর্থাৎ নীচে মৃত্তিকায় বা পাষাণে শয়নের ব্যবস্থা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[৬] রামায়ণেও এই ব্যবস্থারই উল্লেখ আছে।

স্মৃতির যুগে উপবাস অর্থ অনশন ব্যবস্থিত হইয়াছিল।

"উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ।"

---

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২।১০

৪ ঐ ব্রাহ্মণের ঐ শ্রুতির সায়ন ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।৪।১—২

৬ আপস্তম্ব শ্রৌত-সূত্র ৪।৩।১৪—১৫

প্রাচীন স্মৃতির এই নির্দ্দেশ নব্যস্মৃতিতে "অনশন" ব্যাখ্যাত হইলেও শ্রৌত সূত্রের আধুনিক টীকাকারগণ প্রাচীন রীতির ব্যভিচার করিতে সাহস করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এস্থলে কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের টীকাকার কর্কের উক্তি ও গোভিল-গৃহ্য-সূত্র-ভাষ্যে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-ধৃত পাঠ উদ্ধৃত করা গেল। কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের টীকাকার কর্ক লিখিয়াছেন—···"স চায়মুপবাসশব্দঃ নিয়তদ্রব্যকালপরিমাণেঽপ্যশনে উপলভ্যতে, যথা—চান্দ্রায়ণমুপবসেদিতি। অতো যমনিয়মবিষয়তো-পবাসশব্দস্য।" "উপবসেদিত্যনেন অত্র অনশনং ন বিধিয়তে; কুতঃ?"[৭]

স্মৃতির উপবাস অনশন।

কর্কের এই শেষ উক্তি—অনশনং ন বিধিয়তে কুতঃ—হইতে বুঝা যায়, এই সময় উপবাসের অনশন ব্যাখ্যা চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহারই প্রতিবাদ কর্ক করিতেছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যে প্রাচীন স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই—"উপবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্তবাসো গুণৈঃসহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্॥"[৮]

অর্থ—মনকে পাপ চিন্তা হইতে বিরত করিয়া উন্নত চিন্তায় বাস করাকে উপবাস বলে। তাহা শরীর বিশোষণ দ্বারা নহে।

নবীন স্মৃতিকারেরা "উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্" এই শ্লোকের শেষ বচন "ন শরীর বিশোষণম্" পরিত্যাগ করিয়া "সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতঃ" করিয়াছেন।[৯] এই রূপে ক্রমে উপবাস অর্থ—'অনশন' হইয়াছে।

---

৭ শতপথ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ১ম ভাগ ১৭৭ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।)

৮ গোভিল-গৃহ্য-সূত্র-ভাষ্য (মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার) ১।৫।২

৯ শব্দকল্পদ্রুম্

উপবাস শব্দ যে প্রাচীন স্মৃতির যুগেও অনশন অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল সূত্র-গ্রন্থের এইরূপ নির্দ্দেশে এবং পাণিনির বার্ত্তিককার কাত্যায়নের "অভুক্ত্যর্থস্য ন" নির্দ্দেশে ইহার আভাস আছে।

আমাদের মনে হয়, উপবাসের সহিত অনশনের অর্থ সম্বন্ধের কল্পনা কাল ইহা অপেক্ষা প্রাচীন নহে। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের সময় রমেশ বাবুর মতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী।[১০]

রামের অভিষেক-সংযম।

এইবার প্রকৃত প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাউক। রাম পিতৃ উপদেশ অনুসারে অভিষেক দিনের পূর্ব্বে রাত্রিতে সস্ত্রীক উপবাস ব্রত পালন করিয়াছিলেন; স্নান করিয়া নিয়ত-মানস চিত্তে পত্নীর সহিত অগ্নির সমীপে অবস্থান করিয়াছিলেন; কুল-দেবতা ও বংশ দেবতা সূর্য্যের[১১] উপাসনা করিয়া-ছিলেন। অনন্তর বিধি অনুসারে মস্তকে ঘৃত পাত্র গ্রহণ

---

১০ History of Ancient India.

১১ মূলে "নারায়ণ" শব্দ আছে; যথা—

ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩।২।৬

নারায়ণ শব্দ দ্বারা বিষ্ণু বা সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করিবার ভাব অপেক্ষা কৃত আধুনিক। ইহার কারণ "সমাজের দেবতা" প্রসঙ্গে আলোচিত হইল। রাম বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু শব্দে সে কালে সূর্য্যকে বুঝাইত। (বিষ্ণুরাদিত্যঃ—দুর্গাচার্য্য) এ সম্বন্ধে প্রাচীন নিরুক্তকারগণের মত পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। (১০০ পৃষ্ঠা) অযোধ্যাকাণ্ডের এই ষষ্ঠ সর্গের আরো অনেক কথাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহের যোগ্য। এই সর্গেও উপবাসের উল্লেখ আছে যথা—

'কৃতোপবাসস্তু তদা বৈদেহ্যা সহরাঘবম্।' ৯

এস্থলে যেন 'উপবাস' শব্দে 'অনশন' অর্থই প্রকাশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

সূর্য্যোপাসনাই সে কালের যুগ-ধর্ম্ম ছিল। বেদের সাবিত্রী মন্ত্র সূর্য্যের উদ্দেশ্যেই

করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিতে সেই ঘৃত কতক হবন করিলেন[১২] এবং অবশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ভক্ষণ করিয়া সেই দেবায়তন মধ্যেই বাক্‌যত হইয়া কুশ শয্যায় রাত্রি যাপন করিলেন।

বিবাহের ন্যায় অভিষেকের উপকরণ এবং ক্রিয়া প্রণালীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অভিষেকের নিমিত্ত যজ্ঞ স্থলে গঙ্গাজল ও সাগর জলে পূর্ণ কাঞ্চন ঘট, উড়ুম্বর কাষ্ঠ নির্ম্মিত উত্তম পীঠ, যব শর্ষপাদি বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয় যোজিত রথ, খড়্গ, ধনু, শিবিকা,

অভিষেক উপকরণ।

কল্পিত। বৈদিক কালের অবসানে তাহা গ্রহণই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি তাহারই সাক্ষ্য দেয়। অযোধ্যার রাজবংশ যে সূর্য্যবংশ বলিয়া পরিচিত তাহাও যেন সূর্য্যের প্রাধান্যেরই পরিচয় প্রদান করে। রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম সেই বংশ দেবতারই স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাম, কৌশল্যা প্রভৃতির যে 'নারায়ণের' পূজার উল্লেখ রামায়ণে আছে, তাহা সাবিত্রী মন্ত্রে সূর্য্যের ধ্যান বলিয়াই আমরা মনে করি। [সমাজের দেবতা অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

১২ মূলে আছে—"প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে॥" ২।২।৬

হুইলার সাহেব এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—

"Placing on His head the vessel containing the purefying liquids &." এই 'purefying liquids' কি? হুইলারই স্বীয় পুস্তকের ফুট নোটে লিখিয়াছেন—"The purefying liquids are the five products of the sacred cow; viz:—milk, curds, butter, urine and ordure."

ইহা আধুনিক ব্যবস্থা শাস্ত্রোক্ত 'পঞ্চগব্য'। হুইলার সাহেব পঞ্চগব্যকে এই অনুবাদে স্থান দিয়াছেন কোন রামায়ণের বলে, বুঝিতে পারিলাম না।

শিবিকা, ছত্র, শ্বেত চামর, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত সিংহ, অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, অগ্নি—এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আটটী সুন্দরী কন্যা, কয়েকটী অলঙ্কৃতা সধবা রমণী, বেশ্যা, মৃগ, পক্ষী, ব্রাহ্মণও আনীত হইয়াছিল। [১৩]

দৈব বিড়ম্বনায় রামাভিষেকের এই প্রাথমিক অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়া যায়। রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পুনরায় এই সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিলে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজপুরোহিত বসিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইয়া সাগর জলে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বসিষ্ঠের অনুমতি ক্রমে ঋত্বিক্‌গণ, ব্রাহ্মণগণ, কন্যাগণ, বণিকগণ ও পৌরগণ তাঁহাকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষিক্ত করিলে বসিষ্ঠ তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সূর্য্যবংশের কুলাগত রাজমুকুট তাঁহার শিরোদেশে প্রদান করিলেন। রাজভ্রাতা শত্রুঘ্ন মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ ছত্রধারণ করিলেন; মিত্ররাজদ্বয়—সুগ্রীব ও বিভীষণ শুভ্র চামর বীজন করিতে লাগিলেন। [১৪]

অভিষেক প্রণালী।

রামায়ণোক্ত অনার্য্য সমাজেও এইরূপ অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল। বালির মৃত্যুর পর বানরগণ এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে সুগ্রীবকে রাজ্যে ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিল।[১৫] বিভীষণের অভিষেকের কথাও এই স্থানে উল্লেখ যোগ্য।

১৩ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১৪শ সর্গ।

১৪ রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১৩শ সর্গ।

১৫ রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৬শ সর্গ।

প্রাচীন ভারতের এই অভিষেক নিয়ম এখন পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও অনুসৃত হইতেছে। কুল-পুরোহিত বসিষ্ঠের পদানুসরণ করিয়া এখন ইউরোপের প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ অভিষেক সময়ে রাজাদিগের মস্তকে রাজ-মুকুট স্থাপন করিতেছেন।

অভিষেকের আনুসঙ্গিক প্রক্রিয়া—উৎসব ও আমোদ-প্রমোদ। অযোধ্যার এই রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া কেবল কতগুলি মুনি ঋষির শাস্ত্রীয় কোলাহলেই পরিসমাপ্ত হয় নাই; ইহাতে দেশ বিদেশাগত রাজন্যগণেরও মহামিলন হইয়াছিল। এই অভিষেক উপলক্ষে রাজধানী অযোধ্যা কিরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা মহাকবির ভাষায় পাঠ করুন।

অভিষেক উৎসব।

সীতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেসু রথ্যাসু চৈত্যেষট্টালকেষু চ ॥১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষুচ ॥১২
সভাসু চৈব সর্ব্বাসু বৃক্ষেষালক্ষিতেষু চ।
ধ্বজাঃ সমচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা।১৩
নটনর্ত্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্।

* * *

কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে ॥১৭
প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ ॥১৮
অলংকারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎপুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯

সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তোমিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥২০।২।৬

অযোধ্যার হিমাদ্রি শৃঙ্গোপম দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্টালিকা, সভা, অত্যুচ্চ বৃক্ষ, নানাবিধ পণ্যপরিপূর্ণ আপণ সমূহে ও গৃহস্থ গৃহসমূহে ধ্বজা ও পতাকা সকল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক নট, নর্ত্তক ও গায়কগণের কর্ণপ্রীতিকর মনোহর ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ রাজপথ ও তোরণ সমূহ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিত ও চন্দন ও ধূপ গন্ধে আমোদিত করিল। রজনীতে সমস্ত নগরী আলোক মালায় উদ্ভাসিত রাখিবার জন্য রাজপথ সমুদয়ের দুই পার্শ্বে দীপ-বৃক্ষ প্রোথিত হইল। এইরূপে অযোধ্যা নগরীকে সম্যক প্রকারে সুশোভিত করিয়া পৌরগণ দলে দলে সভা প্রাঙ্গনে মিলিত হইতে লাগিল।

যাঁহারা রাজরাজ্যেশ্বর পঞ্চমজর্জ্জের অভিষেক উপলক্ষে পুষ্প-তোরণ-শোভিতা, আলোক-সমুজ্জলা রাজধানী কলিকাতার বিচিত্র শোভা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সভ্যতা-প্রদীপ্ত সেই আধুনিক সজ্জার সহিত প্রাচীন ভারতের রাজধানী অযোধ্যার এই সাজ সজ্জার তুলনা করুন। এই বর্ণনায় কবির কল্পনা আছে, অতিশয়-উক্তিও যথেষ্ট আছে। পাঠক এই সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবি-কল্পনার উপাদানগুলির প্রতিই লক্ষ্য করিবেন। যে কবি এই রচনার সৃষ্টি কর্ত্তা তাঁহার বিষয়-জ্ঞান কতদূর ছিল—ইহাতে ভাবিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয়ই তাহা।

মৃতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

ভারতীয় আর্য্য সমাজের অগ্নিসংকার বিধির সহিত প্রেতের উদ্দেশে আরো যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আধুনিক কালে প্রচলিত আছে—রামায়ণী যুগেও তাহার অনেকগুলি অনুষ্ঠিত হইত। অনার্য্য সমাজে মৃতদেহের সংকার পদ্ধতি সম্বন্ধে 'সমাজ ধর্ম্ম' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে;

এইবার আর্য্য সমাজের রীতি পদ্ধতি ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের আলোচনা করা গেল।

পিতৃ বিয়োগের দশ বার দিবস পরে ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে—রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈলদ্রোণী হইতে তুলিয়া বিবিধ রত্ন খচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় স্থাপিত হইল। তখন রাজার অগ্নিহোত্রাগার হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা ঋত্বিক ও যাজকগণ যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর রাজ-পরিচারকগণ মৃত মহীপতির দেহ শিবিকা মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহা বহন করিয়া সরযূতীরে (শ্মশানে) লইয়া চলিল। বহুসংখ্যক লোক শিবিকার অগ্রে রাজপথে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা ও বস্ত্র ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। অপর কয়েক ব্যক্তি সরল, পদ্মক, দেবদারু, চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল্‌ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিল।

শবানুগমন।

ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথের শব ঐ চিতায় স্থাপন করিলেন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তৎকালোচিত মন্ত্র পাঠ করিলেন। ঋক বেদের ১০ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ঋকগুলিই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র। বৈদিক যুগের পূর্ব্বে বোধ হয় মৃত দেহ ফেলিয়া দেওয়া হইত, অথবা দুর্গন্ধ হয় বলিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। বৈদিক যুগের অবসানে অগ্নিদগ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত হয়। সূক্তের প্রথম ঋকটী এইরূপ :—

চিতা-শয্যা।

"হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না; ইহাকে ক্লেশ দিও না; ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তম রূপে পক্ক হয় তখনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দেও।"

অগ্নিদাহের ঋক্-মন্ত্র।

এই মন্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তি যে স্বর্গে পিতৃলোকের সহিত মিলিত হয়—এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে।

২য় ঋকে পিতৃলোকে যাইয়া সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা আছে।

৩য়, চতুর্থ ও ৫ম ঋক দ্বারা বলা হইতেছে—মৃতের চক্ষুর দীপ্তি সূর্যো মিশিয়া যায়, শ্বাস বায়ুতে যায়, মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকায় যায়, উদ্ভিজ্জের অংশ উদ্ভিজ্জে যায়; কিন্তু মৃত্যুরহিত অংশ অগ্নির প্রসাদে পুণ্য স্থানে গমন করে।

৫ম ঋকে মৃতের পুনর্ব্বার শরীর লাভ করিবার প্রার্থনা আছে।

এই ঋক্ মন্ত্র গুলিতে যে সমস্ত কথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যে তৎকালীন সমাজের বিশ্বাসের বিষয় ছিল—ইহা বলাই বাহুল্য। যে জাতি যাহা বিশ্বাস করে, সেই পথেই সেই জাতি বিশ্বাসের ফল প্রাপ্ত হয়। সে কালের লোক পিতৃলোককে সশরীরে দেখিতে পাইত। রাম দশরথের শারীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। আজ ইয়ুরোপ আমেরিকার লোকও তাহা দেখিতেছে। দশরথের স্বর্গীয় মূর্ত্তির আলোচনায় যথাস্থানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা গেল।

ঋত্বিকগণ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিলে সামজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সামগান করিতে লাগিলেন। তখন কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজ-দেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিতে লাগিল।

অগ্নিসংকার।

দশরথের চিতা জ্বলিতে থাকুক; ইত্যবসরে হুইলার সাহেবের অদ্ভুত রামায়ণ হইতে এ সম্বন্ধে কতিপয় আপত্তিজনক পংক্তি পাঠকদিগের সম্মুখে বিচারের জন্য উপস্থিত করা গেল।

হুইলার সাহেব লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণগণ চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে

বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটী উৎসর্গীকৃত

বৈদেশিক মতের প্রতিবাদ

পশু গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিয়া চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর রাজদেহের চারিদিকে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চিতাভূমির চতুর্দ্দিকে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলেন, এবং সবৎসা গাভী তদুপরি নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘৃত, তৈল ও মাংস প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৬

মূল রামায়ণের কোন্ স্থান হইতে হুইলার এই অদ্ভুত তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। আর্ষ রামায়ণের কোন সংস্করণেই এই অদ্ভুত তত্ত্ব নাই। হুইলার প্রমাণ উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে একটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত এই যে—হিন্দুরা গো-খাদক ছিল এবং দেশের সেই অবস্থাটা বৌদ্ধবিপ্লবের পরের। তিনি দেখাইতে চান—রামায়ণেও যখন এবম্বিধ কথার সমর্থন আছে তখন রামায়ণও সেই সময়ের। তাঁহার এই উদ্দেশ্য তাঁহার বিভিন্ন উক্তির সমন্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে; যাহারা অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করেন অর্থাৎ নিজের সিদ্ধান্তকে প্রমাণীকৃত করিতে দুর্দ্দমনীয় ভাবে প্রয়াস পান, তাঁহারা এইরূপ জঘন্য রীতিই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

---

১৬ "And they took a purified beast, which had been consecrated by the proper formulas, & slew it and threw it on the funeral pile & then threw boiled rice on all sides of the royal body & they made a furrow round about the place where the pile was erected according to the ordinance; and they offered the cow with her calf, and scattered ghee, oil and flesh on all sides,"

Ramayana—Page 174.

হুইলার সাহেব এই পশুহত্যার বিবরণটী প্রদান করিবার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন—"The description of these cerimonies is very interesting as it evidently refers to an ancient period in Hindoo History when animal sacrifices were still largely in vogue."

আমরা হুইলার সাহেবের স্বকপোল-কল্পিত এই অবন্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি।

হুইলার রামায়ণকে বৌদ্ধ বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালের কাব্য বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধ যুগের অহিংস-ধর্ম্মের পর, আঘাতের পর প্রতিঘাতের বিরুদ্ধ ফল—পশু হিংসা ও পশুহননের পূর্ণ চিত্রদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে গিয়া এই অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী মন্তব্য আরও অদ্ভুত। তিনি অধ্যায় শেষে এই পশুহনন সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন:—

"The sacrifice of a cow & her calf probably for the purpose of feasting is an ancient rite which has long fallen into disuse."

রামায়ণের কোন স্থানেই গোহত্যার উল্লেখ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব পীড়নের কথা আদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মৃগয়া ব্যতীরেকে অন্য কোন কার্য্যে পশুহনন বা পশু বলিদানের রীতি বা ব্যবস্থা যে তখন আর্য্যভারতে প্রচলিত ছিল— রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

উত্তরকাণ্ডে লঙ্কার অনার্য্য সমাজে গো-মেধ ও রামের গোসব যজ্ঞ সম্পাদনের গল্প আছে। ভবভূতির উত্তর রামচরিতেও এইরূপ কোন কোন কথার উল্লেখ আছে। সূত্র গ্রন্থগুলিতেও এই রীতির আভাস

আছে। এমন কি ব্রাহ্মণগ্রন্থেও [১৭] এইরূপ কোন কোন কথার উল্লেখ আছে। এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিয়াই বোধ হয় হুইলার এইরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং সেই অপসিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। বস্তুত আর্ষ-রামায়ণের কোন স্থলেই গোহত্যার কথা নাই বরং গো জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই কথা আছে; যথা স্থানে আমরা তাহার আলোচনাও করিয়াছি। হুইলারের আর একটা সিদ্ধান্ত এই যে—ভারতীয় হিন্দুরা আমোদ প্রমোদেও গো-হত্যা করিত। এই কু সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে স্থানেই 'গো' শব্দের উল্লেখ দেখিয়াছেন, সেই স্থানেই স্বীয় উর্ব্বর গবেষণার সমর্থন জন্য "Probably" (সম্ভবত) অস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ঋষি-দিগের সপিণ্ডীকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রামায়ণের যুগে বিবাহ কালে গোদানের ব্যবস্থা ছিল; আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। (২৮২ পৃঃ) এই গোদানের উল্লেখ করিয়াও হুইলার তাঁহার "Probably" রূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

"At marriage ceremonies a cow & her calf are still present and probably in ancient times were sacrificed for the purpose of an entertainment."[১৮]

কি অদ্ভুত "Probably"

হুইলারের প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে অনেকখানি দূরে আসিয়া পড়া গিয়াছে; এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অগ্নি সৎকার হইলে রাজমহিষীরা ভরতের সহিত সরযূ-জলে প্রেতোদ্দেশে উদক দান করিলেন। প্রেতের উদ্দেশে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক

১৭ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩। ১৩। ৮

১৮ Wheeler's Ramayana.

দানের নাম তর্পণ। ঋক বেদে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দ্বারা পিতৃপুরুষের তৃপ্তি সম্পাদনের কথা আছে।[১৯] এইরূপ তর্পণে তাঁহারা প্রীত হন।

তর্পণ।

রাম চিত্রকূট অবস্থান কালে পিতৃ-বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দক্ষিণমুখী হইয়া দশরথের উদ্দেশে তর্পণ করিয়াছিলেন।[২০]

যমের গৃহ যে দক্ষিণদিকে—এই কল্পনা বৈদিক কি না, আমরা অবগত নহি। ঋক বেদে যমের কথা আছে; তিনি স্বর্গ সুখের দেবতা। বেদের যম কালান্তক নহে—তাহার কুকুর দুইটীই ভীষণ। রামায়ণের যম দক্ষিণ দিকের দিকপাল; যথা:—

পূর্ব্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ।
বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশম্॥ ২৪। ২। ১৬

রামায়ণেও কিন্তু যম ভীষণ কালান্তকরূপে বর্ণিত নহেন। মহাভারতের যম কৃতান্ত-কালান্তক।

তর্পণাদির পর ভরত মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগের সহিত পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন ও নানারূপ কঠোর নিয়ম পালন করিয়া দশাহ অতিবাহিত করিলেন।[২১]

অশৌচ ধারণ।

মৃতদেহ সৎকারের পর দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজকুমার ভরত কৃতশৌচ হইলেন। অতঃপর দ্বাদশ দিবসে ঋত্বিকগণ দ্বারা শ্রদ্ধা বা শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। দেহ ধ্বংস হইলেও জীবাত্মা যে অমর-অবিনশ্বর তাহা ঋক বেদে স্বীকৃত হইয়াছে।[২২] শ্রাদ্ধ দ্বারা সেই অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা বা শ্রাদ্ধ।

১৯ ঋকবেদ ১০। ১৪। ৬ ও ১০। ১৫। ১০

২০ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৩। ২৬ শ্লোক।

২১ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৫। ২৩ শ্লোক।

২২ ঋকবেদ ১। ১৬৪। ৩১

প্রদর্শন প্রথা বৈদিক। কুশের উপর শ্রদ্ধার সহিত দ্রব্য সংস্থাপন করিয়া প্রেতকে নিবেদন করিবার রীতি ঋক বেদের "পিতৃলোক দেবতা" সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।[২৩] ভরত এইরূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মৃতের পারত্রিক মঙ্গল জন্য ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, রজত, ছাগ, গো, দাস, দাসী ও গৃহ দান করিলেন।

এই স্থলে তুলনায় সমালোচনার জন্য পরবর্ত্তী মহাভারতীয় যুগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিবরণটী সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। উভয় ঘটনার পূর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ জন্য এইরূপ তুলনা প্রয়োজন।

মহাভারতীয় যুগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

পাণ্ডু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার মৃতদেহ সপ্তদশ দিবসে রাজধানী হস্তিনায় নীত হয়।[২৪] তখন অমাত্য, জ্ঞাতি ও সুহৃদ্‌গণ বসন দ্বারা পাণ্ডুর কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া বিবিধ পুষ্পে, গন্ধ দ্রব্যে ও মাল্যে ভূষিত করিয়া যানে স্থাপন করিলেন। সেই যান নরগণে বহন করিয়া গঙ্গা তীরে লইয়াগেল। অনন্তর ঋত্বিকগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত প্রেত-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে—তাঁহারা মাদ্রীর মৃতদেহের সহিত ঘৃতাবসিক্ত ও অলঙ্কৃত রাজাকে তুঙ্গ ও পদ্ম নামক গন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠ ও অন্যান্য বিবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা যথাবিধান দাহ করিতে লাগিলেন।……অনন্তর দাহ ক্রিয়া সমাপন হইলে পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্ম, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও সমস্ত কুরু পত্নীগণ পাণ্ডুর উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।…পাণ্ডবগণ যেরূপ বন্ধুগণের সহিত দ্বাদশ রাত্রি ভূতলে শয়ন করিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নগরবাসীরাও দ্বাদশ রাত্রি ধরাশয্যা অবলম্বন করিলেন।[২৫]

২৩ ঋকবেদ ১০।১৫।৫

২৪ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৬ অধ্যায়।

২৫ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৭ অধ্যায়।

অনন্তর কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম—বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইয়া এবং বিপ্রশ্রেষ্ঠগণকে রত্ন ও ভূমি প্রদান করিয়া পাণ্ডুর স্বধা ও অমৃতময় শ্রাদ্ধ প্রদান করিলেন।[২৬]

পাণ্ডবগণ পিতৃবিয়োগের সময় নিতান্ত শিশু ছিল; সে জন্য তাহারা শ্রাদ্ধ করিতে পারে নাই।

রামায়ণে শ্রাদ্ধের কোন নামের উল্লেখ নাই। মহাভারতে "স্বধা" শ্রাদ্ধ প্রচলনের কথা পাওয়া যায়। দানসাগর, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি আধুনিক।

শ্রাদ্ধের পরদিন চিতাভস্ম হইতে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া চিতা শোধন করিবার রীতিও রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্থি সংগ্রহ।

ভরত ত্রয়োদশ দিবসে তাহা করিয়াছিলেন। ঋক্‌ বেদে—এই অনুষ্ঠানটীরও উল্লেখ—ঋক্‌ বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য দেখাইয়াছেন; কিন্তু রমেশ দত্ত মহাশয় তাহার অন্য অর্থ করিয়াছেন।[২৭]

প্রেতের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধের উল্লেখ অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৮ সর্গে

অষ্টকা।

জাবালীর মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অষ্টকা শ্রাদ্ধ পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্ত্তব্য। রামকে বা রামায়ণের অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা করিতে দেখা যায়

---

২৬ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২৮ অধ্যায়।

২৭ ঋকবেদ ১০।১৮।১০, ১১, ১২ ঋক। দত্ত সাহেব এই ঋক তিনটীর পাদটীকায় লিখিয়াছেন—সায়নের মতে ১০, ১১, ১২:এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা হয়, তখন ঐ ঋক কয়েকটী পাঠ করা হয়। কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নাই। ঋকগুলি পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন মৃত ব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হইত।

নাই। জাবালী কথিত এই সর্গ দুইটী (অযোধ্যা ১০৮। ১০৯ সর্গ) যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা আমরা 'প্রক্ষিপ্ত রচনা' অধ্যায়ে (১২০ পৃঃ) নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি।

অষ্টকার উল্লেখ সূত্র গ্রন্থগুলিতে আছে।

রাম চিত্রকূটে অবস্থান কালে ভরতের নিকট পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্দাকিনী নদীতে অবতরণ করিয়া পিতার উদ্দেশে উদক তর্পণ করিলেন ও কুশ-আস্তরণে বদরী মিশ্রিত ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড দান করিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবকে তাহা গ্রহণ করিতে রোদন-পরায়ণ হইয়া আহ্বান করিলেন।

পিণ্ড।

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্।
যদন্নঃ পুরুষো রাজন তদান্নাস্তস্য দেবতাঃ॥৩০। ২। ১০৩

ঋক বেদের 'পিতৃ দেবতা' সূক্তে পিণ্ডদানের কথা আছে—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বেদে ফল-পিণ্ডের কথা নাই। রাম পিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—মহারাজ আমার বনে যাহা ভোজ্য, আপনি প্রীতি সহকারে তাহাই গ্রহণ করুন। মানুষ নিজে যাহা আহার করে, তাহার পিতৃদেবগণও তাহাই আহার করেন।

পূর্ব্বে যজ্ঞের হবি দ্বারা, তৎপর উদক দ্বারা, ক্রমে আহার্য্য দ্রব্য দ্বারা—এইরূপ ক্রমবিকাশের ধারায় শ্রদ্ধা ক্রিয়ার অঙ্গ বৃদ্ধি হইয়াছে। বেদে এইরূপ ক্রমবিকাশের আভাস আছে। পিতৃগণ যে বংশধরগণের তর্পণ গ্রহণ করেন, তাহা ঋক বেদের প্রথম নয় মণ্ডলে নাই; শেষ ১০ম মণ্ডলে আছে। ইহাতে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে এইরূপ বিশ্বাস—পিতৃগণ যে তর্পণে প্রীত হন—বৈদিক সমাজে, ক্রমে বৈদিক কালের অবসান সময়ে—প্রবেশ করিয়াছিল।[২৮]

২৮ ঋকবেদ—রমেশ বাবুর ১০। ১৫ সূক্তের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

রামায়ণের এক স্থানে (১০৭ সর্গ অযোধ্যা) গয়ায় পিণ্ড দানের আভাস আছে। রামায়ণের রচনা কালে গয়া মাহাত্ম্য প্রচারিত হয় নাই। তাহা 'প্রক্ষিপ্ত রচনা' অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। (১০১ পৃঃ) রামায়ণের আর কোথাও "গয়া" সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

"গয়া" উল্লেখ।

অগ্রহায়ণ মাসে যখন নূতন ফসল উৎপন্ন হয় তখন ঐ নূতন শস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে নবান্ন গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বোধহয় অতি প্রাচীন রীতি। রামায়ণে পিতৃগণকে নবান্ন নিবেদনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বনবাসে অবস্থান কালে একদিন রামকে লক্ষ্মণ এই কথাটী বলিয়াছিলেন। এই নবান্ন যজ্ঞ রামায়ণে "নবাগ্রয়ণ পূজা" নামে অভিহিত হইয়াছে।[২৯]

নবাগ্রয়ণ পূজা বা নবান্ন।

যজ্ঞ।

অদৃশ্য দেবতাকে আহ্বান করিয়া তৃপ্ত করিবার উপায় যজ্ঞ। প্রার্থনা, পূজা প্রভৃতি হইতে ক্রমে যজ্ঞের কল্পনা হইয়াছিল। বৈদিক যুগের ন্যায়—রামায়ণের যুগও প্রার্থনা ও যজ্ঞের যুগ।

অগ্নি ব্যতীত মানুষ গৃহ-সংসার করিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান সময় নানারূপে অগ্নি রক্ষা করিয়া থাকি এবং তাহা দ্বারা প্রয়োজন সম্পাদন করি। বৈদিক কালে প্রত্যেক গৃহমেধিনই গৃহে যজ্ঞাগ্নি রক্ষা করিত। অযোধ্যার রাজগৃহে পৃথক পৃথক যজ্ঞাগ্নি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কৌশল্যা প্রতিদিন হোম করিতেন। তখন, স্ত্রী-শূদ্র সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট কামনায় প্রত্যহ হোম করিতে পারিত। নববধূ বরণ সময়ে রাজমহিষীগণ সকলেই

যজ্ঞাগ্নি রক্ষা।

২৯ রামায়ণ আরণ্যকাণ্ড ১৬—৬ শ্লোক।

হোম চিহ্নে ভূষিতা হইয়া আসিয়াছিলেন।[১] রাণীদিগের প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক হোমগৃহ বা দেবায়তন ছিল। নব বধূদিগকে সেই সকল অন্তঃপুরবর্ত্তী দেবায়তন সমূহেই নিয়া প্রণাম করান হইয়াছিল। রাজা দশরথকে অগ্নি-সংকার করিবার অগ্নি, তাঁহার নিজ অগ্নিহোত্রাগার হইতেই নীত হইয়াছিল।[২]

দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য সমাজে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এইরূপে উৎপন্ন অগ্নির সম্মুখেই সুগ্রীবের সহিত রামের মিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছিল।[৩]

মহাভারতের যুগে যজ্ঞের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তখন গৃহস্থ মাত্রেই হোমাগ্নি রক্ষা করিত না।

রামায়ণের প্রথম ও প্রধান যজ্ঞ রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি উপলক্ষে অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ শেষ হইলে পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল। রামায়ণের

অশ্বমেধ যজ্ঞ রামায়ণ ও মহাভারত—তুলনা।

অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রণালী মহাভারতের অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রণালী হইতে অনেকটা প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। এ স্থলে তুলনার জন্য উভয় প্রণালীই সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

রাজা দশরথের যজ্ঞের শামিত্রকর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ শাস্ত্রে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতার উদ্দেশে সেই সেই বলি প্রদান করিলেন। বিভিন্ন কাষ্ঠে ২১টী যূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সকল যূপে তখন বহুতর জলচর, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী, ও অশ্ব বলি প্রদত্ত হইল। পুনরায় সেই সকল যূপে তিন শত পশু ও শ্রেষ্ঠ অশ্ব রত্নকে বন্ধন করিলেন। এইবার রাজ মহিষী কৌশল্যা সেই

১ রামায়ণ আদিকাণ্ড ৭৭। ১২ শ্লোক।

২ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭৬ সর্গ ১৩ শ্লোক।

৩ রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫। ১৪ শ্লোক।

অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। তারপর তিনি সেই অশ্বের সহিত ধর্ম্মকামনাপূর্ণ স্থির চিত্ত হইয়া এক রাত্রি যাপন করিলেন। তৎপর দশরথের সকল পত্নীকেই সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর অশ্বের বপা উদ্ধরন করিয়া দশরথকে সেই বপার ধূম গন্ধ আঘ্রাণ করান হইল। তৎপর অশ্বের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গগুলি অগ্নি-হবন করা হইল। ইহাই রামায়ণোক্ত অশ্বমেধ প্রণালী।

মহাভারতোক্ত প্রণালীও প্রায় এইরূপই। প্রভেদ এই যে মহাভারতের যুগে রাজমহিষী দ্বারা অশ্ব ছেদন প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। তথায় রাজমহিষী দ্রৌপদীকে সম্মুখে বসাইয়া ঋত্বিকগণই অশ্ব ছেদন করিয়াছেন। মহাভারতে অশ্বের সহিত রাজমহিষীর রাত্রি যাপনের কোন উল্লেখ নাই।[৪] এই অনুষ্ঠান বোধ হয় ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

অশ্বমেধ বৈদিক যজ্ঞ। ঋক্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধের বিবরণ আছে।[৫]

বিবিধ যজ্ঞ।

রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নিষ্টোম্, উক্‌থ, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম্ আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম প্রভৃতি যজ্ঞও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ।

অশ্বমেধ শেষ হইলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হয়। রামায়ণের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সর্গটী (১৫শ সর্গ বালকাণ্ড) প্রক্ষিপ্ত; সুতরাং ইহা হইতে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করা নিরাপদ নহে। রামায়ণে কুশনাভেরও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। সেই উল্লেখও সন্দেহজনক।

ঋকবেদে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আভাস নাই। কিন্তু গর্ভ সঞ্চারের দুইটী

---

৪ মহাভারত অশ্বমেধপর্ব্ব ৮৮। ৮৯ অধ্যায়।

৫ ঋকবেদ ১। ১৬২ সূক্ত। যজুর্ব্বেদ ২৪ শ অধ্যায়।

সূক্ত আছে। উহাই বোধ হয় পুত্রেষ্টি যজ্ঞে মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। রামায়ণে প্রকাশ বেদজ্ঞ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্ব্ব মন্ত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঋকবেদের ১০ মণ্ডলের ১৮৩ ও ১৮৪ সূক্তদ্বয় গর্ভসঙ্কারের মন্ত্রে পূর্ণ। ১৬২ সূক্তের মন্ত্রগুলি গর্ভ রক্ষার মন্ত্র। গর্ভ রক্ষার মন্ত্রে কেবল পুত্র কামনার উল্লেখই দেখা যায়; কন্যার উল্লেখ তাহাতে নাই। এই ঋকগুলিকে রমেশ বাবু অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া মনে করেন।[৬]

বেদে গর্ভসঙ্কার সূক্ত।

বৈদিক যুগে স্ত্রী স্বামীর সহিত যজ্ঞে অধিকারী ছিলেন।[৭] রামায়ণেও কৌশল্যাকে রাজা দশরথের সহিত যজ্ঞে ব্রতী দেখা যায়। ক্রমে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

যজ্ঞে স্ত্রীর অধিকার।

শ্রীমাংশ্চ সহ পত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ॥৪২।১।১৩

মহর্ষি বানর-পত্নি তারার মুখেও বেদ মন্ত্র বাহির করিয়াছেন, এবং লঙ্কাপুরীতে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যে নানাবিধ রাক্ষসী যজ্ঞ হইত, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

রামায়ণে নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা বা বাস্তু শান্তির উল্লেখ আছে। রাম চিত্রকূটে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া যথা বিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।[৮]

বাস্তু-শান্তি।

বলি যজ্ঞের একটা অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত ছিল। রামায়ণে "বলি" পূজা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

---

৬ রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদের ঐ স্থলের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৭ ঋকবেদ ৫।৪৩

৮ আরণ্যকাণ্ড ১৫শ সর্গ।

বাস্তু শান্তিতে রাম বৈশ্বদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি দান করিয়াছিলেন।[৯] কৌশল্যা রামের মঙ্গলকামনায় যে যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে বাহুবলি প্রদান করিয়াছিলেন।[১০] এই বলিগুলি অহিংসামূলক পূজা মাত্র; জীব হত্যা নহে। এই অহিংস বলি অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে বর্ণিত প্রাণী বলি প্রথার বিরোধী। অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্গটি যে বহুল পরিমাণে প্রক্ষিপ্ততা দোষে দুষ্ট, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবহত্যার উল্লেখ রামায়ণে মৃগয়া ও এই অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষ ব্যতীত আর কোনও প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় না। রামায়ণে নরবলির উল্লেখ আছে; তাহা অম্বরীষের যজ্ঞোপলক্ষে—বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক কালের ঘটনার আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে। ঋক বেদের সময় নরবলি প্রদত্ত হইত কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না।[১১]

বলি।

কার্য্যোদ্ধারের জন্য হীন ভাবে কাহারও দ্বারে যাইয়া 'ধর্ণা' দেওয়ার নাম প্রত্যুপবেশন। রামায়ণে প্রত্যুপবেশনের উল্লেখ আছে। রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া নিতে না পারিয়া ভরত প্রত্যুপবেশন করিয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত হীন কার্য্য। শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়দের ইহা কখনও আচরণীয় নহে—বলিয়া রাম নিষেধ করিলে ভরত তাহা হইতে বিরত হন। রামায়ণের সমাজে হীন ব্রাহ্মণেরা অধমর্ণ হইতে অর্থ উদ্ধার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন; অধমর্ণের দরজায় এক-পার্শ্ব হইয়া ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন।[১২]

প্রত্যুপবেশন।

---

৯ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৫৬। ৩১ ১০ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ২৫। ৩০

১১ ঋক্‌বেদে যুপ শব্দের উল্লেখ অনেক স্থলে আছে। ঋকবেদের ১ম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে শুনঃশেপ বিলাপে নরবলির উল্লেখ আছে বটে কিন্তু ঋক্‌গুলির ব্যাখ্যা লইয়াও মতভেদ আছে।

১২ রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১১১ সর্গ ১৭ শ্লোক।

কার্য্যোদ্ধারে বিমুখ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের জন্য অনশন পণের নাম প্রায়োপবেশন। রামায়ণে প্রায়োপবেশনেরও উল্লেখ আছে। অঙ্গদ প্রভৃতি বানরেরা সীতার অনুসন্ধানে বিফল মনোরথ হইয়া সুগ্রীবের ভয়ে জীবন ত্যাগের জন্য প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল।[১৩] রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্ম-শাপ হইলে পরীক্ষিতও প্রায়োপবেশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাই আধুনিক Hunger strike.

প্রায়োপবেশন।

---

১৩ রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫৩ সর্গ ১৩ শ্লোক।

চতুর্থ অধ্যায়।

সমাজের দেবতা।

রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় মাত্র তেত্রিশটী দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ও অশ্বীদ্বয় (অশ্বিনীকুমার)—এই তেত্রিশ দেবতা। ইহার পর ক্রমে পৌরাণিক যুগের দেবতাগণের নামও রামায়ণে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এইরূপে রামায়ণের ছয় কাণ্ডে—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, মহাদেব, সোম, যম, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বরুণ, বায়ু, কুবের, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, হর, কাম, জয়ন্ত, উপেন্দ্র, অনন্ত নাগ, দেব-বৈদ্য ধন্বন্তরী, দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বরূপ ও মরুতগণের নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগ, ধাতা, বিধাতা, ধর্ম্ম, কাল, সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্য্যমা, পুষা, কৃষ্ণ প্রভৃতির উল্লেখও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণের দেবতা।

ইঁহাদের অনেকেই বৈদিক কিম্বা রামায়ণের সমাজের দেবতা নহেন। আমাদের এই উক্তির সমীচীনতা নির্দ্দেশ পক্ষে দেব-তত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা দরকার। আমরা এস্থলে তাহাই করিতে চেষ্টা করিলাম।

ঈশ্বর জ্ঞান মানুষের জন্ম গ্রহণ করিয়াই হয় না। মানুষের যেমন শৈশব, বাল্য, যৌবন প্রভৃতি কাল আছে; এবং সেই সেই কালেও সংসর্গ এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত কালোচিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিকসিত হয় না, মানব সমাজের ঈশ্বর জ্ঞান সম্বন্ধীয় ইতিহাসও সেইরূপ। মানব চক্ষু মেলিয়া সর্ব্বপ্রথম যে জিনিসটার দ্যুতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল এবং যাহার কার্য্যের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাকেই সে দ্যুতিমান বলিয়া অর্থাৎ "দেবতা" বলিয়া নত মস্তকে স্বীকার করিয়াছিল। 'দেব' শব্দের অর্থ দ্যুতি, দীপ্তি। ঋকবেদের সর্ব্বপ্রথম ঋকটাই যেন তাহার প্রমাণ দিতেছে। যথা—'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্ যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।"

দেবতা-জ্ঞান।
দেবতা অর্থ দীপ্তিমান।

রমেশবাবুর অনুবাদ—"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান।" বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য এবং নিরুক্তকার যাস্কও দেব শব্দের এই অর্থই করিয়াছেন।

বেদে
দেবতা শব্দ।

মানব চক্ষু মেলিয়াই দেখিয়াছিল—আলো। ক্রমে সেই আলো বা দীপ্তির কারণকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে দীপ্তিমান (দেবতা) বলিয়া তাঁহার নিকট মস্তক নত করিয়াছিল। ইহাই দেবতা জ্ঞানের আদি ইতিহাস।

মানব সূর্য্যকে এবং চন্দ্রকেই সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জানিয়াছিল। ইহার পর যাহার দ্বারা মানুষ উপকৃত হইত, অথবা ভীত হইত, অথচ তাহার শক্তির পরিমাণ করিতে পারিত না, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছিল। এই পর্য্যায়ে বায়ু, বৃষ্টি, বজ্র প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে; এবং তাহা খুব স্বাভাবিক।

প্রথম দেবতা
সূর্য্য ও চন্দ্র।

ক্রমে নদী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রভৃতিকেও মানব দেব ভাবে নিরীক্ষণ

করিয়াছিল। ইহারও প্রত্যক্ষ কারণ, উপকার। নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া, পর্ব্বতের আশ্রয় প্রত্যক্ষ ভাবে মানবের উপকার সাধন করিত; তাই চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় নদী-পর্ব্বত-বৃক্ষও আদিম মানব সমাজের নিকট দেবতা বলিয়া পরিচিত এবং সম্মানিত হইয়াছিল।

ইহাই আদিম বা প্রাক্‌বৈদিক যুগের দেবতা জ্ঞানের ইতিহাস। বেদে ইহার আভাস আছে। ঋক্ বেদের আপ্রী সূক্তে[১] বৃক্ষের স্তুতি আছে। বিশ্বদেবগণ সূক্তে[২] পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ ও তৎকালীন অন্যান্য পূজ্যগণের স্তুতি আছে। সূক্তটী আর্য্যদিগের কৃষি জীবন আরম্ভের পরের রচনা; কেন না ইহাতে কৃষির সাহায্যকারী গো এবং অশ্বেরও স্তুতি আছে। অন্য একটী সূক্তে ভেকের স্তুতি আছে। বৃষ্টিকামী বশিষ্ঠ বৃষ্টি কামনা করিয়া ভেকের স্তুতি করিয়াছিলেন।[৩] প্রাগ্‌বৈদিক যুগে অগ্নি বোধহয় আবিষ্কৃত হয় নাই। অগ্নি সভ্যতার প্রথম আবিষ্কার বলিয়াই মনে হয়, সেই জন্যই বোধহয় ঋক বেদের প্রথম ঋকেই অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋক্ বেদে পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, প্রভৃতির স্তুতি।

আদিম সমাজ যাহা বুঝিত সত্য, যাহা বুঝিত শিব, এবং যাহা বুঝিত সুন্দর, তাহাকেই পূজ্য বলিয়া উপাসনা করিত। যেমন—সূর্য্য, বৃষ্টি প্রভৃতি সাক্ষাৎ উপকারী অথবা

আদিম দেবভাব।

---

১ ঋক্‌বেদ ৫।৫ সূক্ত।

২ ঋক্‌বেদ ৭।৩৫ সূক্ত।

৩ ঋক্‌বেদ ৭।১০৩ সূক্ত। আমেরিকার মেক্‌সিকো দেশে ভেকের পূজা হইত। এখনও সেখানের ভেক দেবতার মন্দিরে একটী বৃহৎ পাষাণ "ভেক" দর্শকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভেকের শব্দ বৃষ্টির সূচক—এই জ্ঞান হইতেই ভেক-পূজার সৃষ্টি হইয়াছিল।

অপকারী সুতরাং ইহারা প্রত্যক্ষ সত্য। বৃক্ষ, গাভী প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উপকারী সুতরাং শিব। চন্দ্র, ফুল প্রভৃতি মনের আনন্দদায়ক সুতরাং সুন্দর।

এই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা বৈদিক যুগেও চলিয়াছিল।

বেদে তেত্রিশ দেবতা।

প্রাক্‌বৈদিক যুগে দেবতার সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট ছিল না। বেদে দেবতার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। ঋক বেদ বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। যথা—

যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামধ্যেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥ ১।১৩৯।১১

রমেশ বাবুর অনুবাদ—"যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ (সেবা) করেন।

তেত্রিশ দেবতার কথা ঋক বেদের অন্তত দশটী ঋকে আছে;[৪] কিন্তু—এই তেত্রিশ দেবতা যে কে—তাঁহাদের নাম কি? ঋক্‌বেদের

৩৩৩৯ দেবতা।

কোন ঋকেই তাহার স্পষ্ট প্রকাশ নাই। বরং এক স্থানে, এই দেব সংখ্যারই ব্যতিক্রম পাঠ আছে। তথায় ৩৩৩৯ জন দেবতার উল্লেখ আছে।[৫]

---

৪ ঋক বেদের ১।৩৪।১১; ১।৪৫।২; ১।১৩৯।১১; ৩।৬।৯; ৮।২৮।১; ৮।৩।২; ৮।৩৫।৩; ৯।৯২।৪ প্রভৃতি ঋকে ৩৩ দেবতার কথা আছে।

৫ ত্রীণিশতা ত্রীসহস্রাণ্যগ্নি ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসর্পয়ন্।" ৩।৯।৯ সায়নাচার্য্য ঋক্‌বেদের ভাষ্য করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"দেবতা কেবল ৩৩ জন; ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা প্রকাশক। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতও এইরূপ। কিন্তু সে মতের শেষ অন্যরূপ। বৃহদারণ্যক ৩।৯।৭ দ্রষ্টব্য।

বেদের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন উক্তি দেখিয়া ঋষিদের মধ্যেই যে কোন কোন ঋষি দেবতাগণ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, ঋক্ বেদের একটী ঋকে তাহার স্পষ্ট আভাস আছে।[৬]

দেবতায় অবিশ্বাস।

যাহা হউক, এই সন্দেহ পরিশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ৩৩৩৯ সংখ্যাটীও ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণের বিচারে টিকে নাই। কেন না পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ ও মহাভারতে এই ৩৩ দেবতার উল্লেখই স্থির রহিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, উপনিষদ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ তেত্রিশ দেবতা স্বীকার করিলেও এই সকলের উক্তি প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে; কারণ এই গ্রন্থগুলি বেদের ব্যাখ্যা নহে। বেদের শব্দ ব্যাখ্যাতা নিরুক্তকার যাস্ক বেদের ৩৩ দেবতার অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

যাস্কের মত ত্রিদেতা।

"ত্রিস্রোএব দেবতা।" ৭। ৫

দেবতা তিন জন মাত্র। এই তিন জন কে কে?

নিরুক্ত বলিতেছেন—"অগ্নি পৃথিবী স্থানো বায়ুর্ব্বা ইন্দ্রো বা অন্তরীক্ষ স্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। তাসাং মহা ভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহুনি নাম ধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্ম পৃথকত্বাৎ যথা—হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।"

অর্থ—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্বের কারণ—এক এক জন দেবতার বহু বহু নাম।

৬ নেম ঋষি এইরূপ পরস্পর বিরোধী কথা লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় বলিয়াছিলেন—ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছেন? ইত্যাদি। (ঋক্ ৮। ১০০ ৩) বোধহয় বেদের এই ঋক্‌টাই সাঙ্খ্য দর্শনের 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' এই মূল সূত্রের জন্মদাতা।

অথবা তাহাদের কর্ম্ম পার্থক্য হেতু নাম পার্থক্য। যেমন হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উগদাতা—প্রভৃতি এক ব্যক্তিরই নাম, বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য এইরূপ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে ও হইতে পারে।

ব্রাহ্মণ, রামায়ণ ও মহাভারতের রচনা কাল যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গ্রন্থগুলিতে এই তেত্রিশ দেবতার কিরূপ বিভাগ প্রদত্ত হইয়াছে অতঃপর তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

শতপথ ব্রাহ্মণের দেবতা।

বৈদিক "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ এখন নাই। তাহা সাম্প্রদায়িক প্রভাবে বিভিন্ন নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ৩৩ দেবতার বিভাগ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। "কতমে তে ত্রয়স্ত্রিংশদাদিত্যা অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্ত একত্রিংশৎ ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ ত্রয়স্ত্রিংশদিতি।"

শতপথ ব্রাহ্মণ—১১।৬।৩।৫

অর্থ—এই ৩৩ দেবতা কে কে? অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য। এই একত্রিশ। ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া তেত্রিশ।

এই মত বেদানুমোদিত নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ দ্বাদশ মাসকেই দ্বাদশ আদিত্য বলেন। যথা—

দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ। ১১।৬।৩।৮

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দেবতা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন—দেবতা ৩৩ জন সোমপ, এবং ৩৩ জন অসোমপ। মোট দেবতা এই ৬৬ জন।[৭] অসোমপদিগের কথা পরিত্যাগ করিয়া যদি সোমপের সংখ্যাই প্রকৃত দেবতার সংখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মত দাঁড়ায়—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্কার এই ৩৩ জন (সোমপ) দেবতা।

---

৭ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২। ১৮ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অসোমপ দেবতাগণকে যজ্ঞীয়

এই উক্তির সহিত বেদের ঐক্য দেখা যায় না, শতপথ ব্রাহ্মণেরও ঐক্য দেখা যায় না।

রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় "ত্রয়োত্রিংশদ্দেবাঃ"। রামায়ণের দেবতাগণের নামের উল্লেখ প্রবন্ধের প্রথমেই করা হইয়াছে। রামায়ণের তেত্রিশ দেবতা সংখ্যার সহিত শতপথ ব্রাহ্মণের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (অসোমপ দেবতাগণের সংখ্যা পরিত্যাগ করিয়া ধরিলে) ঐক্য আছে; কেবল শেষ দেবতা দুইটী সম্বন্ধে কোন গ্রন্থের সহিতই কোন গ্রন্থের ঐক্য নাই। রামায়ণের শেষ দেবতা দুইটীর নাম অশ্বিনীকুমার দ্বয়। ইঁহারাও বৈদিক দেবতা। সুতরাং সংখ্যার হিসাবে বেদের সহিত শতপথ ব্রাহ্মণ বা রামায়ণের কোন গোল নাই।

ঋকবেদের দেবতাগণ।

ঋকবেদের কোন একস্থানে এই ৩৩ দেবতার নাম না থাকিলেও বিভিন্ন ঋকে তাঁহাদের নাম আছে। রামায়ণের দেবতাদিগের নামের সহিত বৈদিক দেবতাগণের নামের ও কার্য্যের কিরূপ ঐক্য ভাব আছে তাহা আলোচনার সুবিধার জন্য এই স্থলে রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদে প্রদত্ত দেবতালিকা হইতে নামগুলি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া গেল। অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিদ্বয়, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ঋতুগণ, ব্রহ্মণস্পতি, সোম, ঋভুগণ, ত্বষ্টা, সূর্য্য, পৃথিবী, বিষ্ণু, পৃশ্নি, যম, পর্জ্জন্য, অর্য্যমা, পূষা, রুদ্র, রুদ্রগণ, বসুগণ, উশনা, ত্রিত, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা, অহির্বুধ্ন, অজ, একপাৎ, ঋভুক্ষ, গরুত্মান প্রভৃতি দেবতাগণের নাম ঋকবেদে আছে।

পশু দ্বারা প্রীত হন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারা বোধ হয় অনার্য্য দেবতা। ঋক্‌বেদের রাজা যযাতি অনার্য্য পত্নী গ্রহণ করিয়া আর্য্যে অনার্য্যে সম্মিলন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে অনেক অনার্য্য ব্যবহারের সহিত অনেক অনার্য্য দেবতাও আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিষয়টী আলোচনার যোগ্য।

বেদে পৌরাণিক যুগের দেবতাগণের ন্যায় প্রত্যেক দেবতাই স্ত্রী-দেবতা লইয়া অবস্থান করেন না। কদাচিৎ কাহারও স্ত্রী আছেন। ঋক্‌বেদের স্ত্রী-দেবতাগণের নাম ; যথা—সরস্বতী (নদী) সুনৃতা, ইলা, ইন্দ্রানী, মহী, হোত্রা, পৃথিবী, উষা, আপ্রী, রোদসী, রাকা, সিনীবালী, শ্রদ্ধা, শ্রী প্রভৃতি!

ঋক্‌বেদের স্ত্রী দেবতাগণ।

ঋক্‌বেদে অদিতি অর্থে—অসীম আকাশ—বলা হইয়াছে। যাস্ক সেই অর্থে "আদিনা দেবমাতা" নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই আমরা অদিতির পুত্রগণ বলিয়া আদিত্যগণকে পাই।[৮] ক্রম-বিকাশের পথে যাইয়া পুরাণে ইনি কশ্যপের স্ত্রী হইয়া আদিত্য বা দেবতাগণকে প্রসব করিয়াছেন।

অদিতি—আকাশ, আদিত্য মাতা।

ঋকবেদের যে সমস্ত দেবতার নাম উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে এই নামগুলিই যে অথবা ইহার কতকগুলিই যে যাস্ক কথিত ঋকবেদের তিন দেবতার তেত্রিশটী নাম, তাহা বেদের টীকাকারগণের টীকা হইতে বুঝা যায়। আপাততঃ এই প্রসঙ্গের আলোচনায় যতদুর প্রয়োজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমীর টীকা হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

ঋক্‌বেদের দেবতাগণ সম্বন্ধে সামশ্রমীর মত।

আকাশের দেবতা আদিত্য (সূর্য্য) সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সামশ্রমী লিখিয়া-

৮ আদিত্য যে দ্বাদশ জন, তাহা কোন কোন ব্রাহ্মণ ও রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে স্বীকৃত হইলেও এই দ্বাদশ সংখ্যাটী বেদ-সম্মত নহে। ঋক্‌বেদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংখ্যক আদিত্যের কথা পাওয়া যায়। যথা—২ মণ্ডলের ২৭ সূক্তে আছে—আদিত্য ছয় জন। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে আছে আদিত্য সাত জন। ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আছে অদিতির ৮ পুত্র জন্মিলে তিনি মার্ত্তণ্ড নামক পুত্রকে ত্যাগ করিয়া ৭ জন লইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন···ইত্যাদি।

ছেন—"উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল। অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে 'ভগ' সেই কালের সূর্য্য।

"যে পর্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্প তেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।

"পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল, ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমা অন্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।

"মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।" ইত্যাদি।[১]

এই ব্যাখ্যা নিরুক্তকারদিগের অনুসরণে করা হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

বেদের এই তিন দেবতা ক্রমে রামায়ণের যুগে আসিয়া তেত্রিশে পরিণত হইয়াছিলেন।

বেদের দেবতার নামের তালিকার মধ্যে পৌরাণিক যুগের শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নাম নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিষ্ণুর নাম বেদের অনেক স্থলেই আছে; কিন্তু তিনি তথায় সূর্য্য রূপে পরিচিত হইয়াছেন। ঋকবেদে ১ম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত ঋক্গুলির ৬টী ঋকে বিষ্ণুর উপাসনা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে ১৭শ ঋকটীর উল্লেখ করা হইল।

বেদের বিষ্ণু।

এই ঋক্‌টিতে আছে—"ইদম্ বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।"

রমেশ বাবুর অনুবাদ—বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

এই বিষ্ণু কে? তাঁহার তিন প্রকার পদবিক্ষেপ ই বা কি?

---

১ রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদ হইতে উদ্ধৃত।

নিরুক্ত ইহার উত্তর দিয়াছেন। নিরুক্তকার যাস্ক তাঁহার নিজ মত সহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকার ঔর্ণবাভ ও শাকপূণির মত উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়াছেন—"বিষ্ণু" শব্দ দ্বারা এখানে সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।[১০]

সায়নাচার্য্য এবং দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণুরাদিত্যঃ" এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুর তিন পদ কি—তাহার আলোচনা গ্রন্থের ১ম অংশের "প্রক্ষিপ্ত রচনা" অধ্যায়ে (১০০ পৃঃ) করা হইয়াছে। রামায়ণে বিষ্ণুর এই বৈদিক ত্রি পাদবিক্ষেপের উল্লেখও আছে। যথা:—

তত্র পূর্ব্ব পদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণু স্ত্রিবিক্রমে।
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ॥ ৫৮। ৪। ৪০

এই মতই যেন অন্যতম নিরুক্তকার শাকপূণি গ্রহণ করিয়াছেন।

রামায়ণের আদিম স্তরের রচনায় আমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ পাই না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবাসুর কল্পনা ও বামনরূপের গল্প আছে।[১১] শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সকল দেবতার মধ্যে প্রাধান্য লাভের কথা আছে।[১২] এইরূপে ঋক্ বেদের সূর্য্য দেবতা বিষ্ণু, ক্রমে সূর্য্য হইতে পৃথক হইয়া হইয়া পৌরাণিক যুগে আসিয়া সর্ব্বপ্রধান দেবতার আসন গ্রহণ করেন।[১৩] তাঁহার

ত্রি দেবতার বিকাশ।

১০ নিরুক্ত ১২। ১৯

১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬। ১৫

১২ শতপথ ব্রাহ্মণ ১। ২। ৫ ও ১৪। ১। ১

১৩ বিষ্ণু পুরাণে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ আদিত্য। সেখানে তিনি আর সূর্য্য নহেন। সূর্য্যের ভ্রাতা অদিতির দ্বাদশ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যথা—

সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি ব্রহ্মায় এবং রুদ্র শিবে পরিণত হন। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান দেবতা হন।

রামায়ণ এই যুগের পূর্ব্বে রচিত। রামায়ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ না থাকিবার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণের সমাজ বৈদিক কালের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৈদিক ভাবাপন্ন সমাজ;[১৪] সুতরাং দেবতা জ্ঞান সম্বন্ধে সেই সমাজ বৈদিক সমাজ অপেক্ষা খুব অধিক অগ্রসর হয় নাই। এমন কি মহাভারতের সমাজ দেবতা জ্ঞানে যতদূর অগ্রসর রামায়ণের সমাজ ততদূরও অগ্রসর নহে। এই তুলনা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে। এইক্ষণ রামায়ণী সমাজের দেবতা জ্ঞানের পরিচয়ই প্রদত্ত হইল।

রামায়ণের দেবতাগণ।

কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ বর দিতে স্বীকৃত হইলে কৈকেয়ী দেবতাগণকে ডাকিয়া সাক্ষী করিতেছেন—

কৈকেয়ীর প্রার্থনায় দেবতার নাম।

তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা॥ ১৪

তত্র বিষ্ণুশ্চশক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রোবরুণ এব চ।
অংশোভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতা॥

বিষ্ণু পুরাণ ১।১৫।১০

রামায়ণের কোন কোন স্থানে আছে "ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু"।

১৪ ভারতীয় সাহিত্যে বেদ ও রামায়ণের সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ও সমাজের কোন সাহিত্য নাই। এই হিসাবে রামায়ণের সমাজকে বৈদিক সমাজের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বলা হইল। এই দুই সময়ের ব্যবধান কালের নির্দ্দেশ এখানে করা হইল না। তাহার কারণ—বেদের ঋক সমূহ কোন একসময়ে সংগৃহীত অথবা রচিত হয় নাই।

নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব॥ ১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরংমম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ॥ ১৬।২।১১

অর্থ—ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল, গ্রহ, দিক, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অন্যান্য দেবতা সকলে অবগত হউন; এই সত্যসন্ধ ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কৈকেয়ী তাঁহার সময়ের সমাজে-উপাসিত সকল দেবতাকেই যে আহ্বান করিয়াছিলেন—অন্ততঃ স্ত্রী বুদ্ধিতে তাঁহার যতদূর দেবতার জ্ঞান ছিল—তিনি যে সেই জ্ঞান অনুসারেই দেবতাগণকে ডাকিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। এই উক্তিতে স্ত্রী জনোচিত অনভিজ্ঞতার পরিচয়ও যথেষ্ট আছে; সেরূপ ত্রুটী খুবই স্বাভাবিক।

কৈকেয়ী সকলকেই সাক্ষী মাণ্য করিলেন, কিন্তু তিনি তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নাম উচ্চারণ করিলেন না! পাঠক ইহাও লক্ষ্য করিবেন যে এই রচনা অংশটী রামায়ণের একেবারে আদি স্তরের রচনা। ইহা প্রক্ষিপ্ততা দোষে কলঙ্কিত হয় নাই।

অন্যত্র—কৌশল্যা রামকে বন গমনে বিদায় দিতেছেন। মাতা একমাত্র পুত্রের জন্য আকুল প্রাণে দেবতাদিগের নিকট কুশল ভিক্ষা চাহিতেছেন—

কৌশল্যার মুখে দেবতার নাম।

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ ৬
সমিৎকুশপবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ।
স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাঃ ক্ষুপা হ্রদা॥ ৮

পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৮
স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পুষা ভগোঽর্য্যমা।
লোকপালাশ্চ তে সর্ব্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা ॥ ৯
ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্ব্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্ত্তাশ্চ স্বস্তি কুর্ব্বন্তু তে সদা ॥ ১০
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্ব্বতঃ।
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চেন্দ্রো বৃহস্পতিঃ ॥১১
সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্ব্বতঃ।
তে চাপি সর্ব্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥১২
স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।
শৈলাঃ সর্ব্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ ॥১৩
দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।
নক্ষত্রাণি চ সর্ব্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ ॥”১৪
অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্।
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা ॥১৫

*   *   *   *

সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব।
মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ১৯

*   *   *   *

স্বস্তিতেঽস্ত্বন্তরীক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।২২
সর্ব্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ।
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা ॥২৩
অগ্নি র্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ ॥২৪।২ ।২৫

ইহার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতি পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই জন্যই এত বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত হইল। এই বিস্তৃত প্রার্থনার অর্থ এই যে—

হে পুত্র তুমি জনক-জননী শুশ্রূষা জনিত যে পুণ্য তাহা দ্বারা ও সত্য ব্যবহার দ্বারা রক্ষিত হও। সমিধ, কুশ, পবিত্রবেদী, দেবায়তন ও ব্রাহ্মণগণ তোমাকে রক্ষা করুন। শৈল, হ্রদ, বৃক্ষ, পতঙ্গ, সর্প হইতে তুমি রক্ষিত হও। সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, মরুৎগণ, মহর্ষিগণ, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা প্রভৃতি লোকপালগণ; ষড়ঋতু, দ্বাদশ মাস, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত—তোমাকে রক্ষা করুন। শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, স্কন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষিগণ, নারদ, দিকপালদিগের সহিত দিক সকল তোমাকে রক্ষা করুন। আমি শৈল, সমুদ্র, বরুণ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু, চরাচর, নক্ষত্র, গ্রহ সকলকে স্তব করিলাম—ইঁহারা তোমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।...

পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের প্রাণীগণ, সমস্ত দেবতাগণ ও শত্রুগণের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম ও ঋষিমুখ নির্গত মন্ত্রসকল তোমাকে রক্ষা করুন।... ইত্যাদি।

কৌশল্যার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনাতে একটা ভয়ানক নৈরাশ্যের হতাশ ভাব প্রকাশ পাইতেছে—তিনি আশাহত হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আকুল প্রাণে বনের সরীসৃপ হইতে দৃশ্য অদৃশ্য যত কিছু প্রাণী ও দেবতার নাম লইয়াছেন; কিন্তু কৈ, তিনিত পৌরাণিক কোন দেব দেবীর নাম লইলেন না।

লক্ষ্যের বিষয়।

এই স্থানে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কৌশল্যার উক্তির পূর্ব্বে কৈকেয়ীর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাকে আমরা আদিম স্তরের রচনা বলিয়াছি; কৌশল্যার এই উক্তিটী কিন্তু সেরূপ নহে।

এই রচনার মাঝে মাঝে শব্দ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এবং এক কথারই পুনরাবৃত্তি আছে—শ্লোকগুলি পরস্পর মিলাইয়া পাঠ করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।[১৫]

দ্বিতীয় লক্ষ্যের বিষয়—যে সূর্য্যবংশের কুলবধূ কৌশল্যা, সেই সূর্য্য বংশের বংশ-দেবতা সূর্য্যের নামই তিনি লইতে প্রায় যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রার্থনার একেবারে শেষ অংশে রামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিয়া যেন হঠাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়—সূর্য্য, অগ্নি ও বায়ুর কথা তাঁহার মনে পড়িল! তখন তিনি সেই ত্রি দেবতার নাম লইতে লইতে শেষ ব্রহ্মার নামটীও লইয়া ফেলিলেন। যথা—

"সর্ব্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্ত্তা তথর্ষয়ঃ॥"২৫।২।২৫

এই উক্তিই কৌশল্যার শেষ উক্তি।

তৃতীয় লক্ষ্যের বিষয়—কৌশল্যার বিষ্ণু উপাসনার উল্লেখটী। রাম বনে গমন করিবেন বলিয়া জননী কৌশল্যার নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিলেন—জননী কৌশল্যা বিষ্ণু পূজায় রত। যথা—

"কৌশল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা।
প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী॥ ১৪।২।২০

কৌশল্যা বিষ্ণুর উপাসক হইয়াও তাঁহার আকুল প্রার্থনা, আশীর্ব্বাদ ও কামনার ভিতর বিষ্ণুর নামটীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন কেন?

বেদে বিষ্ণু ছোট দেবতা নহেন। ঋক্ বেদে ১০৫ স্থানে, সামবেদে

---

১৫ ১০ম শ্লোক ও ১৫শ শ্লোক প্রায় অনুরূপ; ৮ম শ্লোক ও ১৯শ শ্লোকও প্রায় ঐরূপ; ৭ম শ্লোকে 'শৈল' আছে, ১৩শ শ্লোকেও পুনরায় তাহা আছে। বিচারকালে পাঠক এই উক্তিকে অসহায়া কৌশল্যার উক্তি মনে না করিয়া মহাকবি বাল্মীকির রচনা বলিয়া মনে রাখিবেন, তবেই অসঙ্গতিগুলি ধরা পড়িবে।

২৪ স্থানে, যজুর্ব্বেদে ৫৯ স্থানে এবং অথর্ব্ব বেদে ৬৬ স্থানে বিষ্ণু দেবতার উল্লেখ আছে। এমন স্থলে কৌশল্যা বা কৈকেয়ী বিষ্ণুর নামটি লইলেন না কেন? তাহার কারণ—সেকালে সূর্য্যদেবতাই বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতেন। এখানেও কৌশল্যা যদি জগতের আদি চিন্তনীয় দেবতা বা নিজ বংশ দেবতা সূর্য্যেরই পূজা করিতেছিলেন বুঝা যাইত, তাহা হইলে কেবল 'বিষ্ণু' শব্দের জন্য কোন আপত্তির কারণ হইত না। কিন্তু এ স্থানের বিষ্ণু সূর্য্য নহেন, তিনি নারায়ণ—মধুসূদন।

আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশের প্রক্ষিপ্ত রচনা অধ্যায়ে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানেও পুনরায় ২৫ সর্গের ব্রহ্মার উল্লেখ এবং ২০ সর্গের বিষ্ণুর উল্লেখকে পরবর্ত্তী সময়ের প্রক্ষিপ্ত বলিয় নির্দ্দেশ করিতেছি।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নাম যে পরবর্ত্তী যুগের প্রক্ষিপ্তকারদিগের দ্বারা রামায়ণে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন জন্য রামায়ণ হইতে এইরূপ শত শত স্থানের রচনা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আপাততঃ আর দুইটী মাত্র স্থানের দুইটি প্রার্থনার উল্লেখ করা গেল।

হনুমান লঙ্কায় যাইয়া সীতার অন্বেষণে প্রস্তুত হইয়া দেবতাগণের উদ্দেশে প্রণাম করিতেছেন—

বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যানশ্বিনৌ মরুতোঽপিচ।
নমস্কৃত্বা গমিষ্যামী ... ... ॥ ৫৭।৫।১৩

অর্থ—বসুগণ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে প্রণাম করিয়া গমন করিতেছি…ইত্যাদি।

এখানেও সেই বৈদিক তেত্রিশ দেবতার নামের উল্লেখই দেখা যাইতেছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ একেবারেই নাই!

হনুমান বনে প্রবেশ করিয়া কার্য্যারম্ভের প্রাক্কালে পুনরায় প্রণম্যদিগকে প্রণাম করিলেন—

হনুমানের প্রার্থনায় প্রণম্যদিগের নাম।

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তুরুদ্রেন্দ্রযমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রাগ্নিমরুদগণেভ্যঃ॥ ৬০

স তেভ্যস্তু নমস্কৃত্য সুগ্রীবায় চ মারুতিঃ।
দিশঃ সর্ব্বাঃ সমালোক্য সোঽশোকবনিকাং গতঃ॥৬১।৫।১৩

হনুমান—রাম, লক্ষ্মণ সীতা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, অনিল, চন্দ্র, অগ্নি, মরুদ-গণ এবং সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া অশোক বনে প্রবেশ করিলেন।

রামায়ণী সমাজের উপাস্য দেবতা কে?

এই সকল সাময়িক ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্টই মনে হইবে, বাল্মীকির যুগ বৈদিক ভাবাপন্ন—অতি প্রাচীন যুগ। পৌরাণিক যুগের প্রভাব অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের কিম্বা স্ত্রীদেবতাগণের প্রভাব তখন একেবারেই ছিল না।

রামায়ণে স্তব, স্তুতি ও উপাসনার কথা আছে এবং হোম দ্বারা যজ্ঞ করিবার কথা আছে—তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে। কিন্তু তখনকার সমাজের উপাস্য দেবতা কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন স্থির নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উপাস্য দেবতার স্থলে রামায়ণের কোথাও বিষ্ণুর নাম প্রদত্ত হইয়াছে, কোথাও বা নারায়ণের নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং সেই নারায়ণকে "মধুসূদন" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কোথাও বা সূর্য্য উপাসনার কথা আছে।

কৌশল্যা যে পুত্রের ইষ্ট কামনায় বিষ্ণু পূজা করিয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। রামও না কি সেইরূপ

অভিষেকের পূর্ব্ব দিন সংযম করিয়া স্বীয় উপাস্য নারায়ণ (?) দেবতার ধ্যান করিয়াছিলেন। সে স্থলের বর্ণনাটী এইরূপ—

ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে ॥৩
বাগ্‌যতঃ সহ বৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ ॥
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিষ্যে নরবরাত্মজ ॥৪

*　　　*　　　*

তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূতমাগধবন্দিনাম্।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ ॥৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্।
বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান ॥ ৭।২।৬

অর্থাৎ রাম বাক্‌যত হইয়া একাগ্র মনে নারায়ণের ধ্যান করিয়া বিষ্ণু মন্দিরে কুশ আস্তরণে বৈদেহীর সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ··· ভোরে সূত মাগধ ও বন্দিগণের বন্দনাবাক্যে জাগ্রত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা অন্তে মন্ত্র জপ করিলেন। পরে ক্ষৌমবাসে ভূষিত হইয়া নত মস্তকে মধুসূদনকে স্তব করিয়া দ্বিজগণ কর্ত্তৃক স্বস্তি বাচন করাইলেন।

যুগধর্ম্মের সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া এবং কৈকেয়ী, কৌশল্যা ও হনুমান প্রভৃতির উপর্যুক্ত উক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া বিচার করিলে উপরি উদ্ধৃত বর্ণনার অমূলকতা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। রাজা দশরথের আদেশেও রামকে সীতার সহিত সংযত চিত্তে উপবস্তব্যেরই কথা আছে—বিষ্ণু পূজার কোন উল্লেখ নাই। উপবস্তব্য বা উপবাস অর্থ "গার্হপত্য অগ্নি সমীপে বাস"। (৩০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কোন বিষ্ণুভক্ত প্রক্ষিপ্তকার পূর্ব্বাপর লক্ষ্য না করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবণতায় অন্ধ হইয়া এস্থলে রামকে নারায়ণের পূজা করাইয়া বৈদেহীর সহিত একেবারে বিষ্ণু মন্দিরেই শয়ান করাইয়াছেন।

এই পাঠে নারায়ণকে বিষ্ণু এবং উভয়কে মধুসূদন নামে পরিচিত করা হইয়াছে।

নারায়ণ বৈদিক দেবতা নহেন। ঋক বেদের দুইটী ঋকে জল প্লাবনের কথা আছে।[১৬] ঐ প্লাবনে দেবতাগণ অণ্ড মধ্যে অবস্থিত ছিলেন।

নারায়ণের উৎপত্তি ও বিকাশ।

ঐ অণ্ড একটা জন্ম রহিত কিছুর উপর অবস্থিত ছিল। পরবর্ত্তী কালের শ্রৌত সাহিত্যে তাঁহাকেই 'নার' (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার—তিনি নারায়ণ—এই নামকরণ করা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এইরূপ উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।[১৭] শতপথ ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী উপনিষদ সমূহে নারায়ণ পরম পুরুষ বাচ্যে অভিহিত হইয়াছেন। ইহার পর আরও আধুনিক কালে তাঁহার নিজ নামেও একখানা উপনিষদ প্রচারিত হইয়াছে; তাহা "নারায়ণ উপনিষদ।" এই উপনিষদে নারায়ণ বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন। নারায়ণ উপনিষদে তাঁহার যে ধ্যান প্রদত্ত হইয়াছে; তাহা এইরূপ—

নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায়[১৮] ধীমহী তন্নো বিষ্ণু প্রচোদায়াৎ।

১০।১।৬

এই ধ্যান তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দুর্গা গায়ত্রীর অনুকরণে রচিত। দুর্গা গায়ত্রী—দুর্গার উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনায়—পরে উদ্ধৃত হইবে।

কথিত আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষদগুলিরই

---

১৬ ঋক্ বেদ ১০।৮২।৫—৬

১৭ শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।৩।৪; ১৩।৬।১

১৮ নারায়ণ বাসুদেব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব হইলেন, কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব পুত্র বাসুদেব হওয়ায় নারায়ণও বাসুদেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন, তাহা "মহাভারতের সমাজ" গ্রন্থে আলোচিত হইবে।

আলোচনা করিয়াছেন এবং নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সে জন্য, তাঁহার আলোচনায় যে সকল উপনিষদের নাম নাই, পণ্ডিতগণ ঐ সকল উপনিষদকে আধুনিক—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন। এই যুক্তি খুব নিরাপদ না হইলেও নারায়ণ উপনিষদ যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ের রচনা, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কেহ কেহ বলেন—ইহা আগম-সম্মত অর্থাৎ তান্ত্রিক প্রভাব যুক্ত উপনিষদ; কেহ বা ইহাকে দক্ষিণাপথের দ্রাবিড় জাতির কল্পিত উপনিষদ বলিয়াও মনে করেন।

শতপথ, ঐতরেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রামায়ণের পরে রচিত। রামায়ণে "ব্রাহ্মণের" উল্লেখ আছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শাখাব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির নামের উল্লেখ নাই।

বৈদিক যুগের পরে সামাজিক ক্রিয়া কলাপ পরিচালনের জন্য 'ব্রাহ্মণ' রচিত হইয়া বৈদিক ক্রিয়া কলাপের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণ মাত্র একখানাই ছিল এবং তাহাই কল্পসূত্র (কার্য্যবিধি) নামে অভিহিত হইত। লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে পরে, পৃথক পৃথক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শতপথ, ঐতরেয় প্রভৃতি পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার বহু পরে পৃথক পৃথক সমাজের জন্য পৃথক পৃথক কল্প-সূত্রও রচিত হয়।

নারায়ণের "মধুসূদন" নামটী আরও পরবর্ত্তী যুগের কল্পিত—ব্রহ্মা ও মধুদৈত্য সম্পর্কীয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী হইতে উদ্ভূত।

সূর্য্যোপাসনার প্রভাব।

রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই উপাসনা বা আরাধনা খুব স্বাভাবিক। কেন না, তিনি তাঁহাদের বংশকে এই সূর্য্য দেবতারই বংশ বলিয়া জানিতেন। সূর্য্য আদি দেবতা—এই জন্যও সভ্য অসভ্য সকল দেশের সকল জাতিরই আদি উপাসনার জিনিস সূর্য্য। সূর্য্যের উপাসনা লইয়া দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যে একটা

যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার কথা কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে যেমন সূর্য্য উপাসনার কথা আছে, আবেস্তা গ্রন্থেও সেইরূপ সূর্য্যের উপাসনার কথা আছে। আবেস্তার সূর্য্য 'মিথ্র'। পারস্য দেশে 'মিহর' পূজা প্রচলিত ছিল। মিহর ও সংস্কৃত 'মিহির' এক। পারস্য হইতে সূর্য্য পূজা এসিয়ামাইনরে যায়—ঐ স্থানের প্রাচীন হিটাইট জাতি সূর্য্যোপাসক ছিল। তথা হইতে সূর্য্য পূজা রোমে যায়।

ঐতিহাসিক যুগেও ভারতে সূর্য্যোপাসনার প্রচলন ছিল; তাহার প্রমাণ—কুশন-রাজ কনিষ্ক সূর্য্যোপাসক ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় সূর্য্যমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। এরূপ অবস্থায় সূর্য্য বংশের কুলবধূ কৌশল্যা যে সূর্য্যেরই উপাসনা করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যই তখনকার সমাজের উপাস্য দেবতা ছিলেন—ইহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। রামও এই উপাস্য দেবতারই স্তব করিয়াছিলেন। রামায়ণের একস্থানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সকলেই যে সূর্য্যস্তব করিতেন তাহারও উল্লেখ আছে।

সূর্য্য বংশীয়ের সূর্য্যোপাসনা স্বাভাবিক।

রাম যে রাবণ বধের পূর্ব্বে সূর্য্য উপাসনা করিতে যাইয়া আদিত্য হৃদয় স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তাহাও প্রক্ষিপ্তকারগণের কলুষ হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নাম এই স্তোত্রের শীর্ষেই স্থাপিত হইয়াছে। স্তোত্রটী ঠিক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপর অত্যাচারী শাসন কর্ত্তাদের নির্ম্মিত মস্‌জিদ চূড়ের মত আদিম ও অর্ব্বাচীনের যুক্তচিহ্ন লইয়া দণ্ডায়মান। স্তোত্রটী এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল—

রামের সূর্য্যোপাসনা।

"সর্ব্বদেবাত্মকো হ্যেষ তেজস্বী রশ্মিভাবনঃ।
এষ দেবাসুরগণান্ লোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ।৭

এষ ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ স্কন্দঃ প্রজাপতিঃ।
মহেন্দ্রো ধনদঃ কালো যমঃ সোমো হ্যপাংপতিঃ ॥৮
পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনো মরুতো মনুঃ।
বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্ত্তা প্রভাকরঃ ॥৯
আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান।
সুবর্ণসদৃশো ভানুর্হিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥১০
হরিদশ্বঃ সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।
তিমিরোন্মথনঃ শম্ভুস্ত্বষ্টা মার্ত্তণ্ডকোঽংশুমান্ ॥১১
হিরণ্যগর্ভঃ শিশিরস্তপনোঽহস্কর রবিঃ।
অগ্নিগর্ভোঽদিতেঃ পুত্রঃ শঙ্খঃ শিশিরনাশনঃ ॥১২
ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋক্‌যজুঃসামপারগঃ।
ঘনবৃষ্টিরপাং মিত্রো বিন্ধ্যবীথী প্লবঙ্গমঃ ॥১৩
আতপী মণ্ডলী মৃত্যুঃ পিঙ্গলঃ সর্ব্বতাপনঃ।
কবির্ব্বিশ্বো মহাতেজা রক্তঃ সর্ব্বভবোদ্ভবঃ ॥১৪
নক্ষত্রগ্রহতারানামধিপো বিশ্বভাবনঃ।
তেজসামপিতেজস্বী দ্বাদশাত্মন্নমোঽস্তুতে ॥১৫
নমঃ পূর্ব্বায় গিরয়ে পশ্চিমায়াদ্রয়ে নমঃ।
জ্যোতির্গণানাং পতয়ে দিনাধিপতয়ে নমঃ ॥১৬
জয়ায় জয়ভদ্রায় হর্য্যাশ্বায় নমোনমঃ।
নমোনমঃ সহস্রাংশো আদিত্যায় নমোনমঃ ॥১৭
নমঃউগ্রায় বীরায় সারঙ্গায় নমোনমঃ।
নমঃ পদ্ম প্রবোধায় প্রচণ্ডায় নমোঽস্তুতে ॥১৮
ব্রহ্মেশানাচ্যুতেশায় সূরায়াদিত্যবর্চ্চসে।
ভাস্বতে সর্ব্বভক্ষায় রৌদ্রায় বপুষে নমঃ ॥১৯

তমোঘ্নায় হিমঘ্নায় শত্রুঘ্নায়ামিতাত্মনে।
কৃতঘ্নায় দেবায় জ্যোতিষাং পতয়ে নমঃ ॥২০ | ৬ | ১০৬

এই স্তোত্রটী দ্বারা কতকটা একেশ্বরবাদিত্বের ভাব প্রকাশ পায়। সূর্য্য যেন তখন এমন দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহাকে তখন সর্ব্বগুণের, সর্ব্ব শক্তির ও সর্ব্ব ভাবের আধার বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারিত। পৃথিবীর সৌর উপাসকদিগের মধ্যে অবশ্য এ ভাব ছিল, তাই তাঁহারা সূর্য্যকেই পরমপুরুষ জ্ঞান করিতেন। রামায়ণের সমাজে তেমন ভাব ছিল না। সেই সমাজ সূর্য্যের উপাসনা করিলেও যজ্ঞে অগ্নিকেই অর্চ্চনা করিত। ইন্দ্রের সম্মানও সেই সমাজে ছিল; কিন্তু সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় ইন্দ্র তেমন ভাবে পূজিত হইতেন না। ঠিক বর্ত্তমান যুগের ব্রহ্মার ন্যায় ইন্দ্র অবহেলিত ছিলেন; বিষ্ণু ও শিবের ন্যায়, সূর্য্য ও অগ্নি পূজা পাইতেন। প্রতি গৃহে গৃহে সাক্ষাৎ যজ্ঞাগ্নি সসম্মানে রক্ষিত ও পূজিত হইত; সুতরাং রামায়ণী যুগে যে ত্রিদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহা এইভাব হইতে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

রামায়ণের সমাজে ত্রি-দেবতার উপাসনা।

রামায়ণের আদিত্যহৃদয় স্তোত্রের ন্যায় মহাভারতেও ইন্দ্র স্তোত্র এবং অগ্নি-স্তোত্র আছে। এস্থলে সূর্য্যের উপর যেমন সকল দেবতার সমবেত শক্তি আরোপিত হইয়াছে, মহাভারতের ইন্দ্রস্তোত্রে ইন্দ্রের এবং অগ্নিস্তোত্রে অগ্নির উপরও সেইরূপ হইয়াছে। এইরূপ নির্দ্দেশ দ্বারা একেশ্বরত্বভাব কল্পনা করা যায় না। এক দেবতার উপর যাবতীয় দেবতার শক্তি আরোপের ভাব আর্য্য সাহিত্যে সনাতন।

বেদে সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ক চিন্তার আভাস আছে। ঋক্‌বেদের একটী ঋক্ এইরূপ—

"দ্যুলোক ও ভূলোক ইঁহারাই শেষ নহেন। ইঁহাদের উপর আরও এক আছেন। তিনি প্রজা সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন। ... যে কালে সূর্য্যের ঘোটকগণ সূর্য্যকে বহন করিতে আরম্ভ করে নাই, সেই সময় তিনি আপনার পবিত্র চর্ম্ম (শরীর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

বেদে সৃষ্টিকর্ত্তা বিষয়ক চিন্তা।

এই ভাব বৈদিক যুগের শেষ ভাগের। এই ভাব তখন কোন কোন ঋষিদিগের মনে জাগিলেও সমাজে তাহা প্রভাব লাভ করিতে পারে নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিরও যে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তিনি পরমেশ্বর, পাপ পুণ্যের তিনি বিচার করিবেন—এমন ভাব রামায়ণের কোন স্থানেই নাই। সে ভাব রামায়ণী সমাজের ভাব হইলে রামকে রাবণ বধের জন্য কেবল সূর্য্যের উপাসনা করিতেই দেখিতাম না।

রামায়ণে ঈশ্বর জ্ঞানের অভাব।

একেশ্বরবাদের আলোচনা রামায়ণের পরবর্ত্তী দার্শনিক যুগে আরম্ভ হইয়াছিল এবং মহাভারতের সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তখন গীতা তারস্বরে প্রচার করিয়াছিলেন—

যে হপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তে হপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং ॥৯।২৩

অর্থ—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজন করে সে অবিধি পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।

মহাভারতের অন্যত্র—রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলে ভগ্নহৃদয়া শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন—"পুরাণ মুনি পরমেশ্বর সকলের হৃদয় মন্দিরে সর্ব্বদা জাগরূক আছেন। তাঁহার নিকট

কোন পাপ অবিদিত থাকে না। পরম পুরুষের কিছুই অবিদিত নাই।" [১৯]

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় ভক্তি যুগের রচনা হইলে এরূপ কথা অনেকের মুখেই শুনা যাইত; কিন্তু রামায়ণের কোন স্থানেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই। রাবণ বধের পর সীতাকে যখন রাম ত্যাগ করিলেন, তখনও সীতার মুখে এমন কোন কথা বাহির হয় নাই। ইহারও কারণ—রামায়ণের যুগ কর্ম্ম-যুগ।

যজ্ঞ, উপাসনা, দান, সত্যপালন, অতিথি-সৎকার প্রভৃতিই কর্ম্ম। এই কর্ম্ম অনুসরণ দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটিত—ইহাই ছিল সেই যুগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। এই বিশ্বাস অনুসারেই রামায়ণের সমাজ পরিচালিত হইতেছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে এই সকল কর্ম্মের ফলের প্রতি যখন সন্দেহ আসিয়াছিল—মানুষ দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছিল—যজ্ঞের ফল, বা কর্ম্মের ফল সকল সময় অভীষ্ট ফল প্রদান করিতেছে না, তখন লোক ক্রমে নিজ যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিল।

রামায়ণের যুগ কর্ম্ম যুগ।

কর্ম্মের যুগ, অন্ধ যুগ; জ্ঞানের যুগ, বিচারের যুগ। ইহাই দর্শন—উপনিষদ প্রভৃতিরও যুগ। যুক্তির পর ভক্তি। রামায়ণে ভক্তি সম্বন্ধীয় কথা একেবারেই নাই। ভক্তির সম্যক অনুশীলন ব্যতিরেকে ঈশ্বর জ্ঞান অসম্ভব। মহাভারতের যুগ ভক্তি অনুশীলনের যুগ। মহাভারতে প্রচুর ভক্তি-কথা ও ভক্তের কথা আছে। ভক্তের হৃদয়েই বাস করিয়া থাকেন শ্রীভগবান।

পরবর্ত্তী যুগ—যুক্তিযুগ ও ভক্তিযুগ।

---

১৯ মহাভারত আদি পর্ব্ব—৭৪শ অধ্যায়।

রামায়ণের যুগ যে ঈশ্বর-বাদ বা একেশ্বরবাদ বিশ্বাসের যুগ নহে, তাহা প্রদর্শন জন্যই এখানে এত কথা বলা হইল।

রামায়ণের রচনার আদি স্তরে ব্রহ্মারও উল্লেখ নাই। "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা রামায়ণে বেদ ও "ব্রহ্মঘোষ" শব্দে বেদধ্বনি বুঝাইয়াছে।[২০] প্রজাপতি নির্দ্দেশ স্থলেও ব্রহ্মার উল্লেখ রামায়ণের আদি স্তরের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না।[২১]

ব্রহ্মা রামায়ণী যুগের দেবতা নহেন।

'ব্রহ্ম' শব্দ বা 'ব্রহ্মা' শব্দ বেদে আছে। ব্রহ্ম শব্দের বৈদিক অর্থ— স্তোত্র ও বেদমন্ত্র এবং ব্রহ্মা অর্থ—স্তোতা, যাজক বা পুরোহিত। সেই বৈদিক অর্থে এখনও ব্রহ্মা শব্দে শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদিতে যাজ্ঞিককেই বুঝাইয়া থাকে। ব্রহ্মাকে পুরাণে প্রজাপতি বলা হইয়া থাকে। প্রজাপতি শব্দ বেদে আছে। তাহার অর্থ একএক স্থানে একএক রূপ। কোথায়ও তাঁহার শক্তি বেশী,

বেদে ব্রহ্মা শব্দ।

---

২০ শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্॥ ২।৫।১৮ সর্গ।

২১ রামায়ণের একস্থানে প্রজাপতি নির্দ্দেশক এইরূপ একটী শ্লোক আছে —

কর্দ্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরঃ।
শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্য্যবান॥৭
স্থাণুর্ম্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল।
পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃপুলহস্তথা॥৮
দক্ষোবিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব।

আরণ্যকাণ্ড — ১৪ শ সর্গ।

অর্থ—পক্ষিরাজ সম্পাতি রামকে বলিলেন —কর্দ্দম প্রথম প্রজাপতি; তৎপর ক্রমে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, সূর্য্য এবং অরিষ্টনেমি ইঁহারা প্রজাপতি হন। ... ...

কোথায়ও সামান্য। এক স্থানে তিনি বিবাহের দেবতা। পুরাণে ব্রহ্মাকে এই অর্থেও প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

"ব্রহ্মা" শব্দ বিভিন্ন বচনে ও বিভক্তিতে ঋক্‌বেদে ২৯৩ বার, যজুর্ব্বেদে ৮০ বার ও অথর্ব্ববেদে ৩৬৪ বার উল্লেখিত হইয়াছে। বেদের নিরুক্তকার যাস্ক এই বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রূপের ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা অন্ন, যজ্ঞ, স্তোত্র, হোতৃ, কর্ম্ম, বৃহৎ, বেদ, সত্য, প্রভৃতি অর্থ করিয়াছেন। এতদ্ ব্যতীত ব্রহ্ম শব্দের আর কোন বিশেষ অর্থ বেদে নাই; থাকিলেও যাস্ক তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। পরবর্ত্তী কেহ কেহ ব্রহ্মন্ শব্দে সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেহ বা উহাকে সূর্য্যের বিশেষণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই। ব্রহ্মন্ যে সূর্য্য অথবা সূর্য্যের বিশেষণ তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈদিক সূর্য্য স্তবটী এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে,
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"

বৈদিক যুগের পর জ্ঞানচর্চ্চার যুগে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলিতে আমরা ব্রহ্মকে শ্রেষ্ঠ দেবতার স্থানে দেখিতে পাই।

ব্রহ্মের ক্রম বিকাশ।

শতপথ[২২] ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে[২৩] প্রজাপতিই সৃষ্টিকর্ত্তা। এই যুগেই প্রজাপতিত্বে ব্রহ্মের বিকাশ আরম্ভ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মা হিরণ্য-গর্ভ।[২৪] অপেক্ষাকৃত আধুনিক নারায়ণ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মা নারায়ণের নাভি পদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই চিন্তাটী ঋক্‌বেদ হইতে গৃহীত।

---

২২ শতপথ ব্রাহ্মণ ৭।৫।২।৬

২৩ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।২।৭।১

২৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১২

নারায়ণের আলোচনায় (৩৪১ পৃষ্ঠায়) তাহা বিবৃত হইয়াছে। জন্ম রহিত অচিন্তনীয় পুরুষের নাভিতে যে অণ্ড ছিল ব্রহ্মা তাহাতেই অবস্থিত ছিলেন। এই অণ্ডকেই ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করা হইয়াছিল এবং তাহার অভ্যন্তরে যে পুরুষ ছিলেন তিনিই ব্রহ্মা। সুতরাং "নারায়ণাদ্‌ব্রহ্মা জায়তে। ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ।"[২৫] কৌষিতকী উপনিষদে দেখা যায় তাঁহার পঞ্চ মুখ। "পঞ্চমুখোঽসীতি প্রজাপতিঃ।"[২৬] পৌরাণিক যুগে শিবসংক্রান্ত ব্যাপারে ইনি মিথ্যা সাক্ষ্য দান করায় শিবের অভিশাপে ইঁহার একটী মস্তক পড়িয়া যায় এবং তাঁহার পূজা লুপ্ত হইয়া যায়।[২৭] এইজন্য মহাভারতের পরবর্ত্তী স্তরের রচনায় এবং পুরাণ সমূহে তিনি চতুর্ম্মুখ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণে এবং মহাভারতে তিনি প্রজাপতি, ব্রহ্মা এবং লোক-পিতামহ বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন।

---

২৫ নারায়ণ উপনিষদ।

২৬ কৌষিতকী উপনিষদ ২।৪

২৭ লিঙ্গ পুরাণ। বোধ হয় পঞ্চ বেদ (যজুর্ব্বেদকে শুক্ল ও কৃষ্ণ—দুইখানা ধরিয়া) হিসাবে প্রথমে ব্রহ্মের পঞ্চ মুখ কল্পিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে এই কল্পনা অসঙ্গত মনে হওয়ায় একটী মস্তককে শাপগ্রস্ত করিয়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মৎস্য পুরাণে এই শেষ মতই প্রদত্ত হইয়াছে। (মৎস্য ৩য় অধ্যায় ২—৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কালিকা পুরাণে ব্রহ্মার উপর কন্যা গমনের অভিযোগ আছে; কুমারিলের ব্যাখ্যার সহিত তাহা প্রথম অংশে ১১০ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সে স্থলে প্রজাপতি আছে, ব্রহ্মা নাই। প্রজাপতি তথায় স্পষ্ট সূর্য্য। ঋক্‌বেদে এই অভিযোগের সহিত রুদ্রের নামের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

এই সমস্ত ব্যাপারের যে ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, তবে অন্ধভাবে পৌরাণিক অর্থ গ্রহণ করাও নিরাপদ নহে। কেন না উহা কল্পনায় অনুরঞ্জিত।

এই সকল প্রাচীন উপাখ্যান যাহাই নির্দ্দেশ করুক, ব্রহ্মের প্রভাব লুপ্তির প্রধান কারণ বৌদ্ধ-বিপ্লব। বৌদ্ধ বিপ্লবে সকল দেবতারই প্রভাব লুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর ব্রাহ্মণ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের আবির্ভাবে বিষ্ণু ও শিবের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; ব্রহ্মা, উপাসক অভাবে সমাজে অচল হইয়া অগ্নিরূপে কেবল যজ্ঞকালে পূজা পাইতে থাকেন। ইহাই ব্রহ্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রভাব লুপ্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ব্রহ্মের প্রভাব লুপ্তির কারণ।

ব্রহ্মাকে তর্কের অনুরোধে বৈদিক শব্দোৎপন্ন দেবতা বলিলেও বলা যাইতে পারে কিন্তু শিব তাহাও নহেন। শিবের নাম দেবতা রূপে বেদে নাই; বিশেষণ রূপে আছে।"[২৮] মহাদেব শব্দও ঋক্ বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে বিশেষ রূপে আছে। সামবেদেও মহান্ দেবতা অর্থে আছে। এই মহাদেবতার পঞ্চ মুণ্ড। যজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়) সংহিতায় শতরুদ্র স্তোত্রে রুদ্রকে গিরিশ, গিরিত্র, কপর্দ্দী, শম্ভু, শঙ্কর, পশুপতি, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ, শর্ব্ব, ভব ইত্যাদি নামে অভিহিত

শিব কথা।

ব্রহ্মার [প্রজাপতি] পূজা লুপ্তির আর একটী গল্প শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। গল্পটী এইরূপ—

মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে মন দেবগণের নিকট যজ্ঞ বহন করেন; স্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বাক্য দেবগণের নিকট যজ্ঞ বহন করিয়া নেন।

এখন কে বড়? মন ও বাক্যের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে উভয়ে প্রজাপতিকে মধ্যস্থ করিয়া বিচারপ্রার্থী হইলেন ... ...

প্রজাপতি দ্বারা পরাজিত হইয়া বাক্য প্রজাপতির হব্য বহন করিতে বিরত হইল। এই হইতে যজ্ঞ [ও পূজার] প্রজাপতির মন্ত্র মনে মনে হয়। বোধ হয় এইরূপ সংস্কার হইতেই ব্রহ্মার পূজা কমিয়া যায়। [শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৩।৬।২—১২]

২৮ ঋক্বেদ ১০।৯২।৯, শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩।৬১ অথর্ব্ববেদ ১৩।৪।৪

করা হইয়াছে।[২৯] কোথাও ত্র্যম্বক,[৩০] পিনাকী, কৃত্তিবাস[৩১] নামও দৃষ্ট হয়। একস্থানে এই রুদ্রের ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ আছে। যথা :—

এষতে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়াত্বং জুষস্ব স্বাহা। ৩। ৫৭

ঋক্ বেদেও রুদ্রকে ঈশান,[৩২] সংহারী,[৩৩] কপর্দ্দী,[৩৪] আশুতোষ,[৩৫] পশুদিগের কর্ত্তা,[৩৬] চিকিৎসক,[৩৭] ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে রুদ্রকে সহস্র চক্ষু[৩৮] এবং কোথাও বরুণ[৩৯] বলা হইয়াছে। বেদ সংহিতা সমূহে আরও বহু স্থানে রুদ্রের বর্ণনা আছে। সর্ব্বত্রই তাঁহাকে অগ্নির স্থানীয় রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদের সকল স্থলেই রুদ্র শব্দ এক বচনে ব্যবহৃত হয় নাই ; অনেক স্থলেই বহু বচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋক্‌বেদে রুদ্র মরুৎগণের পিতা।[৪০]

---

২৯ যজুর্ব্বেদ ১৬। ৪

৩০ যজুর্ব্বেদ ৩। ৫৮

৩১ যজুর্ব্বেদ ৩। ৬৩

৩২ ঋকবেদ ২।৩৩।৯

৩৩ ঋকবেদ ২।৩৩।১২

৩৪ ঋকবেদ ১।১১৪।৫

৩৫ ঋকবেদ ১।১১৪।৯

৩৬ ঋকবেদ ১।১১৪।১

৩৭ ঋকবেদ ২।৩৩।৪

৩৮ অথর্ব্ববেদ ১১।২।২৭ ; শুক্লযজুর্ব্বেদ ১৬।৭

৩৯ অথর্ব্ববেদ ১৩।৪।৪

৪০ ঋকবেদ ১।৬৪।২

সায়নাচার্য্য "রুদ্রাসঃ অর্থে " রুদ্রপুত্রা মরুতঃ " এই রূপ করিয়াছেন। ১।৩৯।৪ ঋক্ দ্রষ্টব্য।

বৈদিক রুদ্র দেবতাই যে পুরাণে তাঁহার বিভিন্ন নাম ও সেই নামের এক একটী কাল্পনিক ইতিহাস সহ শিবরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, এসম্বন্ধে মতভেদ খুব কম। এস্থলে শিবের সেই ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর একটুক স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া এই শিব-কথার উপসংহার করা যাউক।

শিবের ক্রম বিকাশ।

নিরুক্তকার যাস্ক বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে" [৪১] সায়নাচার্য্য বলেন "রুদ্রায় ক্রুরায় অগ্নয়ে।"

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণেও রুদ্র দেবতাকে অগ্নি বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছে। [৪২]

অন্যান্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ সমূহেও রুদ্র অগ্নিরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। রুদ্রের এই বিকাশের ইতিহাস পৌরাণিক যুগের উপনিষদ গ্রন্থ গুলিতে আরও স্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরবর্ত্তী উপনিষদগুলি পাঠে বুঝা যায়, ধীরে ধীরে রুদ্রের তেজ হইতেই ধ্বংশকারী শিব দেবতার উৎপত্তি হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই রুদ্রকে প্রথম গিরীশ বা শিবরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। [৪৩] পরবর্ত্তী নারায়ণ উপনিষদে একেবারেই তিনি "অম্বিকাপতয়ে উমাপতয়ে পশুপতয়ে নমো নমঃ" স্তুতিলাভ করিয়াছিলেন। [৪৪] শুক্ল যজুর্ব্বেদের রুদ্র ভগিনী অম্বিকা, কেন্ উপনিষদের অগ্নি দর্পহারিণী উমা [৪৫] একেবারে রুদ্র (অথবা শিব) পত্নী

৪১ নিরুক্ত ১০।৭ যাস্ক অন্যত্র রুদ্রকে বজ্রধর মেঘও বলিয়াছেন। নিরুক্ত ১০।১-৫ দ্রষ্টব্য।

৪২ শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।৩।৭।১৯

৪৩ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩।৪-৬

৪৪ নারায়ণ উপনিষদ ২২শ অনুবাক।

৪৫ কেন্ উপনিষদ ৩।১২

অম্বিকা ও উমায় পরিণত হইলেন! এইরূপে রুদ্রের ক্রমশঃ শিবত্ব প্রাপ্তি ঘটিতে ঘটিতে কৈবল্য উপনিষদে আসিয়া রুদ্রের প্রায় কৈবল্যই ঘটিল। শিব—

আধুনিক উপনিষদে রুদ্র—শিব।

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম
* * *

হইয়া বসিলেন। এই সময় পুরাণগুলিও রুদ্রের বৈদিক বিশেষণ-গুলি পল্লবিত করিয়া শিবকে দেব-দেব-মহাদেব বিশেষণে বিশ্লেষিত করিয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে বেষ্টিত নূতন রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলেন।

মহাভারতেও রামায়ণের ন্যায় বহু আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে। মহাভারতে শিবও আছেন, রুদ্রও আছেন। এখানে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে এই মাত্রই বক্তব্য যে মহাভারতে বেদের ৩৩ দেবতা স্বীকৃত হইয়াছে। বেদ, রামায়ণ ও উপনিষদে সেই ৩৩ দেবতার নাম নাই কিন্তু মহাভারতে তাহা আছে।

মহাভারতের তেত্রিশ দেবতা।

মহাভারতে তেত্রিশ দেবতা এইরূপ

দ্বাদশ আদিত্য—অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্বর, ত্বষ্টা, পুষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

একাদশ রুদ্র—অজ, একপদ, অহি, ব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃগণ, ত্র্যম্বক, বৃষকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

অষ্ট বসু—ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

অপর দুইজন—দ্যৌঃ ও পৃথিবী।

ইহার পর পুরাণের কথা। পৌরাণিক যুগে আদিত্য, রুদ্র ও বসু—বৈদিক এই তিন দেব শ্রেণী হইতে তিনজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি লইয়া

পৌরাণিক ত্রিদেবতার আসন কল্পিত হইয়াছিল। অর্থাৎ দ্বাদশ আদিত্যের বিষ্ণু, একাদশ রুদ্রের শম্ভু, অষ্ট বসুর অনল (অগ্নি বা ব্রহ্মা) বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মারূপে পূজিত হইয়াছিলেন।

শিব, কালী এবং কার্ত্তিকেয়ও বোধ হয় এইরূপ আর একটী কল্পনার ফল। বেদে অগ্নি শিখার এই নামগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়—শিব, শর্ব্ব, সর্ব্ব, কুমার, কালী, করালী ইত্যাদি। অগ্নির কালী, করালী নাম কোন কোন উপনিষদেও আছে।[৪৬]

আধ্যাত্মিকতাবাদী পৌরাণিকগণ বোধ হয় এই এককেই শিব, শিবজায়া ও শিবাত্মজে পরিণত করিয়াছিলেন। শিব ও শর্ব্ব নামে শিবকে, কুমার নামে কার্ত্তিকেয়কে ও কালী, করালী নামে শিব-পত্নীকে অভিহিত করিয়াছিলেন।

শিবকথা শেষ করিবার পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের শিব সম্বন্ধীয় মন্তব্য এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে—শিব ব্রাত্য দিগের দেবতা। ব্রাত্য নামে ঋষিদিগের বিপক্ষ এক যাযাবর জাতি ছিল; তাহারা পশু পালন ছাড়া আর কিছু করিত না। ইহাদিগেরই দেবতা মহাদেব। ব্রাত্যেরা ব্রাত্য স্তোম যজ্ঞ করিয়া ঋষি হইতে পারিত। ক্রমে তাহারা ঋষি সমাজে প্রবেশ করায় তাহাদের ব্রাত্য-দেবতা মহাদেবও সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশ।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার এইমত সমর্থন জন্য অথর্ব্ববেদের ১৫শ কাণ্ডের ব্রাত্য সূক্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাত্যসূক্তে ঋক বেদের পুরুষ-সূক্তে এবং যজুর্ব্বেদের শতরুদ্র স্তবে উদ্দিষ্ট একটি বিরাট পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় মূল পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই।

৪৬ মুণ্ডক উপনিষদ ১।২।৪

পাঠকের বুঝিবার ও আলোচনা করিবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া এইস্থলে অথর্ব্ববেদ হইতে মূল পাঠটী উদ্ধৃত করা গেল।

ব্রাত্য আসিদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
সপ্রজাপতিং সুবর্ণমাত্মন্ন পশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ
তদেকমভবৎ তল্ললাম অভবৎ তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্‌ব্রহ্মাভবৎ তৎতপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রজায়ত।
সোঽবর্দ্ধৎ স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎস ঈশানোঽভবৎ।
স একোব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্র ধনু।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।
নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্য প্রোর্ণতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। অথর্ব্ববেদ ১৫।১।১-৮

শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ—"প্রজাপতি দেখিলেন একটা আলো,—একটা 'সু'বর্ণ রহিয়াছে। সে আলো তিনি জ্বালাইয়া দিলেন অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে বাহির করিয়াদিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্মা হইল, সে তপ হইল, সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে 'মহাদেব' হইল, সে দেবগণের কর্ত্তৃত্ব পাইল, সে ঈশান হইল, সে একব্রাত্য হইল। অর্থাৎ ব্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ব্রাত্যগণ যেন সব এক হইয়া দেবতারূপে আবির্ভূত হইল। ইন্দ্র ধনু উহার ধনু হইল, কারণ ইন্দ্র ধনুর ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধনুর উদর নীল, পৃষ্ঠ লোহিত। নীল অংশের দ্বারা উহারা শত্রুদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের দ্বারা শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে।"

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "এই দেবতাই আমাদের শিব। তিনি মহাদেব ; তিনিই ঈশান।[৪৭]

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণে এই মতের কতকটা সমর্থন আছে।

আর একটী প্রচলিত মত এই যে—শিব অনার্য্যদিগের দেবতা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে ৩৩ জন অসোমপ দেবতার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাও বোধহয় অনার্য্যদিগের দেবতা। ক্রমে আর্য্য অনার্য্যে সম্মিলিত হওয়ায় অনার্য্যদের দেবতা যে আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়া পূজা গ্রহণ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন তাহা অনুমান করা যায়। শিবের ভূত-প্রেত, সবর, কুচনী সংশ্রব হইতেও এইরূপ কল্পনা আসিতে পারে ; এইরূপ অনুমানের মূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণও বিদ্যমান আছে। দক্ষযজ্ঞ পালাটী তাহার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৪৮] শিব এখানে আর্য্য দেব সমাজে অপংক্তেয়, সুতরাং অনিমন্ত্রিত। এরূপ স্থলে পাঠকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে না কি যে শিব জামাতা হইয়াও দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইতে পারিলেন না কেন? ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও শিব অন্য সমাজের আগন্তুক দেবতা বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে উপেক্ষায় প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটী করিতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নিকট। ব্রহ্মা

শিব কি অনার্য্য দেবতা।

---

৪৭ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২৮

৪৮ দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বেদে না থাকিলেও রুদ্র যে এক সময় যজ্ঞভাগ পাইতেন না এবং পরে ক্ষমতা দেখাইয়া যজ্ঞে অগ্নিরূপে স্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার আভাস আছে। বেদের এই ইঙ্গিত হইতে এবং ঋকবেদের ৩।২৭।৯ ও ১১ ঋকের "দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন" এইরূপ ভাব হইতেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী কল্পিত হইয়াছিল। সায়নাচার্য্য দক্ষের তনয়া অর্থে যজ্ঞবেদী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [রমেশ বাবুর ঋক বেদ দ্রষ্টব্য]

বলিতেছেন এই শঙ্কর নামক আগন্তুক আমাদের অপেক্ষা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ?[৪৯]

লিঙ্গপূজার উল্লেখ রামায়ণে নাই। প্রক্ষিপ্তভাবেও তাহা রামায়ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সম্বন্ধে রামায়ণ নির্দ্দোষ হইলেও তাহার অদৃষ্টের দোষ অখণ্ডনীয়। তাই হুইলার সাহেব আর্ষ রামায়ণে লিঙ্গপূজার উল্লেখ না পাইয়া অধ্যাত্মরামায়ণের আশ্রয় লইয়াই আর্ষ রামায়ণের বিচার করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন—রাম বৌদ্ধদিগকে দাক্ষিণাত্য হইতে তাড়াইবার জন্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত শৈব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং ভারতের শেষ সীমা সেতুবন্ধে রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফলে বৌদ্ধেরা লঙ্কাদ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল।[৫০]

লিঙ্গ পূজা—
বৈদেশিক মত।

"ত্রেতাবতার রামচন্দ্র" নামক একখানা গ্রন্থেও নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সেতুমারভ্যমানস্ত তত্র রামেশ্বরম্ শিবম্।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামোলোক হিতায় চ॥

শ্লোকটী কোথা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহার আভাস দেন নাই। এইরূপ জনশ্রুতি হইতে এবং অধ্যাত্মরামায়ণের উক্তি হইতে কৃত্তিবাসপণ্ডিতও লিখিয়াছেন—

জাঙ্গাল উপরে শিব স্থাপিলেন রাম।
তেকারণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর নাম॥

৪৯ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ২৫শ অধ্যায়।

৫০ Wheeler's Ramayana Pages 233, 234, 353, 417, and 457.

অধ্যাত্মরামায়ণ খ্রীষ্টোত্তর যুগের কোন এক সময়ের লেখা। লিঙ্গপূজা ভারতে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং হুইলারের মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত অধ্যাত্মরামায়ণ সম্বন্ধে প্রয়োজ্য হইতে পারে; মূল বাল্মীকি রামায়ণ সম্বন্ধে নহে।

যাহা হউক, যখন অধ্যাত্মরামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া ভুল সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে এবং মূল রামায়ণেও এইরূপ কলুষ ভাব প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে তখন আমরা লিঙ্গপূজার ইতিহাস আলোচনায় বিরত থাকিতে পারিলাম না।

রুদ্র শিবরূপে সমাজে পূজিত হইতে আরম্ভ করিলে ভারতবর্ষে শৈব ধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে বাড়িতে থাকে। এই সময় ভারতীয় সমাজে বুদ্ধ মুর্ত্তির পূজা হইত। বুদ্ধের মুর্ত্তির পূজা দেখিয়া শৈব সম্প্রদায়ও শিবের মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। ইহা খৃঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর কথা। এই সময় শিবের মুর্ত্তি গড়িয়াই পূজা হইত। তান্ত্রিক যোনীপূজা তখনও ভারতীয় আর্য্য সমাজের চিন্তার ধারায় প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই সময় আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ও এসিয়ার পশ্চিম উপকূলে—আসিরিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রবলভাবে লিঙ্গপূজা ও যোনীপূজা চলিতেছিল।

লিঙ্গ পূজার ইতিহাস।

ইয়ুরোপীয় লেখকগণ যে লিঙ্গপূজা ও যোনীপূজার জন্য ভারতীয় সমাজের চিন্তার প্রতি ইঙ্গিত করেন, পাঠক দেখিবেন—সেই ইঙ্গিতের মূল কোথায়? লিঙ্গ ও যোনীপূজার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া ডাঃ টালমে লিখিয়াছেন—আফ্রিকার অধিবাসীরা অতি প্রাচীনকালে

আফ্রিকায় লিঙ্গপূজা।

লিঙ্গপূজা ও যোনীপূজা করিত। যে জগৎপ্রসিদ্ধ পিরামিডগুলি মিসরীয় সভ্যতার নিদান বলিয়া আজ লোক সমক্ষে গর্ব্বের সহিত দণ্ডায়মান, তাহা একদিন যোনীপূজার প্রতীকরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথাকার মঠ, মন্দির, মনুমেণ্টগুলিও পূর্ব্বে লিঙ্গের আকারে প্রস্তুত হইত এবং লিঙ্গরূপে পূজিত হইত।

আফ্রিকা হইতে লিঙ্গপূজা ইয়ুরোপ ও এসিয়ায় বিস্তৃত হয়। যে খৃষ্টধর্ম্ম আজ জগৎকে শ্লীলতা শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতেছেন বলিয়া গর্ব্বিত ভাবে প্রচার করিতেছেন—"Under the influence of Christianity, higher ideas of morality are now gradually being diffused." ৫১ সেই খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্র ক্রুশটী নাকি লিঙ্গপূজার প্রতীক রূপেই কল্পিত হইয়াছিল। কোন কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মন্দিরে সেই প্রতীক-চিত্র নাকি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাবিলোনে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল—হিরোডোটাসের লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমের প্রাচীন মুদ্রায় লিঙ্গ মুদ্রিত থাকিত। এতদ্ব্যতীত বাইবেলের প্রাচীন পুস্তকে (Old Testament) মনুষ্যের লিঙ্গ এবং যোনীপূজার কথাও আছে।৫২

খ্রীষ্টানের ক্রুশ ও লিঙ্গ পূজা।

---

৫১ Ramayana Published by. C T. S. Page 139.

৫২ আমরা উপরে যে কথাগুলি বলিলাম, পাঠক, ডাঃ টালমের লেখা হইতে তাহার প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। বৈদেশিকেরা বিনা প্রমাণে একটা জাতির অযথা নিন্দা প্রচার করিয়াছেন; সেই নিন্দার প্রতিবাদ করিতে যাইয়াই এত কথা বলিতে হইল। ডাঃ টাল্‌মে লিখিয়াছেন—

"In the remotest antiquity the worship of the generative principle was the only religion men

আফ্রিকা ও ইয়ুরোপে জনন যন্ত্রের পূজা প্রচলিত ছিল ; কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে তাহা ছিল না। ভারতে আরাধ্য দেবতার প্রতীক রূপে যন্ত্রের বা চিহ্নের পূজা প্রচলিত হইয়াছিল তান্ত্রিক যুগে। যন্ত্র পূজার এই বাতাস পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে যন্ত্র পূজার উল্লেখ নাই। উপনিষদগুলির

উপনিষদের আভাস।

---

knew……Hindus, Cheldians, Hebrews, Egyptians, Greeks, Romans, Gauls, Tutons, Britons, & Scandinavians all shared in phallicism & Yonism. The study of sexual activities & generation was the basis of ancient Hindu theology. (Sex Worship).

…… records of phallicism can still be found in the Old Testament. Instead of invoking the deity in taking a solemn oath, Abraham orders his servant to place his hand upon his phallus, because phallus was still kept in its former high veneration. The slain enemy was, for this reason, deprived of his phallus. David bought Saul's daughter with a trophy of two hundred phalli, taken from the slain Philistines. (Phallicism).

The Yone worshiper of the Old Testament had the temples of their feminine deity on high hills. (কামাখ্যা পাহাড়ের ন্যায়।) The obelisk, piller, column, alter, mount & cave all have their origin in the pristine symbolism of yonic worship. ……In Ireland

মধ্যে প্রাচীন উপনিষদ বৃহদারণ্যকের "স্ত্রীয়মধ উপাসীত" ইত্যাদি[৫৩] ও অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী শ্বেতাশ্বর উপনিষদের "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো[৫৪]—মহেশ্বর ঈশান সম্বন্ধীয় এইরূপ ইঙ্গিতের অপব্যাখ্যা হইতেই বোধহয় তান্ত্রিক যুগ্ম-পূজার কল্পনা এদেশে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

---

the female sexual organs seem to have been the symbol of sexworship most in use. Even in the arches over the door ways of christian churches a female figure * * (ভাষা উদ্ধৃত করিবার মত নহে)

Even the Cross the sacred symbol of Christianity had its origin in sexworship.......The symbol of the Cross has been identified with the earliest records of sexworship ...... The pyramids of Egypt served later on as graves for the kings, but originally they were erected in honour of the femenine creative deity.

Dr Talmey's Women.—Yonic Symbolism.

পাঠক দেখিবেন—মানুষ মরিলে তাহাদের পুংচিহ্নগুলি সংগৃহীত হইয়া বিক্রীত হইত এবং তাহা ক্রয় করিয়া নিয়া মানুষ গৃহদেবতারূপে পূজা করিত।

আমরা যেমন গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, ও সাক্ষ্য দেই, বাইবেলে সেই প্রকার পুংযন্ত্র স্পর্শ করিয়া সপথ করিবার রীতি ছিল।

ইংরেজী ভাষায় ও বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত আধুনিক বাইবেলগুলিতে কিন্তু ডাঃ টালমের উদ্ধৃত পাঠ খুব স্পষ্টাক্ষরে অনুভূত হয় না। [বাইবেল আদি পুস্তক ২৪। ২ ও শামুয়েল [২] ৩। ১৪ দ্রষ্টব্য।] আধুনিক রুচির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে রামায়ণ মহাভারত এবং ইলিয়ড ওডেসির ন্যায় বাইবেলেরও পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

৫৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬। ৪। ২

৫৪ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।১১

নারায়ণ উপনিষদে লিঙ্গপূজার ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[৫৫] এই উপনিষদখানা যে একখানা আধুনিক তান্ত্রিক উপনিষদ এ সন্দেহও পণ্ডিত সমাজ করিয়া থাকেন।

বামন পুরাণে লিঙ্গপূজার ইতিহাস আছে। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আপস্তম্ব নামক ঋষিই লিঙ্গ উপাসনার প্রবর্ত্তক। আপস্তম্বের শিষ্য বক নামক বণিক রাজা এই পূজা তাঁহার স্বদেশে প্রচার করেন। সেখান হইতে তাহা পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হয়। বণিক বক রাজাকে কেহ ক্রিট দ্বীপবাসী, কেহবা ফিনিসীয় বণিক বলিয়া অনুমান করেন। ক্রিট এবং ফিনিসীয়া এই উভয় স্থানেই প্রাচীনকালে যন্ত্রপূজা প্রচলিত ছিল। নূতন বাইবেল-ধর্ম্ম (New Testament) প্রচারের পর খৃষ্ট-ধর্ম্মপ্রচারকগণের চক্ষে এই পৌত্তলিক ভাব অসহ্য বোধ হওয়ায় তাঁহারা ইয়ুরোপ হইতে তাহা প্রবল শক্তি প্রয়োগে তাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বামন পুরাণ।

পশ্চিম এসিয়ার বাণিজ্য সংশ্রবে অথবা আপস্তম্বের শিষ্য সংশ্রবে এই পূজা-রীতি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং শৈবগণ ইহা সহজ প্রথারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতে শিব-যন্ত্র-চিহ্নেরই পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বাইবেলে কথিত মানব-যন্ত্র-চিহ্নের নহে। এই অনুমানের মূল্য বিচার পাঠক করিবেন। যোনীপূজা ভারতে ইহারও অনেক পরে প্রচলিত হইয়াছিল। ডাঃ টালমে কিন্তু হিন্দুদিগকেই এই পূজার আদিম প্রচারক মনে করেন। তিনি শিব-যন্ত্র-চিহ্নের কথা বলেন না; পুংচিহ্ন এবং স্ত্রীচিহ্ন মাত্রেরই পূজার কথা বলেন। প্রাক্ বৈদিক যুগে অর্থাৎ আদিম যুগে ভূমণ্ডলের সমগ্র সমাজেই—জননেন্দ্রিয়ের

ভারতে লিঙ্গপূজা প্রচলনের সময়।

৫৫ নারায়ণ উপনিষদ ১৬শ অনুবাক।

পূজা প্রচলিত ছিল বহু লেখকের গ্রন্থেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।[৫৬]

মূর্ত্তিপূজা।

প্রাচীন ভারতে দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। বেদে মূর্ত্তিপূজার কোন উল্লেখ নাই, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদ সমূহেও মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ নাই। রামায়ণেরও কোন স্থলে তাহার উল্লেখ নাই। কোন কোন পুরাণ গ্রন্থে ও চণ্ডীতে রাবণ বধের পূর্ব্বে রাম লঙ্কায় ভগবতী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। অনেক বঙ্গীয় পাঠক এই জন্য আর্ষ রামায়ণকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই বিশ্বাস ভ্রমপূর্ণ।

ভারতে মূর্ত্তিপূজা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত হয় নাই। বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা আরম্ভ হইতে থাকিলে হিন্দু সমাজেও মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হয়। অতঃপর এই দুই ধর্ম্মের সম্মিলন ঘটিলে বুদ্ধদেব হিন্দুর দশঅবতারের অন্যতম অবতার বলিয়া পরিগৃহীত হন এবং হিন্দু দেবমূর্ত্তিরও কোন কোন মূর্ত্তি বুদ্ধের মূর্ত্তির পার্শ্বে রাখিয়া পূজা করিবার ব্যবস্থা হয়।

ললিত বিস্তারে মূর্ত্তি কথা।

বুদ্ধের জীবনী-গ্রন্থ ললিতবিস্তারে গণেশ, শিব, স্কন্দ প্রভৃতির মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। ললিতবিস্তার খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে—বুদ্ধ নিজে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহা সত্য হইলেও দেবমূর্ত্তিকে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলা যাইতে পারে না। ভৃগু সংগৃহীত আধুনিক মনুসংহিতায় দেব মূর্ত্তির পূজার কথা থাকিলেও

৫৬ Campbell's Phallic Worship ও Howard's Sex Worship দ্রষ্টব্য।

তাহাতে কেবল ব্রাহ্মণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই করা হইয়াছে।[৫৭]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রামের ভগবতী অর্চ্চনার উল্লেখ স্থলে দেখা যায়—আশ্বিন মাসে আর্দ্রা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা নবমী তিথিতে বোধন আরম্ভ হইয়া রাবণ বধ পর্য্যন্ত পূজা চলিয়াছিল। শুক্ল নবমীতে রাবণ নিহত হন; পরদিন বিজয়া দশমীর বিজয় উৎসব হয়।[৫৮]

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ভগবতী আরাধনা।

এই উক্তি আর্ষ রামায়ণের বিরোধী। আর্ষ রামায়ণে বসন্তকালে রাবণ বধ হইয়াছিল বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবীভাগবতে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ ও রামায়ণ—উভয় উক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সময় সমর্থিত হইয়াছে। দেবী ভাগবতের উক্তি এইরূপ—সীতার শোকে রাম যখন মুহ্যমান তখন নারদ আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন—আপনি এই আশ্বিন মাসে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ নবরাত্র ব্রত করুন। এই ভগবতী অর্চ্চনায় আপনার কামনা সিদ্ধ হইবে, আপনি রাবণ বধে সমর্থ হইবেন। নারদের এই উপদেশে রাম আশ্বিন মাসে মূর্ত্তি গড়িয়া অম্বিকার পূজা করেন। মহাষ্টমীর নিশীথকালে দেবী রামকে দর্শন দিয়া বলেন যে—আগামী বসন্তকালে তুমি লঙ্কায় আমাকে আহ্বান করিও, পাপমতি দশাননকে সংহার করিতে পারিবে।[৫৯]

দেবীভাগবতে দেবী পূজা।

বলা বাহুল্য—বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই উভয় গ্রন্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়াই বঙ্গীয় পাঠককে সমস্যার ভিতর ফেলিয়াছেন।

মূর্ত্তিপূজার যুগে রামায়ণ রচিত হইলে আমরা আর্ষ রামায়ণে তাহার আভাস অবশ্যই পাইতাম। পুরাণে যে স্থলে রামের দুর্গাপূজার

৫৭ মনুসংহিতা ৩।১৫২

৫৮ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড

৫৯ দেবীভাগবত—তৃতীয় স্কন্ধ।

উল্লেখ করা হইয়াছে রামায়ণে সেইস্থলে আদিত্য-হৃদয় স্তবের উল্লেখ রহিয়াছে—সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দুর্গার উৎপত্তি।

'দুর্গা' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস এ স্থলে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

দুর্গার নাম রামায়ণের কোন স্থানেই নাই। আদিকাণ্ডের ৩৫শ ও ৩৬শ সর্গে উমা ও রুদ্রের কথা আছে। এই উমা-রুদ্র-কথাকে প্রক্ষিপ্ত রচনা অধ্যায়ে (১০২ পৃষ্ঠা) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

উমার নাম ঋকবেদে নাই। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকের "রাত্রি পরিশিষ্টে" যে একটী স্তব আছে, তাহাতে "দুর্গা" শব্দ আছে। ঐ দুর্গা শব্দ দ্বারা ভগবতী মহেশ্বরী দুর্গা বা উমাকে বুঝায় নাই; রাত্রিকেই বুঝাইয়াছে। দেবী, ভগবতী প্রভৃতি শব্দগুলিও তাহাতে বিশেষণ রূপে সংযুক্ত হইয়াছে। স্তোত্রটী দীর্ঘ হইলেও পাঠকগণের কুতূহল নিবারণার্থ প্রাচীন বঙ্গদর্শন (১২৮০) হইতে তাহা বঙ্গানুবাদ সহ এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

ঋকবেদে দুর্গা স্তোত্র।

আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ত্ততে তমঃ ॥১॥
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতির্ন ব।
অশীতিঃ সন্ত্বষ্টা উতোতে সপ্ত সপ্ততীঃ ॥২॥
রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং ॥৩॥
সম্বেশনীং সম্যমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীম্
প্রপন্নোহং শিবাং রাত্রিং
ভদ্রে পারং অশীমহি ভদ্রে পারং অশীমহি ওঁ নমঃ ॥৪॥

স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্ব্‌চপ্রিয়াং
সহস্র সমিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্‌ ॥৫ ॥
শান্ত্যর্থং তদ্দ্বিজাতীনামৃষিভিঃ সোমপাশ্রিতাঃ।
(সমুপাশ্রিতাঃ ?)
ঋকবেদে ত্বং সমুৎপন্নারাতীয়তোনিদহাতি বেদঃ ॥৬॥
যে ত্বাং দেবি প্রপদ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ হব্য বাহিনীং।
অবিদ্যা বহুবিদ্যা বা স নঃ পর্ষদতি দুর্গানিবিশ্বাঃ ॥৭ ॥
অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে দ্বিজাঃ।
তান্‌ তারয়তি দুর্গানি নাবেব সিন্ধুং দুরি তাত্যগ্নিঃ ॥৮ ॥
দুর্গেষু বিষমে ঘোরে সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে।
অগ্নিচোরনিপাতেষু দুষ্ট গ্রহ নিবারণে ॥৯ ॥
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষু চ।
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ং কুরু
তেষাং মে অভয়ং কুরু ওঁ নমঃ ॥১০ ॥
কেশিনীং সর্ব্বভূতানাং পঞ্চমীতি চ নাম চ।
সা মাং সমা নিশা দেবী সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু
সর্ব্বতঃ পরিরক্ষতু ওঁ নমঃ ॥১১ ॥
তামগ্নিবর্ণাস্তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্‌।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥১২ ॥
দুর্গা দুর্গেষু স্থানেষু সন্নোদেবীরভীষ্টয়ে।
য ইমং দুর্গাস্তবং পুণ্যং রাত্রৌ রাত্রৌ সদা পঠেৎ।
রাত্রিঃ কুশিকঃ সৌভরো রাত্রিস্তবো
গায়ত্রী রাত্রিসুক্তং জপেন্নিত্যং তৎকালমুপপদ্যতে ॥১৩ ॥

অর্থ—"হে রাত্রি! পার্থিব রজঃ তোমার পিতার কিরণে পরিপূর্ণ

হইয়াছিল। হে বৃহতি! তুমি দিব্যালয়ে থাক, অতএব তমঃ বর্জ্জে। যে নরকদর্শকেরা তোমাতে যুক্ত তাহারা নবনবতি বা অষ্টাশীতি বা সপ্তসপ্ততি হউক (অর্থ কি ?) সর্ব্বভূত নিবেশনী, জননী, ভদ্রা, ভগবতী, কৃষ্ণা, এবং বিশ্বজেগতর নিশাস্বরূপ রাত্রিকে প্রাপ্ত হই। সকলের প্রবেশকারিণী শাসনকর্ত্রী (?) গ্রহ নক্ষত্র মালিনী, মঙ্গলযুক্তা রাত্রিকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; হে ভদ্রে! আমরা যেন পারে যাই, আমরা যেন পারে যাই, ওঁ নমঃ। দেবী, শরণ্যা, বহ্বৃচাপ্রিয়া, সহস্রতুল্যা দুর্গাকে আমি যত্নে তুষ্ট করি। আমরা জাতবেদাকে (অগ্নি) সোমদান করি। দ্বিজাতিগণের শাস্ত্যর্থ তুমি ঋষিদিগের আশ্রয়। (?) ঋগ্বেদে তুমি সমুৎপন্ন, অগ্নি অরাতিদিগের দহন করেন (?) দেবি! যে ব্রাহ্মণেরা, অবিদ্যা হউন বা বহুবিদ্যা হউন, তোমার কাছে আসেন, তিনি (?) আমাদের সকল বিপদে ত্রাণ করিবেন। যে ব্রাহ্মণেরা অগ্নিবর্ণা শুভা, সৌম্যাকে কীর্ত্তিত করিবে সমুদ্রে নৌকার ন্যায় অগ্নি তাহাদিগকে বিপদ হইতে পার করিবেন। বিপদে ঘোর বিষম সংগ্রামে, সঙ্কটে বিষম বিপদে, সংগ্রামে, বনে, অগ্নিনিপাতে, চোরনিপাতে, দুষ্টগ্রহ নিবারণে, তোমার কাছে আসে, এ সকল হইতে আমাকে অভয় কর! ওঁ নমঃ। যিনি সর্ব্বভূতের কেশিনী, পঞ্চমীনাম যাঁর, সেই দেবী প্রতিরাত্রে সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন! সকল হইতে পরিরক্ষণ করুন্! ওঁ নমঃ। অগ্নিবর্ণা তপের দ্বারা জ্বালা বিশিষ্টা, বৈরোচনী, কর্ম্মফলে জুষ্টা, দুর্গাদেবীর শরণাগত হই, হে সুবেগবতি! তোমার বেগকে নমস্কার। দুর্গাদেবী বিপদ স্থলে আমাদের মঙ্গলার্থ হউন। এই পবিত্র দুর্গাস্তব যে রাত্রেং সদা পাঠ করিবে—রাত্রি, কুশিক, সৌভর, রাত্রিস্তব, গায়ত্রী, যে রাত্রিসুক্ত নিত্য জপ করে সে তৎকাল প্রাপ্ত হয়।"

এই স্তোত্র আমাদের অসুরমর্দ্দিনী ভগবতী দুর্গার নহে।

ঋকবেদের নানা স্থানে ভবানী, রুদ্রানী প্রভৃতি শব্দও আছে। সেগুলি দ্বারাও দশভুজা দুর্গাকে নির্দ্দেশ করে নাই।

ঋকবেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তকে দেবী সূক্ত বলা হইয়া থাকে। উহাতে মহামহিমাময়ী এক দেবীর উল্লেখ আছে; কিন্তু দুর্গা, ভগবতী, উমা ইত্যাদি নির্দ্দেশক কোন শব্দ বা নাম নাই।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় যে রুদ্রের ভগিনী অম্বিকার উল্লেখ আছে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদে দুর্গা স্তোত্র।

(৩৫২ পৃষ্ঠা) যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গী, কাত্যায়নী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরণ্যকে ইনি অগ্নির কন্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। [৬০] নারায়ণ উপনিষদে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মন্ত্রই উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—

কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্য কুমারী ধীমহি।

তন্নোদুর্গীঃ [৬১] প্রচোদয়াৎ। ৩৪—১ম অনুবাক।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ব্যতীত আর কোন সংহিতায় বা ব্রাহ্মণে দুর্গার কথা নাই। নারায়ণ উপনিসদ কৈবাল্য উপনিষদ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদগুলি ব্যতীত প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে কেন উপনিষদে উমা-হৈমবতীর নাম এবং মুণ্ডক উপনিষদে কালী করালীর নামের উল্লেখ আছে। সায়নাচার্য্য

উপনিষদের কথা।

৬০ তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২য় অনুবাদ। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এক স্থলে ইনি রুদ্রের স্ত্রী বলিয়াও উক্ত হইয়াছেন। ভগিনী বিবাহের প্রথা যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ১৪৫ পৃষ্ঠা সেই রীতি অনুকরণেই কি শুক্ল যজুর্ব্বেদে উক্ত রুদ্রভগিনী অম্বিকা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের আরণ্যকে রুদ্র পত্নী অম্বিকায় পরিণত হইলেন। ৬১ এস্থলে দুর্গী "শব্দ পুংলিঙ্গ হওয়ায় সায়নাচার্য্য তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—লিঙ্গাদি ব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছন্দসো দ্রষ্টব্যঃ।"

কেনউপনিষদের উমা হৈমবতীকে "ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কালী করালী অগ্নির সপ্ত জিহ্বার দুইটী জিহ্বার নাম। ইঁহাদের কেহই শিবজায়া দুর্গা বা কালী বলিয়া উক্ত হন নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক স্থানে দুর্গে শব্দ আছে তাহার অর্থ "দুর্গে—বিষমেচ" করা হইয়াছে। ৬২

সূত্রযুগে দেবী কথা।

সূত্র যুগে সূত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে দেবী-প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে ভদ্রকালীর উল্লেখ আছে। ৬৩ হিরণ্য কেশীন্ গৃহ্য সূত্রে ভবশত্নীর যজ্ঞাহুতির ব্যবস্থা আছে। ৬৪

মহাভারতে দুর্গা স্তোত্র।

মহাভারতের বহু পরবর্ত্তী স্তরের রচনায় দুর্গা, অসুরনাশিনী, হৈমবতী, পার্ব্বতী ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে অর্জ্জুন কর্তৃক দুর্গাস্তবে কেনউপনিষদের অনুসরণে—

"তং ব্রহ্মবিস্তা বিদ্যাদাং মহানিদ্রাচ দেহিনাং" রূপে স্তুত হইলেনও স্তোত্রের নানাস্থানে রামায়ণের আদিত্য হৃদয় স্তোত্রের ন্যায় বহু সন্দেহ জনক রচনা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ৬৫

---

(৬২) বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৬।১।৩ (৬৩) সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূঃ ২।১৪।১৪

(৬৪) হিঃ কেশীন গৃঃ সূঃ ২।৩।৮৭ এস্থলে রুদ্র, ভদ্র, শর্ব্ব, ঈশান, পশুপতি, উগ্র, ভীম, প্রভৃতি দেবতার পত্নীদিগকে পৃথক পৃথক যজ্ঞভাগ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা হইতে এইরূপ বুঝিবারও অবকাশ আছে যে হিরণ্যকেসিনের সূত্রকারও ইহাদিগকে এক শিব দেবতা বা মহাদেব বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারেন।

৬৫। ভীষ্মপর্ব্বের ২২ অধ্যায়ে অর্জ্জুন যে দুর্গাস্তব পাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি দুর্গাকে নন্দ গোপ কুলোদ্ভবে, গোপেন্দ্র কন্তে "ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এই সকল নামে পরবর্ত্তী সাময়িক সংস্কারের প্রভাব স্পষ্ঠ বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। বিরাট পর্ব্বে দুর্গাস্তবেও একই রূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

এইরূপে বৈদিক রাত্রি দেবী ক্রমে ব্রহ্ম বিদ্যায় পরিণত হইয়া দেহীদিগের মহানিদ্রায় ও মহামায়ায় পরিণত হইয়াছিলেন। অতঃপর পৌরাণিক যুগে মহামহিমাময়ী সর্ব্বশক্তির আধার "সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী" বলিয়া স্তুতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পূজার ইতিহাসও পুরাণ সমূহে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহাই ভগবতী শক্তির ক্রম বিকাশের ইতিহাস।

পূজা-স্বস্ত্যয়ন-মানসিক।

রামায়ণে পূজা, স্বস্ত্যয়ন ও মানসিকের কথা আছে। প্রকৃতির চিন্তনীয় পদার্থ সমূহের প্রতি প্রীতি হইতেই—দেবভাব হইতেই, এই অনুষ্ঠান সমূহের উৎপত্তি। এই পূজা ও প্রার্থনা উপাসনা ব্যতীত আর কিছু নহে। পূজা স্বস্ত্যয়ন তখন পুরোহিত ব্যতীতই চলিত। রাম কৌশল্যা প্রভৃতি নিজেই পূজা ও স্বস্ত্যয়ন করিতেন, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। সীতা গঙ্গা ও যমুনা নদী পার হইবার সময় কায়মনে গঙ্গা ও যমুনাকে প্রণাম করিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। সীতা মানসিক করিয়া—হে গঙ্গে, হে যমুনে, যদি আমরা মঙ্গল মতে ফিরিয়া আসিতে পারি, তবে সহস্র গো সহস্র কলস সুরা ও বিবিধ বস্তু দ্বারা আপনাদিগের পূজা দিব। (১) তখন মূর্ত্তি পূজা না থাকিলেও দেবালয় ছিল। দেবোদ্দেশে সেস্থানে পূজা হইত। বিবাহের পর বধূদিগকে লইয়া গিয়া এই সকল দেবালয়কেই প্রণাম করান হইয়াছিল। মহর্ষি এক স্থলে বানর পত্নী তারাকে দিয়াও বেদ মন্ত্র উচ্চারণ ও স্বস্ত্যয়ন করাইয়াছেন। বালীর স্ত্রী তারা বালীর জয় শ্রী লাভের জন্য নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। (২)

সন্ধ্যা উপাসনা কথারও রামায়ণে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

[১] অযোধ্যাকাণ্ড ৫২ ও ৫৫ সর্গ।

[২] কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৬ সর্গ।

হনুমান অশোক বনে যাইয়া তথাকার স্রোতস্বতী তীরে বসিয়া জানকীর সাক্ষাৎ আশায় ভাবিতেছেন—

সন্ধ্যাকাল মনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।

নদীঞ্চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী॥ ৪৯।৫।১৪

অর্থ—প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, হয়ত জানকী সন্ধ্যা করিতেও নদীর ঘাটে আসিতে পারেন।

এভাবটী খুব আধুনিক।

মন্ত্র দান এবং মন্ত্র গ্রহণ প্রথাও অনেক পরবর্ত্তী।

রামায়ণে কোন কোন স্থানে তীর্থের নাম আছে। কিন্তু তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা ও তীর্থ-ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গ লাভের বা পুণ্য লাভের কথা রামায়ণে নাই। এত প্রাচীন কালে সমাজে তীর্থ যাত্রার ভাব জাগ্রত ছিল না।

তীর্থ ও তীর্থপুণ্য।

রামেশ্বর তীর্থ স্থাপনের কথা (৩) আধুনিক চিন্তার ফলে রামায়ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। গয়া তীর্থ (৪) সম্বন্ধীয় কথাও সেইরূপ। "চাল্লিশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' ইহাতে আরণ্যকের ভাব আছে; তীর্থ বাস লিপ্সা ও তীর্থ ভ্রমণ লিপ্সা তাহা অপেক্ষা আধুনিক। রাজা দশরথের বৃদ্ধাবস্থায় রামের যৌবরাজ্যভিষেক কামনাতে তাহার মুখ দিয়া এমন কোন কথা বাহির হয় নাই যে আমি এখন বৃদ্ধ—ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা, তীর্থ বাস দ্বারা বা অরণ্যবাস দ্বারা শেষ জীবন কর্ত্তন করিব। সে কালে এ সকল চিন্তা সমাজ চিন্তার অন্তর্গত ছিল না। দশরথ তৎকালীন সমাজ চিন্তার ধারায় বলিয়াছিলেন

''জীর্ণ স্যাস্ত শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে॥ ৮

রাজ প্রভাবজুষ্টাঞ্চ দুর্ব্বহাম জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।

---

[৩] লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ। ২০। ২১। শ্লোক।

[৪] অযোধ্যা ১০৭। ১৩ শ্লোক।

পরিশ্রান্তোহস্মি লোকস্য গুর্ব্বীং ধর্ম্মধূরং বহন্॥ ৯
সোহহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে।

অর্থাৎ—আমার বয়স হেতু এখন আমি জীর্ণ দেহকে বিশ্রাম দিতে চাই। পরবর্ত্তী আরণ্যক ব্রাহ্মণে অরণ্যে গমনের ভাবও মহাভারতের যুগে তীর্থ—পুণ্য ভাব সমাজে জাগ্রত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের সময় কাশী বারাণসী নাম ধারণ করিয়া খুব জাগ্রত স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণের কাশী কোশলের ন্যায় একটী প্রদেশ মাত্র।

—*—

পঞ্চম অধ্যায়।

আহার্য্য ও আহার।

রামায়ণে খাদ্য সামগ্রী স্বরূপ নিম্নলিখিত বস্তুগুলির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—পলান্ন, মোদক, অন্ন, মিষ্টান্ন, মহামূল্য পানীয়, খাণ্ডব (একপ্রকার মোদক) পায়স, দধিকুল্যা বা বিকুর্চ্চিকা, গৌড়ীমদ্য (গুড় দ্বারা প্রস্তুত মদ) আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস, নীবার ধান্যের অন্ন, তক্র, রসাল, মৌরেয় মদ্য, উৎকৃষ্ট সুরা, ইক্ষুরস, ভক্ষ্য, ভোজ্য চোষ্য, লেহ্য, প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন; ইক্ষু, মধু, লাজ, ভদ্রক, মাদকদ্রব্য, ছাগ, মেষ ও বরাহের মাংস, ব্যঞ্জন, ফল নির্য্যাস, সুগন্ধি সূপ, বৃক্ষরস, দধি, শ্বেতদধি, শুভ্রঅন্ন, মৃগমাংস, ময়ূর মাংস, কুক্কুট মাংস, দুগ্ধ, শর্করা, সিদ্ধ উত্তম বন্য অন্ন, রুরু ও গোধার মাংস, ঘৃত, চক্রতুণ্ড ও পুষ্ট মৎস্য, রোহিৎ ও নল মৎস, ঘৃতপিণ্ডাকার পক্ষীমাংস সৌবিরক মদ্য, লবণাম্ল মিশ্রিত সূপ, স্বাদু অবলেহ, শূলপক্ক মৃগমাংস, লবণ, বাধ্রীনস গণ্ডার মাংস, নানারূপ কৃকলাস, শশক ও ছাগ, ও সুপক্ক একশাল্য মৎস্য, মহিষ মাংস, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন চূর্ণ (আরক ?) গন্ধ দ্রব্যে সুবাসিত সুরা, স্বাদু মদ্য, মধুর মদ্য ইত্যাদি।

খাদ্য সামগ্রী।

এই সকল খাদ্য দ্রব্যের সমস্তই আর্য্য সমাজের খাদ্য ও পানীয় বলিয়া কথিত হয় নাই। ইহার কতগুলির নাম রাক্ষসদিগের ভোজনাগার হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। শূল-পক্কমৃগমাংস গণ্ডারের মাংস, কৃকলাস,

শশক, একশাল্য মৎস্য, মহিষ মাংস প্রভৃতি লঙ্কার ভোজনাগারের দৃশ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। মদ্যের উল্লেখ সর্ব্বত্রই আছে।

সাধারণ খাদ্য।

রামায়ণে অন্ন শব্দের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অন্ন বলিতে কেবল তণ্ডুল সিদ্ধ ভাতই যে বুঝায়, তাহা নহে। প্রধান খাদ্য বস্তু মাত্রকেই অন্ন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। অন্ন শব্দে যব, গম, মিঠাই, প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে অযোধ্যাবাসীরা সেকালে কি প্রকার অন্নে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার বিচার আবশ্যক।

আর্য্য সমাজের খাদ্য।

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজধানী অযোধ্যাকে "প্রভূত ধন ধান্যবান্" ও "শালিতণ্ডুল সম্পূর্ণ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ধান্য ও তণ্ডুল।

এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা সাধারণতঃ এই স্পষ্ট অর্থই ব্যক্ত হয় যে অযোধ্যায় ধন, ধান্য, ও শালি তণ্ডুল যথেষ্ট ছিল এবং এইগুলি জীবন রক্ষার প্রধান উপায় ছিল।

আজ কাল ধান হইতে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এখন যাহাকে যে নামে পরিচিত করা যায়, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে তাহার সেই নাম ছিল, স্বভাব জাত দ্রব্যের সেই স্বাভাবিক নিয়ম সম্বন্ধে সেইরূপ অনুমান করা অবশ্য অন্যায় নহে। কিন্তু অনেক স্থলেই যে তাহার ব্যতিক্রম হইত, এই ধান্য শব্দ তাহার একটী প্রমাণ। বৈদিক যুগে ধান শব্দে ধান্য বুঝাইত না।

ঋক্‌বেদে ধান্য শব্দের উল্লেখ অনেক বার আছে। "যথা সদৃশী অদ্ধি ধানাঃ।" ৩।৩৫।৩

অন্যত্র—"পচাৎ পক্তী উত ভৃজ্জাতি ধানাঃ। ৪। ২৪। ৭ ইত্যাদি।

ঋকবেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য ধানাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন যবাঃ। সায়ন ধান শব্দের তণ্ডুল বিধ অর্থ কোন স্থলে করেন নাই। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সায়নের নির্দ্দেশ স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই নির্দ্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া ইহা স্বীকার করিতে হয়, যে ধান বলিতে পূর্ব্বে প্রধান খাদ্য দ্রব্যকেই বুঝাইত; এবং তাহা ছিল, যব। 'ধান্য' শব্দে বর্ত্তমান সময় আমরা বুঝি ব্রীহি বা তণ্ডুল। এই দুটী শব্দের উল্লেখ ঋকবেদে দৃষ্ট হয় না।

ঋক বেদে ধান্য ও যব।

ঋক বেদে ব্রীহি বা তণ্ডুলের উল্লেখ না থাকায় ইহাই মনে হয় যে ঐ সুপ্রাচীন যুগে আর্য্য সমাজ যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ব্রীহি চাষের উপযুক্ত ছিল না, অথবা ব্রীহির চাষের প্রণালী তাহারা জানিতেন না। আর্য্য সমাজ গাঙ্গেয় উপত্যকায় আগমন করিলে পর তাঁহারা স্বভাব জাত ব্রীহি দেখিয়াই হউক বা যে প্রকারেই হউক ব্রীহির চাষ করিতে আরম্ভ করেন। তখন তাহাই প্রধান খাদ্যরূপে পরিগত হয়। তাহারই ফলে আমরা অযোধ্যাকে "ধন ধান্যবান্" ও "শালি তণ্ডুল সম্পূর্ণ" ছিল বলিয়া অবগত হই।

ধানের চাষ প্রধান খাদ্য।

রামায়ণে ধান্য শব্দের ব্যবহার এবং যব শব্দের ব্যবহার পৃথক দৃষ্ট হয়; এই কারণে, এবং ধান্য শব্দের সহিত শালি তণ্ডুলের নিকট সম্বন্ধ হেতু, ধান্য শব্দে তণ্ডুলবাহী ব্রীহিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়। এবং ধনধান্য ও শালিতণ্ডুল যে তখন জীবিকার উপায় বলিয়া গণ্য ছিল, তাহা এ স্থলে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে বলিয়াও মনে হয়।

ধান্য শব্দে যে রামায়ণে যবকে বুঝায় নাই, তাহা কৌশল্যার বিলাপ

হইতেও বুঝা যাইতে পারে। রাম বনে গমন করিলে পর রামজননী কৌশল্যা

অন্ন-ভাত ব্যঞ্জন। বিলাপ করিতে করিতে দশরথকে বলিতেছেন:—

ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্।

বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে॥ ৫।২।৮১

অর্থ—যে বিশালাক্ষী সীতা সতত উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সমন্বিত উত্তম অন্ন ভোজন করিতেন, তিনি কি প্রকারে (দাক্ষিণাত্যের) বন্য নীবার (ধান্যের) অন্ন ভক্ষণ করিবেন।

কৌশল্যার এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তৎকালের আর্য্য সমাজে ভাত-ব্যঞ্জন আহার করিবার প্রথা ছিল।

ভাত ব্যতীত, রুটী বা লুচিকে যে অন্ন মধ্যে পরিগণিত করা হইত না তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু আধুনিক রুটী বা লুচি অথবা এরূপ অর্থ বোধক কোন নাম রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না!

আতিথ্যের উপকরণ। ভরত রামঅন্বেষণে যাত্রা করিয়া ভরদ্বাজ আশ্রমে উপনীত হইলে ভরদ্বাজ যে বিপুল উপকরণ সম্ভারের আয়োজন করিয়া রাজ-অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা ছিল—চতুর্ব্বিধ অন্ন, মিষ্টান্ন, শুভ্রান্ন, নানাবিধ ব্যঞ্জন, মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুট মাংস; মৈরেয় মদ্য ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট মদ্য, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, ইক্ষুরস, মধু, ইত্যাদি বিশিষ্ট খাদ্য। এস্থলে অন্ন শব্দে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—এই চতুর্ব্বিধ প্রধান খাদ্যকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

কলাই বা দাইলের উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুদগ চনক, মাষ কুলথ প্রভৃতি শস্যের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে নাই। উত্তর কাণ্ডের ৯৫ সর্গে মুগ, মাষ, চনক, কুলথ প্রভৃতি শস্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মসুরির দাইল আমাদের দেশে অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত। তাহার কারণ, তাহা শীত প্রধান ইয়ুরোপের গরম ফসল।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কেন মধ্যযুগের সাহিত্যেও ইহার উল্লেখ নাই। (১)

কৃশর বা খিচুরীর উল্লেখ রামায়ণে আছে। এখন দাইল সংযোগে খিচুরী প্রস্তুত হয়। সেকালে তিল, মধু ও (২) তণ্ডুল সংমিশ্রনে কৃশর বা খিচুরী প্রস্তুত হইত। তিল হইতেই তৈল হইত এবং সেই তৈল সমাজে ব্যবহৃত হইত।

তিল-তৈল।

তখন নানারূপ সুগন্ধি তৈলেরও প্রচলন ছিল। উচ্চ সমাজের লোকেরা মস্তকে সুগন্ধ তৈল ব্যবহার করিত। প্রদীপেও তৈল ব্যবহৃত হইত। তৈলের অন্য ব্যবহারও ছিল। সর্ষপের উল্লেখ রামায়ণে আছে। হোমাদি দেব কার্য্যে বীজরূপে তাহা ব্যবহৃত হইত। পিষ্টক অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত ছিল। ঋকবেদে পিষ্টক এবং পুরোডাস উভয় শব্দই আছে। যব চূর্ণ দ্বারা বোধ হয় তাহা প্রস্তুত হইত।

কৃশর ও পায়স যজ্ঞাদি ব্যতীত আহার করা অবৈধ ছিল।

মাংস ভোজন।

অযোধ্যার রাজপরিবারে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হইত। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি মৃগয়া লব্ধ বরাহ, ঋষ্য, পৃষৎ, মহারুরু ও ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতেন। (৩) মাংস সংযুক্ত অন্ন বা পলান্ন রন্ধনের ব্যবস্থাও তখন ছিল।

বন্য পশুর মাংস।

তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের গণ্ডার, শল্যকী, গোধা শশ ও কূর্ম্ম

১। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ বাইবেলের আদি পুস্তকে মসুরের দাইলের উল্লেখ আছে। (আদি পুস্তক ২৫। ৩৪)

২। "তিলতণ্ডুল সর্ম্পকঃ কৃশরঃ সোহভিধীয়তে"। কত্যায়ণ সংহিতা ২৫।৮

৩। অযোধ্যাকাণ্ড ২৫। ১০২ শ্লোক।

এই পাঁচটী পঞ্চনখ জন্তুও ভক্ষ্য ছিল। যথা—

পঞ্চ পঞ্চনক্ষা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।

শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চম ॥ ৩৯।৪।১৭

এই পাঁচটী ব্যতীত অন্য পঞ্চনখ প্রাণী অভক্ষ্য ছিল। (১)

অভক্ষ্য মাংস।

ছাগ মাংস, পায়স ও কৃশরের ন্যায় যজ্ঞ ব্যতীত ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। যথা—

পায়সং কৃশরং ছাগং বৃথা সোহশ্নাতু নির্ঘণঃ। ৩০।২।৫৭

নিয়মের ব্যভিচার।

নিয়মের ব্যাভিচার সকল দেশের সকল সমাজেই হইয়া থাকে। পায়স, কৃশর এবং ছাগ মাংস যজ্ঞব্যতীতও যে লোকে না খাইত তাহা নহে। ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরতের আতিথ্য সৎকার জন্য প্রচুর পায়সের বন্দোবস্ত হইয়াছিল এবং বুভুক্ষুরা তাহা ভোজন করিয়াছিল। ক্ষুধিতের পক্ষে কোন সমাজেই কোন নিয়ম থাকিতে পারে না।

গো হত্যা পাপ।

গো মাংস ভক্ষণের কোন উল্লেখ রামায়ণে নাই। না থাকিলেও দুই একটী অবান্তর কথার সংশ্রবে তাহার প্রচলন প্রথা রামায়ণের সমাজে ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। আমরা এই জন্য এস্থলে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের উল্লেখগুলি উপলক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম। মিঃ হুইলার রামায়ণের যে সকল স্থানে গো বধের উল্লেখ কল্পনা করিয়াছেন, আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিয়াছি। রামায়ণে গোহত্যাকে স্পষ্ট পাপজনক কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। (২)

রামায়ণের রচনা কালে পূর্ব্ব ভারতের মিথিলা পর্য্যন্ত আর্য্য বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। এই ভূভাগ উষ্ণ প্রধান, গো মাংস উষ্ণ প্রধান

(১) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৭ সর্গ। (২) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩৪। ১২ শ্লোক।

দেশের উপযোগী নহে, বিশেষতঃ গো এই সময় কৃষি কার্য্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাহার ক্ষয় বা বিলয় সমাজ তখন বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না; এই জন্য এই সময় গোমাতাকে আর্য্য সমাজ দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, গো শরীরে কোন প্রকারে চরণ স্পর্শ করিলে তাহা বিশেষ অপরাধজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। (অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

গো দেবতা পূজ্য।

রামায়ণে গো রক্ষার এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিলেও প্রাক্‌বৈদিক (১) অথবা বৈদিক যুগের কোন এক সময় যে এদেশে গো-মাংসের প্রচলন ছিল ঋকবেদাদি (২) বৈদিক সাহিত্যে মনু (৩) অশ্বলায়ন (৪) গোভিল (৫) প্রভৃতি সংহিতা ও সূত্র গ্রন্থে এবং আধুনিক খৃষ্টোত্তর যুগের উত্তর রাম চরিত ও মহাবীর চরিত প্রভৃতি নাট্য-সাহিত্যে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে গো বধ ও গো মাংসের কথা।

ঋক্ বেদের বহু ঋকে গোহত্যা ও গো মাংসের উল্লেখ থাকিলেও গোহত্যা এবং গো মাংস ভক্ষণ প্রথা যে ঋক বেদের সময়েই উঠিয়া গিয়াছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণও ঋক বেদেই আছে। ঋক বেদের বহু ঋকে 'গো' শব্দে পূর্ব্বে বা পরে অথবা পরিবর্ত্তে অঘ্ন্য শব্দের প্রয়োগ দ্বারা গোকে "অঘ্ন অহন্তব্য অবধ্য এইরূপ বিশেষিত করা হইয়াছে। এইরূপ কয়েকটী ঋক্ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ঋক বেদে গো-অঘ্ন্য না বা অবধ্য।

---

(১) কৃষ্ণযজু ৩।৮ [২] ঋকবেদ ১।৬১।১২, ১০। ২৭।২, ১০। ২৮। ৩, ১০।৮৬। ১৩ ও ১৪ ঋক ১০। ৭৯। ৬: ১০। ৮৯। ১৪, ১০। ৯১। ১৪, ইত্যাদি ঋকে গো হত্যার কথা আছে। [৩] মনুসংহিতা ৫।১৮ [৪] অশ্বলায়ন সূত্র ২৬ [৫] গোভিল গৃহ্যসূত্র।

"প্রশংসা গোষু অঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্ধো মারুতম্"। ১।৩৭।৫

অর্থ—"পশুগণের মধ্যে অবধ্য বৃষের ন্যায় বল দৃপ্ত মরুদগণের স্তব কর।" উমেশ বটব্যাল।

"সূযবসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবংতঃ স্যাম।

অদ্ধি তৃণং অঘ্ন্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধ মদকমাচরন্তী ॥১।১৬৪।৪০

অর্থ—"হে অহননীয়া গাভী! তুমি শোভন তৃণ শস্যাদি ভক্ষণ কর এবং প্রভূত দুগ্ধবতী হও। তাহা হইলে আমরাও প্রভূত ধনবান হইব। সর্ব্বকাল ধরিয়া এবং সর্ব্বত্র গমন করতঃ নির্ম্মল জল পান কর। (রমেশ দত্তের অনুবাদ)

"শুচি ঘৃতং ন তপ্তম্ অঘ্ন্যায়াঃ স্পার্হা দেবস্য মংহনেব ধেনোঃ॥" ৪।১।৬

যেরূপ গাভীর (অঘ্ন্যায়াঃ) তেজোযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেরূপ পয়স্বিনী গাভী (মনুষ্যের) ভজনীয় হয়..."

"অভীমমঘ্ন্যা উত শ্রীনন্তি ধেনব শিশুং।

সোমমিন্দ্রায় পাতবে॥ ৯।১।৯"

"অবধ্য ধেনুগণ নবজাত সোম রসকে ইন্দ্রের পানের জন্য স্বীয় দুগ্ধের দ্বারা মিশ্রিত করিতেছে।" (উমেশ বাবু; রমেশ বাবুর অর্থও এইরূপ।)

যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমংক্তে যে অশ্বেন পশুনা যাতুধানঃ।

যো অঘ্ন্যায়া ভরতি ক্ষীর মগ্নে তেষাং শীর্ষাণি হরসাপি বৃশ্চ। ১০।৮৭।১৬

অর্থ—"যে নর মাংস ভোজী, অশ্ব মাংসভোজী রাক্ষস আমাদের অঘ্ন্যার ক্ষীর চুরি করে, হে অগ্নি, তুমি তাহার শিরশ্ছেদ কর।" (উমেশ বটব্যাল) *

* স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উইলসন ও হুইলার সাহেবের অনুসরণে ঋকবেদের প্রায় পনরটী ঋকে গোবধের ও গো মাংস ব্যবহারের আভাস আছে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন

যজুর্ব্বেদেও গাভীকে "অঘ্ন্যা" শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যথা :—

যজুর্ব্বেদে গো অঘ্ন্যা।

আপ্যায়ধ্বম্ অঘ্নিয়া দেবভাগং উর্জ্জস্বতীঃ পয়স্বতীঃ।

ঋক্‌বেদে গো বধ ও গো মাংসের যে উল্লেখ আছে তাহা সত্য। কিন্তু তাহা দ্বারা ঐ সময়েই যে ঐরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয় ও আরোও অনেকে মনে করেন না।

ঋক্‌বেদে গোহত্যার উল্লেখ যে ভাবে আছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের উত্তর রামচরিত নাটকেও গো হত্যার উল্লেখ সেইরূপ ভাবে আছে। উভয় গ্রন্থেই অতীত কালের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদে গাভীকে 'অঘ্ন্যা' ও বৃষকে 'অঘ্ন' বাচ্যে বিশেষিত করায় গোকুল রক্ষার সমর্থনই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্তু খুব প্রাচীন যুগে যে এইরূপ কোন নিয়ম ছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি দৃষ্টে তাহা অনুমান করা যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রাচীন কথার আলোচনায় মৃত দেহের সহিত যে গো বাঁধিয়া দেওয়ার প্রথা ছিল, তাহার আভাস আছে। আরণ্যক গো স্থানে ছাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখানেও গো রক্ষার

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মত।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া [সাহিত্যে ১৩০০] দত্ত সাহেবের কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দত্ত সাহেবের উদ্দেশ্য এই শেষ ঋকটীর অনুবাদে প্রকাশ পাইবে। বেদের অর্থ যাঁহারা করিতে সাহস করেন, তাঁহারা উভয় অনুবাদের দোষগুলি লক্ষ্য করিবেন। দত্ত সাহেব শেষ ঋকটী অনুবাদ করিয়াছেন যে রাক্ষস নরমাংস সংগ্রহ করে, অথবা অশ্ব প্রভৃতি পশুদিগের মাংস সংগ্রহ করে, যে হত্যা করিবার অযোগ্য গাভীর দুগ্ধ হরণ করে, হে অগ্নি! নিজ বলে তাহাদের মস্তক ছেদন করিয়া দাও। দত্ত মহোদয়ের এই ভাব ও বটব্যাল মহাশয়ের সহিত মিলিতেছে না। সায়ন "অঘ্ন্যা শব্দে "গো" অর্থ করিয়াছেন। যাস্কের নিরুক্তেও যাস্ক লিখিয়াছেন "অঘ্ন্যা গো অহন্তব্যা ভবতি।"

ভাবই প্রকাশ পায়। আধুনিক সময় যে শ্রাদ্ধ ক্রিয়ায় গো দান ও বৃষোৎসর্গ হয়, তাহা এই প্রথারই অনুকরণে পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ কর্ত্তৃক কল্পিত ও ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনারসময় গোবধ ছিল না। রামায়ণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী রচনা।

রামায়ণে গোঘ্ন।

রামায়ণে গোঘ্ন শব্দের অর্থ গো হত্যাকারীই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈদিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। যথাঃ—

গোঘ্নেচৈব স্বুরপেচ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥" ১২।৪।৩৪ সর্গ

ইহাতে গোঘ্ন বা গোহত্যাকারীকে সুরা পায়ীর ন্যায় নিন্দিত করা হইয়াছে।

পাণিনি গোঘ্ন-অথিতি।

বৈদিক যুগে অতিথিকে 'গোঘ্ন' বলা হইত। পাণিনি ব্যতীত পাণিনির পূর্ব্বের ও পরের (১) কোন্ বৈদিক গ্রন্থে এই শব্দটীর এইরূপ অর্থে প্রয়োগ আছে কিনা, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। যাহাহউক পাণিনির নির্দ্দেশ দ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বে অতিথি গৃহে আসিলে, গো বধ করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনার বিধান ছিল। অতিথির জন্য গো হত্যা হইত বলিয়া পাণিনি 'গোঘ্ন' শব্দটী এইরূপে সাধিয়াছেন :—গৌর্হন্যতে যস্মৈ (হন সম্প্রদানে ক) অতিথি।

রামায়ণে গো-উপঢৌকন।

রামায়ণে অতিথিকে গো উপঢৌকন দ্বারা অভ্যর্থনা করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গোহত্যার কথা নাই। রাম-লক্ষ্মণ সীতা চিত্রকুট যাইবার পথে ভরদ্বাজ

১। পাণিনির পরের বৈদিক গ্রন্থ দ্বারা আমরা কোন কোন উপনিষদকে নির্দ্দেশ করিয়াছি। প্রাচীন উপনিষদগুলির কোন উপনিষদেই "গোঘ্ন" শব্দ নাই। কঠোপনিষদে যমের বাড়ীতে অতিথি নচিকেতার আতিথ্য সৎকারের কথা আছে, কিন্তু "অতিথি" "গোঘ্ন" বাচ্যে অভিহিত নহেন।

আশ্রমে উপনীত হইলে ভরদ্বাজ রামকে এইরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যথা :—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ পুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্য মুদকং ততঃ। "১৭।২।৫৪"

ভরদ্বাজ অর্ঘ্য উদক ও গো উপঢৌকন দিয়া অতিথিকে গ্রহণ করিলেন। ইহাদ্বারা পাণিনি কথিত গো হত্যার কথা হইতেছে কি?

অন্যত্র—সীতা যমুনা নদী অতিক্রম করিবার সময় যমুনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—আমরা যদি কুশলে এই চৌদ্দ বৎসর কাটাইয়া আসিতে পারি তবে হে দেবী, তোমাকে সুরাও গো দ্বারা পূজা করিব। যথা—

স্বস্তি দেবী তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।
যক্ষ্যে ত্বাং গো সহস্রেণ সুরাঘট শতেনচ॥ ২০।২।৫৫

এখানেও গো-দানের কথাই আছে, বলি বা বধের কথা নাই। অথচ এই দুইটী কথা (ভরদ্বাজের রাম-সম্ভাষণ ও সীতার যমুনার উদ্দেশে মানসিক) লইয়া হুইলার প্রমুখ সাহেবেরা রামায়ণের যুগেও যে গো মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা উল্লেখ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

বৈদিক যুগের শেষ ভাগেও কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি হেতু গো রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়াছিল ; সে জন্য গো হত্যা নিবারণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় তৎপরবর্ত্তী কালের ঋক সমূহে গোকে "অঘ্ন্যা" ও রামায়ণে "গোঘ্নের" অর্থ অন্য রূপ হইয়াছিল। তখন গো দান করিয়া গোধনকে দেশময় ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রতিকার্য্যে—বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উৎসবে, ব্রাহ্মণ আগমনে,

ব্রাহ্মণ ভোজনে—গো দান করিয়া গ্রহীতাকে সম্মান প্রদর্শন করা হইত। দাতাও দানের ফল আত্ম-প্রসাদ ও পুণ্যলাভ করিতেন। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়েও এইরূপ ভাবে গো উপঢৌকন বা দানের কথাই বলা হইয়াছে। সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। পাণিনি অপেক্ষা প্রচীন এবং রামায়ণ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই উভয় গ্রন্থ এই মতের সমর্থক। এই গ্রন্থদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। রামায়ণে গোজাতির প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে শাস্ত্রানুশাসন অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইল।

এইরূপ স্থলে রামায়ণের প্রাচীনতা ও অর্ব্বাচীনতা সম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে; তাহা এই যে (১) রামায়ণে "গোঘ্ন" অর্থে গো হত্যাকারী নির্দ্দেশ করায় ও অতিথিকে গো উপঢৌকন দেওয়ার কথা থাকায় রামায়ণকে পাণিনির পরবর্ত্তী এবং পাণিনিকে বৈদিক যুগের ব্যাকরণ বলিয়া মনে করা যায়, কেননা পাণিনি গোঘ্নের বৈদিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। রামায়ণের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। রামায়ণের "গোঘ্ন" অর্থ অতি সাধারণ এবং আধুনিক স্মৃতিতে গৃহীত অর্থ। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কেবল যে পাণিনিই বৈদিক অর্থগ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, এই ভাব খ্রীষ্টোত্তর যুগের কবি ভবভূতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহার কারণ নিম্নে বিবৃত হইল।

রামায়ণ ওপাণিনি।

আমরা প্রথম অধ্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি যে পাণিনি "রামায়ণ" গ্রন্থরূপে দেখেন নাই কেননা, তখনো রামায়ণ গ্রন্থরূপে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল না। পাণিনি খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীর বৈয়াকরণ। তিনি বৈদিক শব্দের

পাণিনিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব কেন?

বিচার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক বৈয়াকরণগণের নির্দ্দেশ অবলম্বনে করিয়াছিলেন। রামায়ণে "মনুনা গীতৌ" বলিয়া অনুশাসনের উল্লেখ আছে, বোধ হয় পাণিনি তাহা দেখেন নাই। ঐ স্মৃতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভৃগু ঐ প্রাচীন গীতের (স্মৃতির) যাহা জনস্মৃতি হইতে সংগৃহীত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহাই ভৃগুকথিত মানব সংহিতা নামে পরিচিত। ঐ সংগৃহীত স্মৃতিতে অতিথি, দেবতা, পিতৃ পুরুষকে—নিবেদন করিয়া গো মাংস ব্যবহারের ধারাটী আছে এবং এইরূপ আরো কোন কোন কথাও আছে। রামায়ণী যুগে যে "মনুনা গীতৌ" প্রচলিত ছিল, তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা বর্ত্তমান মনু সংহিতার ন্যায় এমন স্পষ্ট ভাষায় থাকিলে রামায়ণেও আমরা তাহার অনুরূপ ব্যবস্থার আভাস অবশ্য পাইতাম। প্রাচীন মনুর গীতে তেমন ব্যবস্থা ছিল না, বৌদ্ধযুগে এই ব্যবস্থাটী ভৃগুর মানব সংহিতায় গৃহীত হইয়াছিল।

মনুর প্রাচীন স্মৃতি ভৃগুর নামে প্রচারের সময়ই ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এই ধর্ম্ম বেদের পশু হিংসার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ঐ ঘোষণা বেদ বিরোধী বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম বাদীদিগের পক্ষ হইতেও প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হইতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারকগণ যতই প্রাণী হিংসার বিরুদ্ধে চলিতেছিলেন, তৎকালীন রাজধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম থাকায় রাজ-অনুশাসনও তখন সর্ব্ব প্রযত্নে সেই নব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জীবহিংসার পক্ষে কার্য্য করিতেছিল। এই সময় গো-হত্যার পোষক পাশ্চাত্য যাবনিক ভাব ও (গ্রীক সংস্পর্শে) রাজধর্ম্ম পক্ষে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। এ বিরাট প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ফলে গো-হত্যা প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার প্রমাণ আমরা প্রিয়দর্শী

বৌদ্ধ বিপ্লবে কিরূপে পুনরায় গোহত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অশোকের প্রথম অনুশাসনে অবগত হইতে পারি। সে অনুশাসনে সহস্র সহস্র প্রাণীহত্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। * এইরূপে ধর্ম্মের বিরোধে ও ম্লেচ্ছ ভাবের সংস্পর্শে সে প্রাচীন প্রাক্‌বৈদিক রীতি উলঙ্গ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে পুনরায় কলুষিত করিয়াছিল। এই সময়ের স্মৃতি গ্রন্থসমূহে এই জন্যই গো মাংসের উল্লেখ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সনাতন সমাজ কোল দিয়া উভয় সমাজ "হিন্দু সমাজ" নামে পরিচিত হইলে নূতন স্মৃতি গ্রন্থ সমূহে সম্মানিত অথিতির সম্মুখে মধুপর্কের সহিত গো অথবা ছাগ উপস্থিত করিয়া সম্মান করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা "মহোক্ষং বা মহাজং বা শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।১০৯

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় গোবধের ব্যবস্থা দেওয়া না হইলেও মহাকবি কালিদাস ইঙ্গিতে এবং কবি শ্রেষ্ঠ ভবভূতি প্রকাশ্যে তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্ব্বাসনের পরও হিন্দু সমাজের বক্ষে থাকিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

যাহা হউক কবি ভবভূতি যে তাঁহার উত্তর রামচরিতে ও মহাবীর চরিতে প্রাচীন বৈদিক রীতিরই প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা তাহার নাট্যোল্লিখিত শিষ্যদ্বয়ের কথোপকথনেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

মদ্যপান।

মদ্যপান প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজেই প্রচলিত দেখা যায়। বৈদিক যুগে সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে যজ্ঞে নিবেদন করা হইত। সোমরসে মাদকতা ছিল; কিন্তু বাইবেলে উল্লেখিত দ্রাক্ষারসে যেমন মত্তগা জন্মিত, সোমে তেমন মত্ততার কোন আভাস কোথাও লক্ষিত

* পিয়দশী (Piyadasi) অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া জীবহত্যা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; তাহার ১ম খোদিত অনুশাসন লিপিতে তাহাই অবগত হওয়া যায়।

হয় না। ইরাণিদিগের মধ্যেও সোমের ব্যবহার ছিল। "অবস্থা" গ্রন্থে তাহা "হাওমা" নামে অভিহিত হইয়াছে। বৈদিক যুগের অবসানে সোমের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। সোম প্রস্তুতের বিশেষ প্রক্রিয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়ই বোধ হয় ইহার প্রচলন একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল এবং সোম দেবতা স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। * অথর্ব্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে এবং উপনিষদ সমূহে চন্দ্রকেই সোম বলা হইয়াছে।

রামায়ণে সোমরসের উল্লেখ মাত্র এক স্থানে আছে। (আ ৩২) তাহাও বৈদিক সোমকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রস্তুত প্রক্রিয়ার লোপ হেতুই সোমের বিলুপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। সোমের অভাবেই বোধ হয় রামায়ণে সুরার প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রামায়ণে সৌরের মন্ত, সৌরীক মন্ত, (গৌড়ী মন্ত), মধু, সুরা, প্রভৃতি বহু প্রকারের মদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সোম অভাবে সুরা।

রামায়ণে মদ্যপায়ীর প্রতি দোষারোপ থাকিলেও, এবং মদ্যপকে হেয় বলিয়া স্থানে স্থানে নিন্দিত করা হইয়া থাকিলেও দেখা যায়, তৎকালে দেবকার্য্যে ও অতিথি সৎকারে মদ্য ব্যবহৃত হইত। সীতা মদ্য দ্বারা গঙ্গা ও যমুনায় পূজা করিবেন বলিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ

রামায়ণে সুরার ব্যবহার।

* কেহ কেহ বলেন—আর্য্যগণের আদিবাস ভূমির তুষারমণ্ডিত হিমানী প্রদেশে সোম স্বাস্থ্য ও দেহ রক্ষারপক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয়ছিল। এই কারণে সোমের ব্যবহার প্রাচীনতম আর্য্যদিগের প্রধান পানীয় ছিল। উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়া তাঁহারা সোমের অপকারিতা অনুভব করিয়া সোমপান ও প্রস্তুতের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এদেশে তাঁহারাই সোমপান করিতেন না কেবল দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই নিবেদন করিতেন। এইরূপে সমাজ তখন দেবকার্য্যে সোমের পরিবর্ত্তে সুরা ব্যবহার প্রচলিত হয়।

ভরতের আতিথ্য সৎকার উপলক্ষে নানাবিধ সুরার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এমন কি এক স্থানে রামের মদ্য পানেরও ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

সুরা উৎপত্তির অসার গল্প।

সমুদ্র মন্থনে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে যে গল্প আছে, তাহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা প্রথমাংশের প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুরা দ্রব্যবিশেষ দ্বারা প্রস্তুত পানীয় পদার্থ, তাহা সমুদ্র মন্থনে এক দিনে উত্থিত হইয়া চিরদিনের জন্য রক্ষিত হইবার পদার্থ নহে।

সুরা ঘৃণ্য।

সোমরসের অভাবেই সুরা রামায়ণের সমাজে চলিয়াছিল; সেই জন্যই আমারা দেবকার্য্যে তাহা নিবেদিত হইতে দেখি। কিন্তু সুরা যে সোমরস নহে, এবং তাহা যে মানুষকে মত্ত করিয়া হীন পন্থায় পরিচালনা করে, তাহাও তৎকালীন আর্য্য সমাজ বুঝিয়াছিলেন। তাই আমরা সমাজের উচ্চস্তর হইতে যে সুরাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত, তাহা রাজা দশরথ ও রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির কথা হইতে অবগত হইতে পারি।

রাজা দশরথ, রাম ও লক্ষ্মণ সুরাপান সম্বন্ধে কিরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারা কখনও সুরাপান করিয়াছিলেন কিনা অতঃপর তাহারই আলোচনা করা গেল।

সুরা সম্বন্ধে দশরথের উক্তি।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে বর দানে বাধ্য করিয়া ধরিলে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ৭৮।২।১২

অর্থ—যদি আমি এইরূপ করি (তোমাকে বরদান করিতে যাইয়া রামকে বনে পাঠাই), তাহা হইলে আর্য্যগণ রথ্যাসমূহে সমবেত

হইয়া আমাকে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে।

দশরথের এই উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের মদ্যপান নীতিবিরুদ্ধ ও অনার্য্যোচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের ও অন্যান্য সাধারণের পক্ষে মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল কি না, বুঝা যায় না।

রাজা দশরথ অন্যত্র বলিতেছেন—

সতীং ত্বামহং মত্যন্তং ব্যবস্যাম্য সতীং সতীম্।

রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥ ৭৬।২।১২

অর্থ—মানুষ যেমন বিষাক্ত মদ্য প্রিয় দর্শন বলিয়া পান করিয়া পরিণামে মদ্যকে বিষ বলিয়াই মনে করে, আমিও তেমনই অসতীকে সতী বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

রাজা দশরথের এই উক্তি দ্বারা মদ্যের ব্যবহার সপ্রমাণ হয় বটে, কিন্তু তাহা যে পদস্থ নীতিপরায়ণ লোকদিগের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য ছিল, তাহাও ব্যক্ত হয়।

সুরাপান সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উক্তি উচ্চ নীতির পোষক; তাহা রামায়ণী সমাজের উচ্চ স্তরের অবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

সুরা সম্বন্ধে লক্ষ্মণের উক্তি।

"নহি ধর্ম্মার্থ সিদ্ধার্থং পানমেব প্রশস্যতে।

পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪৬।৪।৩৩

অর্থ—ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে মদ্যপানপ্রশস্ত নহে। কারণ সুরাপানের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের হানি হয়।"

লক্ষ্মণের এই নীতি উপদেশ দ্বারা লক্ষ্মণকে সুরাসক্ত মনে করা যাইতে

পারে না বটে কিন্তু আর্য্য ভারতের তৎকালীন সাধারণ সমাজে যে সুরাপান চলিত না, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

লক্ষ্মণ অন্যত্র বলিতেছেন—"পণ্ডিতেরা গো হত্যাকারী, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রতদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।" ১২।৪।৩৪

এই বাক্যেও সুরাপানকে দোষজনক বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পরন্তু সুরাপান যে সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই।

লক্ষ্মণ নৈতিক উপদেশের ছলে সুগ্রীবকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রিয় সমাজই যে লক্ষ্মণ নির্দ্দিষ্ট উচ্চ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, রামায়ণে এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি?

রাজা দশরথের মদ্যপানের কথা আমরা রামায়ণে কোথাও দেখিতে পাই না, লক্ষ্মণের চরিত্রও এবিষয়ে নিষ্কলঙ্ক।

এইবার ভরতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাউক। ভরত অযোধ্যার নাগরিকগণ সহ রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চিত্রকূটে যাত্রা করিয়া পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ তখন সেই সম্মানিত রাজ অতিথিগণের জন্য বিরাট সৎকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ব্যবস্থায় যে না-ছিল কি, তাহা বলা যায় না। ভরদ্বাজ বিবিধ প্রকারের সুরারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ কি রাজকুমারদিগের জন্য এগুলির ব্যবস্থা করেন নাই? তাঁহারা কি তাহা পান করেন নাই?

ভরতের আতিথ্য সৎকারে সুরা।

মহাকবি বাল্মীকি এক কথায় তাহার উত্তর দিয়াছেন। তাহা—

"সুরাঃ সুরাপাঃ পিবন্তু পায়সং বুভুক্ষিতঃ।"

সুরাপায়ী যারা তাহারাই সুরাপান করিল আর বুভুক্ষুরা পায়স খাইল।

নীতির হিসাবে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল, শাস্ত্রের হিসাবে যজ্ঞ ব্যতীত পায়স ভোজন নিষিদ্ধ ছিল। মাতাল ও ক্ষুধিতের পক্ষে কোন নিয়ম নাই। তাই কবি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন "সুরাঃ সুরাপাঃ পিবন্তু পায়সং বুভুক্ষিতঃ।

এ স্থলে রাজপুত্র ও উচ্চ শ্রেণীস্থ অতিথিদিগকে রক্ষা করাই কবির ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে পরন্তু সমাজে যে শাস্ত্র ও নীতির ব্যভিচার অপ্রচলিত ছিল না, তাহ'ও তিনি দেখাইয়াছেন।

এইবার আমরা মহাকাব্যের আদর্শ পুরুষ, উচ্চ নীতির বিরাট বিগ্রহ রামের সম্বন্ধে যে দুই একটা উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করিব।

রামের মধুপান।

হনুমান অশোক বনে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে করিতে যাইয়া বলিতেছেন।

"ন মাংসং রাঘবোভুঙক্তে ন চৈব মধু সেবতে।

বন্যং সুবিহিতং নিত্যংভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥" ৫।৩।৫।৩৩

অর্থ—(আপনার বিরহে) রাঘব মধু সেবন ও মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়াছেন তিনি কেবল অরণ্য-জাত সুবিহিত খাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শব্দকোষে মধু সুরা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই জন্য টীকাকারগণ মধু শব্দ মদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। *

মধুর দুর ব্যাখ্যা।

* রামায়ণের বঙ্গানুবাদকদিগের মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন বোধ হয় রামচরিত্রের

মধু শব্দদ্বারা আরণ্য মধুকেও বুঝায়, মদ্যকেও বুঝায়। যে স্থলে অর্থ গ্রহণের সোজা উপায় আছে, সে স্থলে দূর কল্পনায় যাওয়া সাহিত্য শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দেন না; তাঁহারা বলেন—

"সম্ভবত্যেক বাক্যত্বে বাক্য ভেদো ন যুজ্যতে।"

আমরা রামায়ণে মধু চাষের উল্লেখ পাই। দাক্ষিণাত্যের নিবিড় অরণ্যে তখন চক্রমধু রক্ষিত হইত। সুগ্রীবের এক মধুবনের উল্লেখ সুন্দরকাণ্ডের ৬১ সর্গে আছে। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়া আসিলে বানরেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া সেই রক্ষিত মধুবনের সমস্ত মধু ও ফল মূল পান ও ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিল। মূলে আছে—

সুগ্রীবের মধুবন।

"ততস্তে বানরা হৃষ্টা দৃষ্ট্বা মধুবনং মহৎ। ১১"

তখন যে কেবল "দ্রুমান্ মধুকরাকুলান্" চক্র হইতেই মধু উৎপন্ন হইত তাহা নহে, কোন কোন বৃক্ষ হইতেও নাকি মধু ক্ষরিত হইত। ভরদ্বাজ অতিথি সৎকার জন্য যে উগ্র সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধনার ফলে—

"তাশ্চকামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ।" ৬৯।২।৯১

এস্থলে বৃক্ষে মধুচক্র ছিল এবং তাহা হইতেই বৃক্ষগাত্রে মধু ক্ষরিত হইতেছিল, এই স্পষ্ট অর্থই প্রকাশ পায়।

রাম বনবাস ভোগ করিতেছিলেন, সেই বনে যথেষ্ট মধুর বন রক্ষিত ছিল; এরূপ অবস্থায় রাম সীতার মধুপান অর্থে "মদ্য পান" যাঁহারা করেন তাঁহাদের চরিত্র-জ্ঞানহীনতার ও রুচির দোষ দেওয়া যায় না কি?

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই মধু শব্দের অনুবাদেও 'মধুপান' রাখিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন "মদ্য স্পর্শ করেন না" অনুবাদ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে "উত্তরকাণ্ডের" লেখক রাম ও সীতার চরিত্রকে কিরূপ ভাবে দাঁড় করিয়াছেন তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই লেখক অযোধ্যার সমগ্র স্ত্রী সমাজকেও সুরাসক্ত করিয়াছেন এবং অযোধ্যায় একটী নির্জ্জন অশোক বনের সৃষ্টি করিয়া পাঠকদিগকে দেখাইয়াছেন—

উত্তরকাণ্ডের রামচরিত্র।

"কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদহ।
সীতামাদায় হস্তেন মধুমৈরেয়কংশুচিঃ॥ ১৮।৫২

অর্থ—"রাম তাঁহার অশোক কাননস্থিত লতাগৃহে কুসুমাস্তরণে বসিয়া সীতাকে বাম হস্তে লইয়া মৈরেয় মধু (মদ্য) পান করাইলেন শুধু তাহাই নহে মৈরেয় মধুর সঙ্গে—

মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানিচ—এরও ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অবস্থায় যখন উত্তরকাণ্ডের রাম সীতা প্রতিদিন উপবন বিহার করিতেন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিদিনই পানোন্মত্তা রূপবতীরা নৃত্যগীতে তাঁহাদিগকে প্রমোদিত রাখিত। *

* উত্তর কাণ্ডের এই রাম-সীতার চিত্র বাল্মীকি চিত্রিত রাম সীতার চিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে কি না তাহা পাঠক বিচার করিবেন। এই কাণ্ডে বর্ণিত এইরূপ বিষয়ের আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয় তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হইবার পর যখন 'পঞ্চমকার' সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ঠিক সেই সময়, এই কাণ্ড লিখিত হইয়াছিল এবং রামায়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল।

এই সময়ের রচিত গ্রন্থে স্বয়ং ভগবতীকেও পানাসক্তা করিয়া তোলা হইয়াছে। ভগবতী যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষাসুরকে বলিতেছেন "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।" চণ্ডী।

এই নিয়মে কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক মতের কালীপূজায় বাজারের মদ্যও দেওয়া হয়। স্বদেশীয় প্রভাবে কোন কোন স্থলে মধু ও আদার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইহা সোমের অভাব-পূরণার্থ কিনা পাঠক অনুমান করিবেন।

রামায়ণের কবি রামের উক্তিতেও যে সুরাপানের বিরুদ্ধে মন্তব্য না বাহির করিয়াছেন, তাহা নহে। ভরত চিত্রকূটে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, রাম ভরতকে যে সকল রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে আছে—

সুরা সম্বন্ধে রামের উক্তি।

দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।

অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রাচ রাঘব॥ ৬৮। ২। ১০০

দশবর্গ, পঞ্চবর্গ, চতুর্ব্বর্গ, সপ্তবর্গ, অষ্টবর্গ ও ত্রিবর্গ ইত্যাদি বর্গ সম্বন্ধে তুমি জ্ঞাত আছ কি?

এ দশ বর্গ দশ বিধ কামজ দোষ। স্মৃতি শাস্ত্র দশবর্গের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বাপঃ পরিবাদ স্ত্রিয়ো মদঃ।

তৌর্য্য ত্রিকং বৃথাটাচ কামজো দশকগণঃ॥ মনু ৬ অঃ।

যিনি ভরতকে মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, গীতবাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ প্রভৃতি দশবর্গের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি যে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা মনে করিতে আমাদের কোন মতেই প্রবৃত্তি হয় না।

লোক চরিত্রে এরূপ ত্রুটী আজকাল বিরল নহে। কিন্তু এ স্থলে কেবল লোক চরিত্রের দিকেও লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না; কাব্যের দিকে এবং কাব্যকারের গৌরবের দিকেও সম্যক লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে কবি লক্ষ্মণের মুখে সুরাপান সমর্থন করাইলেন না, ভরতের আতিথ্যে সুরার ব্যবস্থা রাখিয়াও ভরতের দ্বারা সুরা স্পর্শ করাইলেন না, তিনি যে তাহার আদর্শ সৃষ্টিকে কলঙ্কিত এবং ব্যর্থ উপদেষ্টা করিয়া চিত্রিত করিবেন, কোন হৃদয়বান ব্যক্তি কি তাহা স্বীকার করিবেন?

রামায়ণে যজ্ঞাদিতে বা অন্য কোন দৈবানুষ্ঠানেই মদ্যের উল্লেখ দেখি না। পরবর্ত্তী মহাভারতের সমাজে যেমন ভদ্র সমাজের (বলরাম প্রভৃতি) মধ্যেও মদ্যের প্রভাব দেখা যায়, রামায়ণে কোন স্থানে ইঙ্গিতেও তাহা বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে সীতার গঙ্গা নদী ও যমুনা নদীকে মদ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবার উল্লেখকে আমরা একটু সন্দেহের চক্ষেই অবলোকন করিতেছি। এই অনাবশ্যক সমাজ বিরোধী কথা দুটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে করিতেছি।

প্রক্ষিপ্ত ভাব।

রামায়ণের সমাজ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের প্রাথমিক অবস্থার সমাজ। এই সমাজে যে শাস্ত্রের সম্মান পদে পদে রক্ষিত হইয়াছিল তাহা মহর্ষির বর্ণনায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। প্রাথমিক কার্য্যে যে গলদ থাকে তাহাও ইহাতে আছে। ব্যভিচার ক্রমে ফুটিয়া উঠে, তখন পুনরায় সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ব্যভিচার অধিক প্রকাশ পাইলেই সেই সমাজ প্রাচীন হইবে না; বরং সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে পরবর্ত্তী হইবে।

ব্যভিচারের ক্রম বিকাশ।

মদের ব্যভিচার মহাভারতের যুগে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। খৃষ্টোত্তর যুগে যে তাহা কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল নিম্নলিখিত উক্তি প্রত্যুক্তি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভিক্ষো, মাংস নিষেবণং প্রকুরুষে কিস্তেন মদ্যং বিনা।
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গণাভিঃসহ।
বেশ্যাপ্যর্থ রুচিঃ কুতস্তবধনং দ্যূতেন চৌর্য্যেনবা
চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোহস্তি ভবতো নষ্টস্যকান্যাগতিঃ।

তাই বলিতেছি হীনতাই প্রাচীনতার প্রমাণ নহে।

অন্যান্য সমাজের খাদ্য।

মুনি-ঋষিগণ তখন বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপুরক, আমলকী, আম্র, কন্দমূল, প্রভৃতি আহার করিতেন। তাঁহারা যে কেবল ফলমূলাহারীই ছিলেন, তাহা নহে। স্ব স্ব আশ্রমে অযত্ন সুলভ ও অনায়াস লভ্য ফল মূল ও হবির্ভোজন করিতেন বটে, কিন্তু পরগৃহে সামিষ সুস্বাদু খাদ্য এবং নিরামিষ হবিষ্যান্নও গ্রহণ করিতেন। ইল্বল ও বাতাপি সংবাদে ঋষিরা যে মেষ প্রভৃতি মাংস ভোজন করিতেন তাহার উল্লেখ আছে।

ঋষিদিগের খাদ্য।

তখন দাক্ষিণাত্যের অনার্য্য অধিবাসীগণ নিবার ধান্যেরও কাঞ্জিক ভক্ষণ করিত। বানরেরা ফল মূল, মধু-মদ্য ইত্যাদি সহজলভ্য প্রাকৃতিক আহার্য্য গ্রহণ করিত। আরণ্য পশুপক্ষীর মাংস বোধ হয় সকল শ্রেণীর প্রাণীরই আহার্য্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের (বানর) সমাজ মদ্যপান বিষয়ে অতি মাত্রায় অনুরাগী ছিল; তাহাদের স্ত্রী সমাজ পর্য্যন্ত একান্তভাবে সুরাসক্ত ছিল। তাহারা বনে মধুর চাষ করিত এবং সেই মধু হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করিত। মধুও তখন উৎকৃষ্ট পানীয় ছিল। মধু অধিক পান করিলে তাহাতেও মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

বানরদিগের খাদ্য ও পানীয়।

রাক্ষসদিগের ভোজন সম্বন্ধে ঋষির মত অবারিত। কোন অবধারিত নিয়ম ছিল না। ইহারা নাকি এক রকম সর্ব্বভুক্ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই মাংস ইহাদের একান্ত প্রিয় ছিল। এতদ্ব্যতীত মৃগ মাংস, মহিষ মাংস, বরাহ মাংস ময়ূর মাংস, কুক্কুট মাংস, বাধ্রীনশ মাংস, কৃষ্ণল, ছাগ, শশক প্রভৃতির মাংস ইহারা ভক্ষণ করিত। লঙ্কার রাজপরিবারে উৎকৃষ্ট সুরা-সরবত

রাক্ষসদিগের ভোজন।

ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল সরবত শর্করা, মধু, পুষ্প, ও ফল হইতে বিশিষ্ট উপায়ে প্রস্তুত হইত। বিবিধ ফল নির্য্যাসের কথাও রামায়ণে উল্লেখ আছে।

শর্করা সব মাধ্বিকাঃ পুষ্পাসব ফলাসবাঃ॥ ২

বাশ চূর্ণৈশ্চ বিবিধৈ মৃষ্টা স্তৈ স্তৈঃ পৃথক পৃথক। সু ১১

শৌণ্ডিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত সুরার আদর লঙ্কার সমাজে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই করিত। রাক্ষসেরা অন্ন (ভাত) ও ভোজন করিত। কুম্ভকর্ণ রাক্ষস পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন ও কলসপূর্ণ রক্তপান করিতেন। (ল ৬০) "পর্ব্বত" ও "কলস" শব্দ দু'টী প্রচুর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রদোষাহার ও প্রত্যূষাহারই রাক্ষসদিগের প্রধান আহার। বোধ হয় এই জন্যই এই সময়দ্বয়ের ভোজনকে এখন রাক্ষসী ভোজন বলিয়া অভিহিত করা হয়। লঙ্কাতেও গো মাংসের ব্যবহার দেখা যায় না। গো চর্ম্মের উল্লেখ আছে; তাহা খাদ্য নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামাজিক নিয়ম ও লৌকিক আচরণ।

সামাজিক বৈশিষ্ট্য ও লৌকিক আচার ব্যবহার সমাজ ভেদে ও দেশের বিভাগ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপই প্রায় হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি এমন আছে, যাহা ধনী নির্ধন সকলেরই আচরণীয়, আবার কতকগুলিতে ধনীরই অধিকার, দরিদ্রের পক্ষে তাহা নিষ্প্রয়োজন। রামায়ণের চিত্র, রাজপরিবারেরই চিত্র, সুতরাং তাহাতে রাজকীয় আচার আচরণের কথাই বেশী; কচিৎ কদাচিৎ নাগরিকদিগের ও মুনি ঋষিদের কথায় সাধারণ জীবনের কথাও বিবৃত হইয়াছে। আমরা যতদূর সম্ভব উভয়বিধ সমাজের আচার আচরণের কথাই নিম্নে আলোচনা করিলাম।

নিদ্রাভঙ্গের সময় ও অনুষ্ঠান।

কর্ম্মী ও আদর্শ জনগণের নিদ্রাভঙ্গে যে সময় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে রাজা রাজোয়ারাও নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতেন। পাছে ঠিক সময়ে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, এ জন্ম নিদ্রাভঙ্গ করিবার বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিধারী বন্দী (বন্দনাকারী) সূত, মাগধ, স্তুতিপাঠক, পাণিবাদক ও গায়কগণ রাজভবনে সমাগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজগুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকিত। ইহার উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপর্য্যুপরি দুন্দুভি ধ্বনি হইতে থাকিত। দুন্দুভি শব্দে বৃক্ষকুলায়ে নিদ্রিত পক্ষী এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিকুলও জাগ্রত হইত নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হইত।[১]

১। অযোধ্যা ৬৫ সর্গ।

রাজ অন্তঃপুরে স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণের ব্যবস্থা ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা স্নান কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত, তাহারা স্নানের জল আনয়ন করিয়া যথারীতি স্নানার্থীর স্নান কার্য্যের সহায়তা করিত। বস্ত্র রক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিচারক বা পরিচারিকা বস্ত্র লইয়া উপস্থিত থাকিত। এইরূপে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজা রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

প্রাতঃকৃত্য।

রাজকুমারগণও ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শুচি ও সমাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিতেন এবং অগ্নিহোত্র সমাধান ও গুরুজনদিগের পাদবন্দনা করিতেন।[২]

অগ্নিহোত্র সমাধান তখন কেবল রাজপুত্রদিগের নয়—প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষেই বোধ হয় মুক্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।[৩] সুতরাং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া আচরিত হইত। যে গৃহে হোমাগ্নি রক্ষিত হইত না সে গৃহ অপবিত্র অশুচি বলিয়া সমাজে নিন্দিত হইত। অগ্নির নৈতিক প্রয়োজনীয়তা হেতুই যে অগ্নি রক্ষার এইরূপ সামাজিক বিধান ছিল তাহা অনুমান করা অসমীচীন নহে।

অগ্নি হোত্র ও হোমাগ্নি রক্ষা।

জ্যেষ্ঠদিগকে প্রতিদিন প্রভাতে প্রণাম করিতে হইত। লক্ষ্মণ সীতাকে প্রতিদিন প্রণাম করিতেন।[৪] সাক্ষাৎ কালেও জ্যেষ্ঠের পাদ বন্দনা বিধি ছিল। গুরুজনের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইত। রাম দশরথকে এইরূপে প্রণাম করিতেন।[৫]

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

২। আদিকাণ্ড ২৯ সর্গ। ৩। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমের নাম অগ্নিহোত্র নারায়ণ উপনিষদ বলেন প্রতিদিন অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানে গৃহস্থের মুক্তি—ইহাই নাকি বেদার্থবিদেরা বলিয়া থাকেন। নারায়ণ ৭৭। ৮, ৯ প্রভৃতি। ৪। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬ সর্গ। ৫। অযোধ্যাকাণ্ড ৩ সর্গ।

গুরুব্যক্তি কোন বস্তু প্রদান করিলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল। হনুমান রামের প্রদত্ত অঙ্গুরি এইরূপে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৬]

গুরুজন স্নেহের পাত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহার মস্তক[৭] আঘ্রাণ করিতেন। রাজা দশরথ এইরূপে রামকে গ্রহণ করিতেন। পুত্রের প্রবাস গমন কালে মাতা পুত্রের মস্তকে অক্ষত[৮] প্রদান করিতেন এবং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ লেপন ও মন্ত্রৌষধি প্রদান করিয়া হস্তে বিশল্যকরণী বাঁধিয়া দিতেন। রাম বনে গমন কালে কৌশল্যা এই অনুষ্ঠানগুলি করিয়াছিলেন। এগুলি বোধ হয় রক্ষা কবচ বলিয়া গণ্য হইত।

স্নেহাস্পদের আশীর্ব্বাদ।

প্রণামের নানাপ্রকার রীতিই তখন প্রচলিত ছিল। গুরুজনকে ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিধি ছিল। সাধারণ জনগণ অসাধারণ জনকে মস্তক নত করিয়া মস্তকে হস্তস্পর্শ করাইয়া প্রণাম করিত। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মানিত ব্যক্তি দুই হস্ত যুক্ত করিয়া তাহা মাথায় বদ্ধ রাখিয়া সম্মান দেখাইতেন, বিভীষণ এইরূপে বদ্ধাঞ্জলি মস্তকে আবদ্ধ রাখিয়া সীতাকে সম্মান অভিবাদন জানাইয়াছিলেন।[৯] অনুচরেরা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিত। হনুমান রামকে এরূপেও প্রণাম করিতেন।[১০] উচ্চ সভাসদ

প্রণামের নানারীতি।

৬। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৪ সর্গ। ৭। বালকাণ্ড ২২ সর্গ। ৮। অযোধ্যাকাণ্ড ২৫ সর্গ। অক্ষত অর্থে ধান্য-যব, ইত্যাদি। পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ কেবল অক্ষতই ব্যবহৃত হইত। যে প্রদেশে যে শস্য প্রধান সেই প্রদেশে সেই শস্যই অক্ষত নামে পরিচিত ছিল। শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে ধান্য এবং দূর্ব্বার প্রভাব হেতু বোধ হয় বঙ্গজননীরা ধান্যের সহিত দূর্ব্বা যোগ করিয়া স্নেহাস্পদদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন।

৯। লঙ্কাকাণ্ড ১১৫ সর্গ। ১০। সুন্দরকাণ্ড ৩৮ সর্গ।

বা কর্ম্মচারীগণও দূরে বাহন রাখিয়া পদব্রজে রাজসভায় আসিয়া রাজার পাদবন্দনা করিয়া স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিতেন।[১১] অতিথি বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া গণনীয় হইতেন। এমন কি দেবতার সহিত অতিথির তুলনা হইত। সমাগত অতিথি বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে সসম্মানে পাদ্য অর্ঘ্য দানে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার বিধান ছিল; উচ্চ নীচ জ্ঞান অতিথির সহিত ছিল না।

অতিথির অভ্যর্থনা।

করমর্দ্দন প্রথাটিকে আমরা বর্ত্তমানে ইয়ুরোপীয় বৈদেশিক প্রথা বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা বৈদেশিক প্রথা নহে। প্রাচীন ভারতে এই প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাম সুগ্রীবকে এইরূপে করমর্দ্দন করিয়াই আত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন। রাম সম্ভাষণে সুগ্রীব বলিতেছেন :—

করমর্দ্দন প্রথা।

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥১১। ৪। ৫

এই আমি হস্ত প্রসারণ করিলাম, যদি আমার সহিত মিত্রতা করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে। তবে আপনার হস্ত দ্বারা আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া অক্ষয় প্রীতি বন্ধন করুন।

বশিষ্ঠের সহিত রামের সাক্ষাতে রাম কুলগুরুকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে একটু মতভেদ হইতে পারে সন্দেহ থাকিলেও তাহা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। বৃদ্ধ বশিষ্ঠকে রাম অগ্রসর হইয়া যাইয়া রথ হইতে নামাইয়াছিলেন।

পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্। ৭। ২। ৫

এই কথায় টীকাকারগণ হস্ত ধরিয়াই ব্যাখ্যা করেন।

১১। লঙ্কাকাণ্ড ১১ সর্গ ও কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৩১ সর্গ।

দশরথও রামকে হস্ত ধরিয়াই গ্রহণ ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। যথা "গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সম্বন্ধে প্রিয়মাত্মজম। ৩৪।২।৩

শুধু রামায়ণে নহে, বৈদিক সাহিত্যেও এই প্রথার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-আর্ত্তভাগ-সংবাদ হইতে তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকর্ত্তা আর্ত্তভাগকে বলিতেছেন—

* সৌম্য হস্ত মার্ত্তভাগাবামেবৈতস্য বেদিষ্যাবো ন নাবেতৎ সজন ইতি। ৩।২।১৩

অর্থাৎ যদি এই প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাও, আমার হস্তে তোমার হস্ত অর্পণ কর চল নির্জ্জনে যাই; জনাকীর্ণ স্থানে এ সকল কথার আলোচনা হইতে পারে না।

এইরূপ ভাব হইতেই যে পরে করমর্দ্দন প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোলাকুলি বা আলিঙ্গন প্রথাও সুপ্রাচীন। সাক্ষাৎ ও নিক্রামণে আলিঙ্গন, অঞ্জলিবন্ধন ইত্যাদি দ্বারা সম্মান করা হইত। কনিষ্ঠকে কেবল আলিঙ্গন দ্বারাই প্রীতি প্রদর্শন করা হইত।

আলিঙ্গন।

রাজা রাজপুত্র অথবা তেমন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুরী প্রবেশে রাজপুরী হইতে শঙ্খ দুন্দুভি ধ্বনিত হইত। ঋষ্যশৃঙ্গসহ দশরথ অযোধ্যায় প্রবেশ করিতে এইরূপ অভ্যর্থনা ধ্বনি হইয়াছিল।[১২] বনবাস হইতে রাম প্রত্যাগমন করিলেও এইরূপ মঙ্গল ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে গৃহীত হইয়াছিল।[১৩] এইরূপ প্রথা বর্ত্তমান সময়েও রাজধানী সমূহে আচরিত হইয়া থাকে।

শঙ্খনাদ ও দুন্দুভি ধ্বনি।

১২। বালকাণ্ড ১১ সর্গ। ১৩। লঙ্কাকাণ্ড ১২৯ সর্গ।

জন্মস্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মান করিবার রীতিও সে কালের সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি প্রদক্ষিণের কথা আমরা ৩য় অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। হনুমান রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া কথা বলিতেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌশল্যার একস্থানের আক্ষেপ উক্তিতে রাম লক্ষ্মণ কখন আসিয়া পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া হৃষ্টমনে পুরীতে প্রবেশ করিবে তাহার উল্লেখ আছে।[১৪] ইহা সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

পুরী প্রদক্ষিণ।

মুনি ঋষিদিগকে অভ্যর্থনা করা ও কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার রীতি একটু পৃথক ছিল। রাজা ও ঋষি সাক্ষাৎ হইলে সে সময়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব ও রাজনীতি এই উভয় চর্চ্চাই হইত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভরত ও ভরদ্বাজের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যটাই এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ভরত রামকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাত্রা করিয়া পথে ভরদ্বাজ আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভরত আশ্রমের নিকট উপনীত হইয়াই পরিধান বস্ত্র ও অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পবিত্র ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া ও উত্তরীয়রূপে গ্রহণ করিয়া পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবা মাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনিতে আদেশ করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরত ভরদ্বাজের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ভরদ্বাজও উভয়কে পাদ্য অর্ঘ্য এবং বিবিধ ফল প্রদানপূর্ব্বক গৃহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজধানী, সৈন্য সামন্ত, ধনাগার, বান্ধব, মন্ত্রী ইত্যাদি বিষয়ই ভরদ্বাজের জিজ্ঞাস্য বিষয় ছিল। প্রতি জিজ্ঞাসায় ভরতের পক্ষে—ঋষির

রাজা ও ঋষির সাক্ষাৎকার ও অভ্যর্থনা রীতি।

১৪। অযোধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ।

তপ, সাধন, শরীর, অগ্নি, শিষ্য, আশ্রম ও বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির অভয় অবস্থান বিষয়ক প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল।[১৫]

ঋষিরা রাজদর্শনে আশীর্ব্বাদ করিতেন কিন্তু সাধারণ লোক রাজদর্শনে শ্রদ্ধার সহিত উপঢৌকন প্রদান করিত। নিষাদরাজগুহ ভরতের আগমনে তাঁহাকে প্রচুর মৎস্য মাংস ও মধু উপঢৌকন প্রদান করিয়া সৎকার করিয়াছিলেন।[১৬] কোথাও গমন কালে সম্মানিত ব্যক্তিকে অগ্রে করিয়া যাইবার রীতি। ভরতের নদী উত্তরণ কালে সর্ব্বাগ্রে গুরু পুরোহিত তারপর রাজকীয় মহিলারা, অতঃপর রাজমন্ত্রীদিগের পত্নীরা গমন করিয়াছিলেন।[১৭] ইয়ুরোপের বর্ত্তমান প্রথা স্বামীর সম্মানের সমান অধিকারী স্ত্রী।

উপঢৌকন।

সম্মানের তারতম্য।

প্রাচীন ভারতে কিন্তু স্ত্রীর সম্মান সংসারের সকলের চেয়ে উপরে ছিল। জাম্ববানের মুখের একটী কথায়ই তাহা প্রমাণিত হইবে। জাম্ববান অঙ্গদকে বলিতেছেন "আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদের কলত্র তুল্য। সুতরাং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের প্রতিপালন করিতে হইবে।

স্ত্রীর সম্মান।

"ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামীভাবে ব্যবস্থিতঃ।

স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেষা পরন্তপঃ॥ ২৩। ৪। ৬৫

স্ত্রী গৃহকর্ত্রী হইলেও সমাজের নৈতিক বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য স্ত্রীকে ধর্ম্ম প্রভাবে স্বামীর অধীন ও অনুবর্ত্তিনী থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। স্ত্রীর নিকট স্বামী যদি কোন কারণেও ক্ষমা চাহিত তবে স্ত্রীর তাহাতে পাপ স্পর্শ করিত। রামকে বনে পাঠাইয়া দশরথ কৌশল্যার নিকট

১৫। অযোধ্যাকাণ্ড ৯০ সর্গ। ১৬। অযোধ্যাকাণ্ড ৮৪ সর্গ। ১৭। অযোধ্যাকাণ্ড ৮৯ সর্গ।

বাস্তবিকই অপরাধী হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দশরথ নিজে সেই ক্রটী প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কৌশল্যা স্বামীর অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত ধারণ করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—মহারাজ আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে আমার নিশ্চয় সর্ব্বনাশ হইবে। কারণ ইহলোক ও পরলোকে শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে এরূপে প্রসন্ন করিতে চান সে কুলস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।[১৮]

কুসংস্কার সকল সমাজেই অল্প বিস্তর আছে। সুপ্রাচীন যুগেও ছিল। রামায়ণে বহু আচরণের সহিতই নানারূপ সংস্কার জড়িত দেখা যায়। সংস্কার যে স্থলে অর্থযুক্ত সে স্থলে সংস্কারকে লোকে কুসংস্কার বলিয়া মনে করে না। তাহা যখন অর্থ হীন হয়, তখন তাহা সমাজের কুসংস্কার বা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়।

এখন স্ত্রীলোকেরা বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়া থাকে। অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও বক্ষের চাপা দুঃখ ব্যক্ত করাই যে এই স্থানদ্বয়ে করাঘাতের উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু রামায়ণের

বিলাপের রীতি।

যুগে উদরে করাঘাত করিয়া রোদনের রীতি ছিল। সুর্পণখা উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিল।[১৯] সুর্পণখার এই রীতিকে উদর সর্ব্বস্ব রাক্ষসী রীতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু সীতাকেও যখন এই রীতি অবলম্বনে বিলাপ করিতে দেখা যায় তখন তাহাকে তৎকালীন সমাজের অর্থ হীন মুদ্রাদোষ ব্যতীত কি বলা যাইতে পারে।[২০] সীতা এক স্থলে বাহু উর্দ্ধে তুলিয়াও রোদন করিয়াছেন। ইহাকে অধৈর্য্য প্রকাশ-চিহ্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

১৮। অযোধ্যাকাণ্ড ৬২ সর্গ। ১৯। করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ। অরণ্যকাণ্ড ২১ সর্গ।

২০। ইতি লক্ষ্মণ মাক্রুত্য সীতা শোক সমন্বিতা।

পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘানহ॥ আরণ্য ৪৫ সর্গ।

শপথ করিবারও এইরূপ নানা কুসংস্কারজনক বিধান ছিল। বালী সুগ্রীবকে পাদ স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন।[২১] হনুমান মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, দর্দ্দুর পর্ব্বতের নাম ও ফল মূলেরউল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল।[২২] বোধ হয় এগুলি তাহার প্রিয় বাসস্থান ও প্রিয় খাদ্য বলিয়াই শপথ করিয়াছিল। কৈকেয়ীও ভরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন।[২৩] প্রিয় বস্তু ও প্রিয় জনের নামে শপথ করিবার কুসংস্কার এখন পর্য্যন্তও ভারতীয় সমাজে প্রচলিত আছে। অগ্নি সাক্ষী করিয়াও শপথ তখন প্রচলিত ছিল—সুগ্রীব রামের সহিত এইরূপে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিত্রতা করিয়াছিলেন।[২৪]

শপথ রীতি।

অপবিত্র অবস্থায় শয়ন শাস্ত্র বিরুদ্ধ এবং নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হইত। দৈত্যমাতা দিতি এইরূপে শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। শয়নের জন্য দিকও নির্দ্দিষ্ট ছিল—দিতি শয়ন করিতে দিক ভ্রমও করিয়াছিলেন।[২৫] বর্ত্তমান সময় হিন্দুর পক্ষে উত্তর ও পশ্চিম শিয়র নিষিদ্ধ। রামায়ণে নিষিদ্ধ দিক নির্দ্দেশ নাই।

শয়ন বিধি।

আমরা বিপদে আশ্রয়স্থলে তুচ্ছ তৃণ খণ্ডের উল্লেখ করি। কিন্তু তৃণখণ্ডও যে নীতি ধর্ম্মের প্রভাবে এক সময় আশ্রয়ের পদার্থরূপে গণ্য ছিল রামায়ণে তাহার উল্লেখ আছে। রাবণ যখন নিঃসহায়া সীতার সম্মুখে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তখন জানকী রাবণ ও তাঁহার নিজের দূরত্বের মধ্যে একখণ্ড তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।

তৃণ-আশ্রয়।

২১। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৯ সর্গ। ২২। সুন্দরাকাণ্ড ৩৬ সর্গ।
২৩। অযোধ্যাকাণ্ড ১২ সর্গ। ২৪। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫ সর্গ।
২৫। বালকাণ্ড ৪৬ সর্গ।

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত ॥ ১।৩।৫৬

নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ আশ্রয়ের ন্যায় অনেক বিপদেই তৃণ আশ্রয় ছিল বলিয়া দেখা যায়। এই সংস্কারটীকে সেকালের একটী নৈতিক বিধি বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কামুকের বা প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির নিকট নীতির মূল্য কি ?

যাত্রাকালে দক্ষিণ পদ অগ্রে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার রীতি আছে, কিন্তু গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে যে বাম পদ অগ্রে স্পর্শ করাইতে হয় তাহার রীতি এখন নাই। হনুমান প্রথম বাম পদ অর্পণ করিয়া লঙ্কাপর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ সংস্কারের যুক্তি—পণ্ডিতেরা বলেন শত্রুপুরীতে বাম পদ অর্পণই শত্রু জয়ের নিদান।

বামপদ স্থাপন।

চক্রেঽথ পাদং সব্যঞ্চ শত্রূণাং স তু মূর্দ্ধনি।
প্রবিষ্টঃ সত্ত্বসম্পন্নো নিশায়াং মারুতাত্মজঃ ॥ ৩। ৫। ৪

লৌকিক আমোদ প্রমোদ বা নীতিবিরুদ্ধ কোন খেলা ধূলার কথা রামায়ণে এক রকম নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। পুরাণ কীর্ত্তন[২৬] ও গীত-নাটক[২৭] ইত্যাদির আমোদ প্রমোদের আভাস রামায়ণে পাওয়া যায়।

আমোদ প্রমোদ।

অক্ষক্রীড়ার কোন চিত্র রামায়ণে না থাকিলেও দৃষ্টান্তের স্থলে অক্ষক্রীড়া দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হওয়ার কথা আছে। এক স্থানে রূপক ছলে আছে— হনুমান রাবণের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপ-শিখা মহাধূর্ত্তের কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে।[২৮]

অক্ষক্রীড়া।

২৬। অযোধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গ। এখানে বৈদিক পুরাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৭। নাটকের উল্লেখ রামায়ণে বহু স্থানে আছে; রামায়ণের সভ্যতা গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত আলোচনা হইবে। ২৮। ঋগ্বেদ ১। ১২৪। ৭।

অন্যত্র—হনুমানের গমন বেগে বৃক্ষ সকল অক্ষক্রিয়ায় নির্জ্জীব বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গেল। বাস্তবিক পক্ষেই দ্যূতক্রীড়া সমাজের একটী ব্যাধি। ঋক্‌বেদে দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ না থাকিলেও "গর্ত্তা" শব্দ ঋক্‌বেদে আছে।[৩০] নিরুক্তে গর্তা অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিক্ষিপ্ত বস্ত্রাভরণা ধূর্ত্তা ইব পরাজিতা। ১৫। ৫। ১৪

এই সকল উক্তি বিষয়ের অস্তিত্ব প্রকাশক। তবে তাহা যে সমাজে ঘৃণ্য ছিল, খেলোয়ার শব্দের 'ধূর্ত্ত' প্রতিশব্দই তাহার প্রমাণ।

বড়িশ।

বড়িশ দ্বারা মৎস শিকার একটী সুপ্রাচীন রীতি। রামায়ণে এই প্রথার চিত্র না থাকিলেও রূপক ছলে এক স্থানে তাহার উল্লেখ আছে।

উপসংহারে একটী বিসদৃশ কথার উল্লেখ করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করা গেল।

অযোধ্যার অন্তপুর পরিচারিকাদিগের উল্লেখের স্থলে কুব্জা, বামন ইত্যাদি কুৎসিতাঙ্গী নারীদিগের অবস্থানের কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।[৩১]

পুরুষের স্নানে স্ত্রীলোকের ব্যবহার

এ গুলির নৈতিক আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পুরুষদিগকে স্ত্রীলোকেরা স্নান ও গাত্র মর্দ্দন করিয়া দিবার চিত্র এবং প্রস্তাব যে আছে,[৩২] তাহা অস্বীকার করা যায় কি? প্রস্থান্তরে তাহার বিচার আলোচনা করা যাইবে।

পুরুষ পাচক।

আমরা পুণ্যভূমি অযোধ্যায় যাইয়া সীতা, কৌশল্যা প্রভৃতি আর্য্য মহিলাদিগের রন্ধনশালা ও রন্ধনের কাল্পনিক আসবাবপত্র দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু রামায়ণে প্রায় কোন স্থলেই রাজ-অন্তঃপুরের মহিলাগণ যে রন্ধন করিতেন তাহার উল্লেখ দেখিতে পাই না। কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

৩০। ঋগ্বেদ ২। ১২৪। ৭। ৩১। অযোধ্যাকাণ্ড ২০ সর্গ।
৩২। অযোধ্যাকাণ্ড ৯১ সর্গ ও লঙ্কাকাণ্ড ১২২।

যস্তচাহার সময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ।

অহমপূর্ব্বাঃ পচন্তি স্ম প্রশস্তং পানভোজনম্॥ ৯৬।২।১২

অর্থ—কুণ্ডলধারী সূদগণ (পাচক) যাহার আহারের নিমিত্ত আমি রাঁধিব আমি রাঁধিব বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক প্রশস্ত ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য সকল রন্ধন করিত (এখন কেমন করিয়া সেই রাম ... ... বন্য ভোজ্য ভোজন করিবে।)

কিন্তু মহিলাগণ যে একেবারেই রন্ধন কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না তাহা নহে। সীতা বনে যে নিজ হস্তে রন্ধন করিতেন রামায়ণের এক স্থলে তাহার আভাস আছে।

দণ্ডকারণ্যে ব্রাহ্মণবেশী রাবণকে অতিথি মনে করিয়া সীতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—এই রন্ধন করা অন্ন আপনার জন্য রক্ষিত আছে আপনি ভোজন করুন। (আরণ্য ৭৩— ১৬ শ্লোক।)

সাধারণ পরিবারে যে স্ত্রীলোকেরাই রন্ধনাগারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত রাজপরিবারের দৃষ্টান্ত ধরিয়া তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

শাস্ত্রানুশাসন।

সমাজের উপর সাধারণতঃ দ্বিবিধ শাসন প্রচলিত থাকে। প্রথম রাজকীয় শাসন, দ্বিতীয় সামাজিক শাসন। এই উভয় শাসনেরই মূল উদ্দেশ্য সমাজকে নৈতিক পন্থায় সুশৃঙ্খলিত রাখা।

আইন বা নিয়মের আদর্শ যে জাতির ভিতর যত উচ্চ, সভ্যতার মাপকাঠিতে সেই জাতির আদর্শ এবং সভ্যতাও তত উচ্চ। আজ যে ইউরোপীয় সভ্যতা জগতের উচ্চ সভ্যতার আদর্শ বলিয়া আপনাকে জগৎময় প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রাচীন রোমের ব্যবস্থা শাস্ত্রই তাহার নিদান। রামায়ণ-যুগের রাজনীতির আলোচনা আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে করি নাই বটে, কিন্তু রাজকীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া পারিব না; কেন না প্রাচীন ভারতের রাজা সমাজেরও নিয়ন্তা থাকা হেতু রাজবিধি এবং সমাজবিধি উভয়ই একই শক্তির ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত।

রামায়ণের সমাজ তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র রামায়ণে স্মৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের বর্ণিত বাল্মীকির গীতাবলীর ন্যায় এবং বেদের শ্রুতি-মন্ত্রসমূহের ন্যায় এই

ধর্ম্মশাস্ত্র-স্মৃতিশাস্ত্র

ধর্ম্ম শাস্ত্রের নির্দ্দেশ গুলিও তখন জনগণের স্মৃতিতেই বিরাজ করিত। তাহার কারণ তখনও সমাজে লিপি বিদ্যা প্রচারিত ছিল না। এই সমাজ-বিধিগুলি জনগণের স্মৃতিতে বিরাজ করিত বলিয়া এগুলি স্মৃতি নামে অভিহিত হইত। রামায়ণেও সমাজ অনুশাসনকে স্মৃতি বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—

"এষ ধর্ম্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।" ২৮। ২। ২৪

এই স্মৃতি যে শ্লোকে গ্রথিত ছিল এবং তাহা মনুর স্মৃতি বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারও আভাস রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা—

"শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চরিত্রবৎসলৌ।" ৩০। ৪। ১৮

মনুর শ্লোক।

এই "শ্রূয়তে" শব্দ দ্বারাও ধর্ম্মশাস্ত্র যে তখন জনগণের স্মৃতিতে রক্ষিত থাকারই বিষয় ছিল তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

মনুর নামটী যে অতি প্রাচীন, তাহা বৈদিক গ্রন্থের আলোচনায়ও বুঝিতে পারা যায়। ঋক্‌বেদে মনুর উল্লেখ আছে।[১] কিন্তু তিনিই মনুস্মৃতির রচয়িতা কি না বুঝা যায় না। যাস্ক ঋক্‌বেদের ঐ ঋক্‌টীর আলোচনায় মনুর পরিচয় দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"মনু বিবস্বানের পুত্র ও সবর্ণার গর্ভজাত। মেক্ষমুলার কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে চান্ না। মেক্ষমুলারের মত পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[২]

যাহাই হউক, মনুর পরিচয় ভুলই হউক, অথবা 'মনু' মানব শব্দেরই

(১) ঋক্‌বেদ ১। ৩১। ৪

(২) "The hymn does not allude to Manu as the son of Savarna. it only calls the 2nd wife of Vivasvat by that name ... ... The fable of Manu is probably of a later date. For some reason or other Manu, the Mythic ancestor of the race of man was called Savarni meaning possibly, the name of all colours is of all tribes & castes. The name may have reminded the Brahmans of Savarna, the second wife of Vivasvat; and as Manu was called Vaivasta, the worshipper, afterwards the son of Vivasvat, the Manu Savarni was naturally taken as the son of Savarna."

Science of Language (1882) Vol II P. 557.

(রমেশ বাবুর ঋক্‌বেদ ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে)

প্রতিশব্দ হউক, নামটী বা শব্দটী যে অতি প্রাচীন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আদি মানব মনু জন্মগ্রহণ করিয়াই যে বংশধরগণের সমাজ-ধর্ম্ম শৃঙ্খলার জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি আদিম সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমাজতত্ত্ববিদেরা বা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিবেন না। তাহার কারণ সমাজ সৃষ্টির প্রারম্ভেই স্মৃতি রচনার আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

মনুস্মৃতি।

সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুর শৈশব সমাজ কিরূপ ধারায় এবং ধাপে ধাপে পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ অবস্থার বহু সহস্র বৎসর পরে মানব সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার প্রারম্ভেও স্মৃতির প্রয়োজন হয় নাই। হইলেও ঋক্‌বেদে স্মৃতির উল্লেখ নাই। চাতুর্ব্বর্ণ সমাজ স্থাপিত হইলেই স্মৃতি শাসন প্রয়োজন হইয়াছিল এবং তখনই মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা মনু-স্মৃতি কল্পিত হইয়াছিল। রামায়ণে আমরা এই মনু স্মৃতিরই উল্লেখ দেখিতে পাই।

কোন প্রতিষ্ঠানকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে হইলে তাহার জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম চাই; অন্যায়ের পরিহার ও নিয়ম সংরক্ষণই সেই বিধির কার্য্য। স্মৃতি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই সমাজ স্থাপনের পর রচিত হইয়াছিল।

অনুশাসনের আবশ্যকতা।

স্মৃতির অনুশাসন তখন রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক উভয়বিধ ব্যাপারকেই সুনিয়ন্ত্রিত করিত। রাজনৈতিক অনুশাসনের কথা গ্রন্থান্তরে আলোচিত হইবে। এই স্থলে আমরা কেবল সমাজ শাসন ব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করিব। রামায়ণের ঘটনাবলীর প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিলে রামায়ণ যুগের স্মৃতির অনুশাসনগুলির এবং সেই সঙ্গে তৎকালের সমাজনীতির বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পাপের পরিহার ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই সমাজ-অনুমোদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজে পাপ বা পঙ্কিলতা প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মানুশাসন রচিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশাসনগুলির আলোচনা করিলে, সমাজে প্রচলিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে প্রচলিত কার্য্যসমূহের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই সমাজের নেতৃগণ এই সকল অনুশাসনের রচনা করিতেন। রামায়ণের সমাজে কিরূপ নীতির প্রতিষ্ঠা ছিল, রামায়ণ হইতে তাহার আলোচনা করা যাউক।

অপরাধ ও দণ্ড ব্যবস্থা।

ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, রাম বনে গিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ॥ ৪৪
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্ত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ॥ ৪৫

অযোধ্যা; ৭২ম সর্গ।

ভরতের এই উক্তি হইতে তৎকালীন ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কয়েকটি দণ্ড-ব্যবস্থা আমরা জানিতে পারি।

ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তখন ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ, নিষ্পাপ, ধনাঢ্য অথবা দরিদ্রের হিংসা, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি অপরাধের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অতঃপর ভরতের সহিত রাম-জননী কৌশল্যার সাক্ষাৎ হইলে, ভরত রাম-বনবাস যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎকালনিষিদ্ধ বিবিধ অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া

বলিয়াছিলেন,—আর্য্যে! রাম যদি আমার জ্ঞাতসারে বনে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে এই সকল অধর্ম্ম ও পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। নিম্নে ভরত-কথিত এই সকল অধর্ম্ম ও অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করা গেল।

অবৈধ কার্য্যের তালিকা।

পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না, পাপী ব্যক্তির কার্য্যস্বীকার, সূর্য্যাভিমুখে মলমূত্রত্যাগ, কর্ম্মান্তে ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, পুত্রবৎ পালনকারী রাজার বিদ্রোহাচরণ, ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও প্রজাপালন না করা, যজ্ঞের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রদান না করা, গুরুর উপদেশ ভুলিয়া যাওয়া, বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ, গুরুজনের অবজ্ঞা, পদ দ্বারা গো-শরীর-স্পর্শ গুরুনিন্দা, মিত্রদ্রোহিতা, পরনিন্দা-কথন, প্রত্যুপকার না করা, সকল প্রাণীর বিদ্বেষ-ভাজন হওয়া, দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও নিজে উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা, অনুরূপা স্ত্রী-লাভে বঞ্চিত হওয়া, ধর্ম্মকর্ম্মে অক্ষম হওয়া, পুত্রহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, পত্নীগর্ভ-সম্ভূত পুত্রের মুখ দর্শন করিতে নাপারা, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, লাক্ষা, মধু, মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্য প্রতিপালন করা; রাজমন্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করা, অনুগত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা, যুদ্ধে পলায়নকালে নিহত হওয়া, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত ও নরকপালধারী হইয়া ভিক্ষা করা, সর্ব্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত থাকা, কাম ও ক্রোধে অভিভূত হওয়া, অপাত্রে দান করা, স্বধর্ম্মে আসক্তিহীনতা, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন করা, গৃহ দগ্ধ করা, গুরুপত্নী-গমন, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি অভক্তি, পিতা মাতার শুশ্রূষা না করা, মাতৃ-শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে লিপ্ত থাকা, দীনভাবাপন্ন যাচকের আশা বিফল করা, ছলপূর্ব্বক রতিকার্য্য সমাধান, ঋতুস্নাতা, ও ঋতু রক্ষার্থ অনুরোধকারিণী সতী স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করা, ব্রাহ্মণের বংশহীনতা,

বালবৎসা গাভীর দোহন, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পূজার বিঘ্নকারী হওয়া, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্ত্রী সেবা, বিষ মিশ্রিত জল ও অন্ন প্রদান করা, পানীয় সত্ত্বেও তৃষ্ণার্থ ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা, আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা, বিবাদ ভঞ্জনে সমর্থ ব্যক্তির বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া তাহা দর্শন করা, দরিদ্রের বহু ভৃত্যশালী হওয়া,—ইত্যাদি।

গো-জাতির সম্মান।

অতি প্রাচীনকালে, যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, তখন আর্য্যগণ গোধন দ্বারা নাকি বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশেও গো অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। ক্রমে সেই সকল দেশে গো-শব্দই মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে। (১) রামায়ণী যুগে আর্য্য সমাজে মুদ্রা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তখন মুদ্রার বিনিময়ে ধেনু ব্যবহৃত হইত কিনা জানা যায় না। কিন্তু অতিথি সৎকারে অর্ঘ্য, উদক ও মুদ্রার সহিত গো উপঢৌকন প্রদত্ত হইত। (২) ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানের সহিত কোটী গো দান করা হইত। সুতরাং গোজাতি সমাজে অত্যধিক সম্মান

(১) গো প্রভৃতি পশু লাটীন ভাষায় Pecudes বাচ্যে অভিহিত হইত। Pecudesই মুদ্রার প্রয়োজন পূরণ করিত। Pecudes ক্রমে ইংরাজী Pecuniary শব্দে পরিণত হইয়া গরুর অভাবে money অর্থে প্রযোজ্য হইয়াছে। এখন Pecuniary 'গাভী-সম্বন্ধীয়' অর্থের দ্যোতন না করিয়া 'মুদ্রা-সম্বন্ধীয়' অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থলে এখনও অর্থের পরিবর্ত্তে গো-বিনিময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় গো-বিনিময়ে বিবাহাদি হয়, পাঁচ সাতটি গাভীর বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে গোদান অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতুই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। এখন গোদান-গ্রহণ ভারতীয় সমাজের কোনও কোনও অংশে হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) অতিথিকে গো-উপহারে অভ্যর্থনা করা হইত। অনেক পাশ্চাত্য ও এত দ্দেশীয় পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে অনেক অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ

লাভ করিবে, ইহা বিচিত্র কি? প্রাচীন সমাজনেতা মহর্ষিগণ এই জন্যই গো-রক্ষার্থ বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিয়াছিলেন। পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না করা, পাদ দ্বারা গো-শরীর স্পর্শ করা, বালবৎসা গাভী দোহন করা প্রভৃতিও এই জন্য পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গোকুল রক্ষার ও তাহার সম্মান বৃদ্ধির উপায় মাত্র। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজেও এই ব্যবস্থা সম্মানিত হইয়া থাকে।

পাপীকে সমাজের সংস্পর্শে আনিলে সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। তাই পাপীর দাসত্ব সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে ব্যবহার-বৈষম্য লক্ষিত হইলে সে পরিবার অচিরাৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়; সমাজ তাই পরিবার-পরিচালককে আত্মসুখ অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভৃত্য যে অন্ন আহার করিবে, আপনাকেও সেই অন্নে তৃপ্তিলাভ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সমাজ রক্ষারই উপায় মাত্র। এখন এই উদার ব্যবস্থা পদ-দলিত হইতেছে।

মধু, মাংস, লাক্ষা, লৌহ ও বিষের বিক্রেতা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মধু (মদ্য), মাংস ও বিষের বিক্রেতা এখনও সমাজে পতিত। এই তিন পদার্থের ব্যবসায় অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছে। লৌহ ও লাক্ষা সমাজের

পাপ ব্যবসায়।

ও সীতা ভরদ্বাজ-আশ্রমে উপনীত হইলে মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য, উদক ও গো-উপঢৌকন দিয়া অর্চ্চনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে কেহ 'বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ অন্য অর্থেরও কল্পনা করিয়াছেন। এই বিসংবাদ-নিষ্পত্তির জন্য আমরা এ স্থলে মূল উদ্ধৃত করিলাম।—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ॥ ১৭
নানাবিধানন্ন-রসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসঞ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ॥ ১৮
—অযোধ্যা; ৫৪।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। অথচ, ইহাদের বিক্রেতারা সমাজে হেয় হইয়াছিল। ইহার কারণ কি?

প্রাচীনকালেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল। কেহ গৃহদেবতার, কেহ বনদেবতার, কেহ অগ্নির, কেহ রুদ্রের, পূজা করিতেন। এবং সম্ভবতঃ স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া অন্যের উপাস্য দেবতার নিন্দা করিতেন, এবং তাহার ফলে পরিশেষে ঘোর আত্মকলহের সৃষ্টি হইত। সমাজে এইরূপ কলহ ও দেব-নিন্দার সৃষ্টি দেখিয়াই সমাজপতিগণ তাহা নিবারণের জন্য অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ভরত-কথিত "আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা" দূষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "দরিদ্রের বহুভৃত্য-শালিত্ব" যে দোষ, তাহা অর্থ-নীতিরও অনুমোদিত। লঙ্কার রাক্ষস সমাজে পরস্ত্রী গমন ও পরস্ত্রীকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইলেও রামায়ণের আর্য্য সমাজে ব্যভিচারীর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে।

দেবতা নিন্দা অপরাধ।

ব্যভিচার।

অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—পরস্ত্রীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। যে পরস্ত্রী ও পরধনের অপহারী, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। নিরপরাধের ক্ষতি করা ও পরস্ত্রী গমনে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়া জননীর মুখে যখন শুনিলেন, "রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তখন তিনি সন্দিহানচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাম কি পরদারে আসক্ত হইয়াছিলেন—এই নির্ব্বাসন দণ্ড কেন হইল?"

সমাজে যাহা অহরহ ঘটিয়া থাকে, সামাজিক জনগণের চিন্তা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভরতের এই চিন্তা হইতেও ব্যভিচার অপরাধে

তৎকালে শুল্ক দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ভরত-কথিত এই সকল অবৈধ কার্য্যগুলির আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, সমাজের রক্ষা ও তাহা উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই সকল বিবিধ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পঞ্চবটীতে মায়ামৃগের অনুসরণে লক্ষ্মণের অনভিপ্রায় দেখিয়া পতিগত-প্রাণা আদর্শ লক্ষ্মী সীতার মনে লক্ষ্মণের প্রতি যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, পতির বিপদের ভাবনায় বিগতবুদ্ধি হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে কঠোর ভৎর্সনার সহিত যাহা বলিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা-শিবিরে লঙ্কার ভীষণ যুদ্ধের অবসানে সীতার অগ্নিপ্রবেশের পূর্ব্বে পরগৃহে রক্ষিতা সীতার চরিত্র চিন্তা করিয়া আদর্শ-রাজা রাম সতীর প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে, এগুলি তৎকালীন সমাজের চিন্তনীয় বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অগ্নি পরীক্ষা ছিল সে কালের একটী শাস্ত্রীয় ও সামাজিক উভয়বিধ মারাত্মক শাস্তি। কিরূপে যে অগ্নি-প্রবেশ করিয়া লোক নিজকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণায় তাহা মীমাংসিত হয় নাই। সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা এই যুগে আমাদের নিকট অসম্ভব কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল; যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের ব্যবস্থায় অগ্নি পরীক্ষার বিধি আছে। এবং শুধু পূর্ব্বকালেই নহে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যে অগ্নি পরীক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে আমরা শুনিতে পাই। *

---

* ১৭৮৩ অব্দে কাশীর প্রধান বিচারপতি আলি ইব্রাহিম খাঁ দুইটী অগ্নি পরীক্ষায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা সেই বিবরণ পাঠ করিতে চান তাঁহারা এসিয়াটিক রিছার্চ ১ম খণ্ড পাঠ করিবেন।

এই অগ্নি পরীক্ষা কেবল যে ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। প্রাচীনকালে তাহা অন্যান্য দেশেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে অগ্নি পরীক্ষা ছিল সফোক্লিসের এনটিগোন্ পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ৪র্থ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও এ প্রথা ছিল। ইংলণ্ডের রাজমাতা রাণী এমাকে কোন সাধারণের সমক্ষে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। মোসিমের ধর্ম্ম ইতিহাস ২য় খণ্ডে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রাণী নাকি অগ্নি-পরীক্ষায় অক্ষত-দেহে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মগ্রন্থে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক প্রদর্শিত হইয়াছে সুতরাং সেকালের অগ্নিপরীক্ষা অন্ধ বিশ্বাসী মারাত্মক প্রথা বলিয়া আজকাল মনে হইলেও তাহা খেয়াল কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

সমাপ্ত।